প্রকাশক :

শ্রীরমেশচন্দ্র পাল, বি-এ,

গুরুচরণ পাব্লিশিং হাউস,

৪।১, আরপুলি লেন, কলিকাতা

দাম দুই টাকা

সাহিত্য-জীবনে যিনি সুদীর্ঘকাল সমকর্ম্মী ও সমধর্ম্মী, আমার পরম সুহৃদ্, প্রবীণ ও প্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বসুর করকমলে "যমুনাধারা" উৎসর্গ করিলাম।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ

১৩নং পরমহংসদেব রোড,
চেতলা।
জন্মাষ্টমী, ১৩৪১

যমুনাধারা

এক

"প্রীতিভাজনেষু,

এবার কলিকাতার স্বদেশী মেলায় নানারূপ ব্যায়াম ও মল্লযুদ্ধের প্রতিযোগিতা হইবে। ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে প্রসিদ্ধ মল্লগণ আসিয়াছে। আমাদের ইচ্ছা, তোমার এত দিনের শক্তিসাধনার পরিচয় প্রকাশ্যভাবে দেখাইয়া বাঙ্গালী জাতিকে উদ্‌বুদ্ধ কর।

প্রতিযোগিতার পরীক্ষার দিন এখনও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। দুই চারি দিনের মধ্যে আমাদের অতিরিক্ত বৈঠকে তাহা স্থির হইবে। তুমি আগামী কল্য রওনা হইও। তোমার নির্জ্জনে থাকা অভ্যাস জানি, সেইরূপ ব্যবস্থাও হইয়াছে। আশা করি, আমার এই অনুরোধ তোমার কাছে উপেক্ষিত হইবে না। ই. ত—

তোমার গুণমুগ্ধ

ভবতোষ।"

বাল্যবন্ধু ভবতোষের পত্র বার বার পড়িয়া যতীন্দ্রনাথ অদ্যই সন্ধ্যার একস্‌প্রেসে কলিকাতা যাইবার সংকল্প স্থির করিয়াছিল। ভবতোষ শুধু বাল্যবন্ধু নহে, তাহার সতীর্থ। একত্র বসবাস পড়া-শুনা ও খেলাধূলায় শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের প্রথম ভাগ, কি সুখেই না কাটিয়া গিয়াছিল! কোনও প্রসিদ্ধ অভিজাত-বংশে

জন্মগ্রহণ করিয়া, অতুল সম্পত্তির মালিক হইয়াও ভবতোষ তাহার সঙ্গে কিরূপ অসঙ্কোচে মিলামিশা করিতেন—প্রাণ দিয়া তাহাকে ভালবাসিতেন, বিপদে সাহায্য করিতেন, এত শীঘ্র যতীন্দ্রনাথ কখনই তাহা বিস্মৃত হইতে পারে না। সংসারের কোলাহল হইতে সে আপনাকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে সত্য, যশঃ ও প্রতিপত্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা এখন আর তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে না, তাহাও সত্য ; কিন্তু তথাপি বন্ধুর এই অনুরোধ তাহার কাছে অলঙ্ঘ্য আদেশ। তাহাকে যাইতে হইবে।

একটা ব্যাগে প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি গুছাইয়া রাখিয়া যতীন দুইখানি কম্বল, একখানি সতরঞ্চ, একটা বালিস লইয়া একটা ছোট মোট বাঁধিল। তাহার পর দীর্ঘদিনের নিত্য-সহচর দুই মণ ওজনের ডাম্বেল জোড়া একটা চটে জড়াইয়া লইল। কৌতূহলী দর্শকের বিস্ময় ও কৌতুক উৎপাদনের সে একান্তই বিরোধী ছিল।

সকল কার্য শেষ করিয়া যতীন্দ্রনাথ একটা চুরুট ধরাইয়া লইল। সংসারের যাবতীয় ভোগ বিলাসকে সে অনেকদিন বিদায় দিয়াছিল সত্য ; কিন্তু তাম্রকূট-সেবনের অভ্যাসটা সে ত্যাগ করে নাই। যখন কোনও কাজ থাকিত না, কোনও কিছু পড়িতেও ভাল লাগিত না, সেই সময় হয় সে গড়গড়ায় তামাকু সাজিয়া ধূমপান করিত, অথবা একটা বর্ম্মা চুরুট ধরাইয়া লইত।

"বাবা!"

যতীন্দ্রনাথ মুখ ফিরাইয়া চাহিল। তাহার সমগ্র আনন সহসা

যেন মাধুর্য্য-রসে প্লাবিত হইয়া গেল। আসন ছাড়িয়া, বলিষ্ঠ, পেশীবহুল বাহুযুগল প্রসৃত করিয়া সে বালককে বুকে তুলিয়া লইল।

পিতার বিশাল বক্ষোদেশে পরম সুখভরে মুখ রাখিয়া বালক তাহার কোমল বাহুযুগল দ্বারা পিতার গলদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিল। কয়েক মুহূর্ত্ত কেহ কোনও কথা বলিল না। যতীন্দ্রনাথ নিমীলিত-নেত্রে পরম স্নেহাস্পদের স্পর্শসুখ যেন সমগ্র ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপভোগ করিয়া ধন্য হইতেছিল।

কিয়ৎকাল পরে বালক অতি মৃদুস্বরে বলিল, "ঠাকুরমা বল্‌লেন, তুমি না কি কল্‌কাতায় যাচ্ছ, বাবা ?"

পুত্রকে লইয়া সন্নিহিত পালঙ্কে বসিয়া যতীন্দ্রনাথ স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ, বাবা। তুমি লক্ষ্মীটি হয়ে ঠাকুরমার কাছে থেকো। আমি পাঁচ-ছয়দিনের মধ্যে ফিরে আস্‌ব। তুমি যে বন্দুক চেয়েছিলে, এবার কিনে আন্‌ব।"

বন্দুকপ্রাপ্তির আশায় বালকের মন হর্ষে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে তাহার পিতাকে বন্দুক ব্যবহার করিতে দেখিয়া ঐরূপ খেলানা পাইবার জন্য সেদিন পিতার কাছে অতি সঙ্গোপনে নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। তাহার কোনও বাসনা যতীন্দ্রনাথ অপূর্ণ রাখিত না। এই বিশাল সংসারে, তাহার ইহ ও পরকালের একমাত্র সঙ্গিনী—তাহার আত্মা, ও আনন্দ, সুখদুঃখের ভাগিনী পত্নী এই পুত্রটিকে উপহার দিয়া পরপারে চলিয়া গিয়াছে। তদবধি সে আর বিবাহ করে নাই। সেই প্রেম-প্রতিমার পবিত্র

স্মৃতিকে মনোমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া যতীন্দ্রনাথ পুত্রটিকে লালন-পালন করিয়া আসিয়াছে। তাহার বিধবা পিসীমা -যতীন্দ্রনাথের সংসারের যাবতীয় ভার নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলেন। পিসীমা ও পুত্র ছাড়া যতীন্দ্রনাথের সংসারে অন্য কোনও আত্মীয় ছিল না। সে তাই দেশের সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া দেওঘরের বাড়ীতে বসবাস করিতেছিল। পৈতৃক জমীদারীর টাকা নায়েব-গোমস্তা দেওঘরে পাঠাইয়া দিত। তীর্থ-স্থানের মুক্তবায়ুর স্বচ্ছন্দ প্রবাহের প্রভাব পিসীমাকে ভ্রাতুষ্পুত্রের সংসারে চির-প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছিল।

আসন্ন পিতৃবিরহের আশঙ্কায় পুত্রের কোমল হৃদয় ব্যথিত হইলেও বন্দুকপ্রাপ্তির আশা তাহার মুখে আনন্দ আলোক বিকীর্ণ করায় যতীন্দ্রনাথ অপেক্ষাকৃত লঘুহৃদয়ে পুত্রের সহিত নানা অর্থহীন কথার আলোচনা করিতে লাগিল। পুত্রকে ছাড়িয়া সে কোথাও বড় একটা রাত্রিবাস করিত না। পিসীমার স্নেহচ্ছায়ায় প্রতিপালিত হইলেও এই ক্ষুদ্র শিশুটি রাত্রিকালে পিতার শয্যায় শয়ন করিত। যতীন্দ্রনাথ তাহাকে বুকের কাছে না রাখিতে পাইলে যেন স্বস্তি পাইত না। পুত্রও পিতার ক্রোড়ের মধ্যে পরম আরামে নিদ্রা যাইত। ঠাকুরমা ও বাবা এই উভয় প্রাণীর মধ্যে সে কাহাকে অধিক ভালবাসিত, তাহা বলা কঠিন। কারণ, সন্ধ্যার পর পিতা যখন পড়াশুনা লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, তখন সে তাহার ঠাকুরমার স্নেহের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া গৃহহারা রাজপুত্রের অনির্দ্দেশযাত্রা, দুয়োরাণীর দুঃখময় কাহিনী, 'বেঙমা-বেঙমী'র গল্প

কৌতুকভরে শুনিতে শুনিতে নিদ্রার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িত। মধ্য-রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিতে পাইত, সে তাহার পিতার পার্শ্বেই শয়ন করিয়া আছে। পিতা তাহাকে বুকের মাঝে সন্তর্পণে রাখিয়া নিদ্রা যাইতেছেন।

পিতার নিকট হইতে চুমা পাইয়া বালক নাচিতে নাচিতে তাহার ঠাকুরমার কাছে আসন্ন বন্দুকপ্রাপ্তির শুভ সংবাদ জানাইতে গেল। পুত্রের গমনশীল মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিষ্ঠ যুবকের বক্ষোমধ্যে একটা দীর্ঘনিশ্বাস সঞ্চিত হইয়া—নাসাপথে বাহির হইয়া গেল।

আনমনে কিয়ৎকাল বসিয়া থাকিবার পর যতীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে কক্ষের অপর প্রান্তে উঠিয়া গেল। প্রাচীর গাত্রে একখানি তৈল-চিত্র ঝুলিতেছিল। সে সেইখানে স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া আলেখ্যের প্রতি অপলকনেত্রে চাহিয়া রহিল। সে চিত্রখানি তাহার পরলোকগতা পত্নীর। চওড়া লালপাড় শাড়ীর প্রান্তভাগ ললাটস্থ কেশরাজির উপর বিন্যস্ত, সীমন্তের সিন্দূরবিন্দু জ্বল্-জ্বল্ করিতেছে। মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া চাহিয়া যতীন্দ্রনাথ মনে মনে বলিল, "কল্যাণি! তোমার আদরের, বড় সোহাগের সতুকে ছাড়িয়া কয়দিনের জন্য কলিকাতায় যাইতেছি, কর্ত্তব্যের আহ্বানে যাইতে হইতেছে। তুমি নিশ্চয় ইহাতে দুঃখিত হইবে না। আমার মনের কোন্ কথা তোমার অগোচর? আমার কাছে তুমি মৃত নহ। প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত্ত তোমার সান্নিধ্য লাভে আমি ধন্য। তুমি যেমন চাহিয়াছিলে, ঠিক তেমনই ভাবে আমাদের সতুকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা

করিতেছি। যদি কোথাও এতটুকু ভুলচুক ঘটে, কল্যাণি! আমার সে ভ্রান্তি দেখাইয়া দিও।”

বলিষ্ঠদেহ, বলশালী যুবকের নয়নপল্লব অশ্রুসিক্ত হইল। ধীরে ধীরে নয়ন মার্জ্জনা করিয়া যতীন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ নিমীলিত-নয়নে কি ধ্যান করিতে লাগিল। তাহার বিশাল বক্ষোদেশ ঘন ঘন আন্দোলিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

“যতু, তোর হয়েছে?”

পিসীমা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেই যতীন্দ্রনাথ আত্মস্থ হইয়া ফিরিয়া চাহিল। বার্দ্ধক্যের চিহ্ন কেশরাজিতে প্রকটিত হইলেও পিসীমার দেহ তখনও ঋজুতা ও স্বচ্ছন্দগতি-বিশিষ্ট। তাঁহার প্রসন্ন ললাটে রন্ধনাগারের স্মৃতির লেখা—স্বেদবিন্দু তখনও মিলাইয়া যায় নাই।

“খাবার জুড়িয়ে যাচ্ছে, সতু তোর জন্য ব’সে আছে। আর বেলা নেই, সন্ধ্যের গাড়ীতেই ত যেতে হবে। খাবি আয়।”

“চল পিসীমা” বলিয়া যতীন্দ্রনাথ চটি-জুতা পায় দিয়া পিসীমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ রন্ধনাগারের দিকে অগ্রসর হইল।

দুই

"যায়গা নেই, কেমন ক'রে যাবো !"

একদল বালক-বালিকা ও মহিলা-বেষ্টিত দুইজন পুরুষকে ব্যাকুলভাবে এদিক্-ওদিক ঘুরিতে দেখিয়া যতীন্দ্রনাথ থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার সঙ্গের দ্রব্যাদি কুলীর জিম্মায় রাখিয়া নিরুপায় যাত্রীর দলকে বলিল, "আসুন, আমি আপনাদের উঠিয়ে দিচ্ছি।"

যশিদির ষ্টেশন-মাষ্টার হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক কুলী যতীন্দ্রনাথকে চিনিত। তাহার বলবীর্য্যের খ্যাতি, ব্যাঘ্র-শিকারের কাহিনী সে অঞ্চলের স্থায়ী ও দীর্ঘকালের অধিবাসীরা উত্তমরূপেই অবগত ছিল। সকলেই তাহাকে যথেষ্ট খাতিরও করিত।

যাত্রিপূর্ণ গাড়ীগুলিতে তিলধারণের স্থান না থাকিলেও যতীন্দ্রনাথের চেষ্টায় মেয়েদের কামরায় মহিলা ও বালক-বালিকাদের কোনও মতে স্থান হইল। পার্শ্বের কামরায় ভদ্রলোকদিগকে ঠেলাঠেলি করিয়া উঠাইয়া দিতে অনেকটা সময় চলিয়া গেল। কৃতজ্ঞতার বাণী শুনিবার বা অপেক্ষা করিবার সময় আর নাই। যতীন্দ্রনাথ দেখিল, গাড়ী ছাড়িবার উপক্রম করিতেছে। কুলীকে বকসিস্ দিয়া সে দুই মণ ওজনের ডাম্বেল জোড়া স্কন্ধদেশে তুলিয়া লইল এবং ব্যাগ ও বিছানার পুঁটলিটি বাম হাতে ঝুলাইয়া সে দ্রুতপদে চলিল। সকল কামরাই জনপূর্ণ। সহসা সম্মুখের

য়ুরোপীয়দিগের জন্য লেবেলযুক্ত কামরাটি তাহার দৃষ্টিপথে পড়িল। কামরার মধ্যে মাত্র চার-পাঁচজন ফিরিঙ্গী। এই যাত্রিবহুল ট্রেণে পরম আরামে তাহারা একখানি কামরা দখল করিয়া রাখিয়াছে। বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়াই যতীন্দ্রনাথ কামরার দরজায় গিয়া হাতল ঘুরাইল। অমনই কামরার ফিরিঙ্গীগুলি সারমেয়-দলের ন্যায় দরজার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দরজা চাপিয়া ধরিল, কোনও মতেই বাঙ্গালীবেশী যতীন্দ্রনাথকে তাহারা উঠিতে দিবে না।

অনুনয়-বিনয়ের সময় নাই, বাঁশী বাজিয়া উঠিল। ট্রেণ মৃদুগতিতে চলিবার উপক্রম করিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া যতীন্দ্রনাথ স্কন্ধের বোঝাটা অগ্রে জানালা দিয়া গাড়ীর মধ্যে ফেলিয়া দিল। তাহার পর দক্ষিণ হস্তের সাহায্যে হাতল ধরিয়া গাড়ীর উপর ক্ষিপ্রগতিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। ফিরিঙ্গীরা বাধা দিবার পূর্ব্বেই ব্যাগ ও শয্যাটা ভিতরে ফেলিয়া দিয়া দরজা খুলিয়া দিবার জন্য সে সবিনয়ে অনুরোধ করিতে লাগিল।

তখন ট্রেণ অপেক্ষাকৃত বেগে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ট্রেণ প্লাটফরম ছাড়াইয়া গেল। নির্ম্মম ফিরিঙ্গীরা কোনও কথা না শুনিয়া সবলে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু দৃঢ় হস্তে সে গাড়ীর হাতল ধরিয়াছিল বলিয়া তাহাকে স্থানচ্যুত করিতে পারিল না।

দেহে প্রচুর শক্তি ও মনে প্রভূত সাহস সত্ত্বেও যতীন্দ্রনাথ সহসা ক্রুদ্ধ হইত না; কিন্তু একবার দ্বিতীয় রিপুর বশবর্ত্তী হইলে

তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিবার শক্তি কাহারও হইত না। ফিরিঙ্গী গুলির এমন পশুবৎ নিষ্ঠুর ব্যবহারে সে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। ইহারা কি মানুষ? তাহাকে ট্রেণ হইতে ফেলিয়া দিয়া নরহত্যা করিতেও পশ্চাৎপদ নহে!

বিশুদ্ধ ইংরাজীতে সে দৃঢ়স্বরে বলিল, "দরজা খোল।"

অট্টহাস্যের সহিত একজন ফিরিঙ্গী একটা কুৎসিত গালি দিল। যতীন্দ্রনাথের সুগৌর মুখমণ্ডল সহসা আরক্ত হইয়া উঠিল। দরজায় পিঠ দিয়া প্রচণ্ডবেগে সে ভিতরের দিকে দরজা ঠেলিয়া দিল। সে বেগ প্রতিরোধ করিবার সামর্থ্য তাহাদের ছিল না। চাবি দিয়া বন্ধ থাকিলেও সে ভীষণ চাপে হয় ত দ্বার ভাঙ্গিয়া যাইত। হুড়মুড় করিয়া ফিরিঙ্গীগুলা গাড়ীর মধ্যে পড়িয়া গেল। দরজা খুলিয়া গেল। দুই তিন পদাঘাতে তাহাদিগকে সরাইয়া দিয়া যতীন্দ্রনাথ অগ্রে গাড়ীর দরজা বন্ধ করিল।

দরজার ঠেলা ও পদাঘাতের মাধুর্য্য ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া করিয়াছিল। যে ব্যক্তি কুটূক্তি করিয়াছিল, যতীন্দ্রনাথ কামরায় প্রবেশ করিবামাত্র সে তড়াক্ করিয়া 'বাঙ্কের' উপর আশ্রয় গ্রহণ করিল। অপর কয়জন কোটের ধূলা ঝাড়িয়া কটমটভাবে নবাগতের দিকে চাহিয়া রহিল।

নিজের দ্রব্যাদি শান্তভাবে গুছাইয়া রাখিয়া যতীন্দ্রনাথ ফিরিঙ্গীদিগের প্রতি ফিরিয়া বলিল, "তোমরা নরাধম পশু, এক জন মানুষকে খুন করতেও তোমাদের বাধে না।"

অপেক্ষাকৃত প্রবীণ-বয়স্ক একজন ফিরিঙ্গী এক পার্শ্বে

বসিয়াছিল, সে এতক্ষণ কোনও বাদ-প্রতিবাদে যোগ দেয় নাই। সে বলিল, "এ কামরায় তুমি কেন এলে, বাবু? এ কামরা ত য়ুরোপীয়দের জন্য নির্দ্দিষ্ট।"

শ্লেষভরে যতীন্দ্রনাথ বলিল, "য়ুরোপীয় আবার কে? কোট, প্যাণ্ট, টুপী পরলেই য়ুরোপীয় হয় না কি? তা আমারও আছে। দরকার হ'লে—কোট ত গায় আছেই—প্যাণ্ট আর ক্যাপটা বার ক'রে নিলেই তোমাদের মত 'টাঁস্' সাজতে পারি! কিন্তু তা করব না, এই ভাবেই আমি এই কামরাতে যাব।"

ওভারকোটটা খুলিয়া ফেলিয়া যতীন্দ্রনাথ চারিদিকে চাহিতে চাহিতে বলিল, "সে অসভ্যটা কোথায় গেল যে লোকটা ঝাড়ুদার—মেথরের মত ইতরের ভাষায় গালাগালি করেছিল, তাকে গোটা কয়েক কাণমলা দিতে চাই, কোথায় গেল! ঐ বুঝি কাপুরুষটা লুকিয়ে আছে?"

ততক্ষণ যতীন্দ্রনাথ নগ্নদেহ! পরিহিত বস্ত্রখানি বেঞ্চের উপর রাখিয়া সে রীতিমত কৌপীনধারী হইয়া দাঁড়াইল। প্রচণ্ড শীতেও তাহার শরীর দিয়া বিন্দু বিন্দু স্বেদ ঝরিতেছিল।

আলোকিত কক্ষমধ্যে দীর্ঘাকার, বৃষস্কন্ধ, কপাটবক্ষ পুরুষ দণ্ডায়মান। তাহার লৌহদণ্ডবৎ পেশিবহুল মসৃণ বাহুযুগল দেখিয়া ফিরিঙ্গীদিগের বদন শুষ্ক, নয়ন নিষ্প্রভ হইল। সকলে এক পার্শ্বে গুটি মারিয়া বসিল।

যতীন্দ্রনাথ ইংরাজিতে বলিল, "এস—এক একজন ক'রে এলে ম'রে যাবে; সকলে একসঙ্গে এস। বাঙ্গালীর হাতের

দুই চারটা মিঠে কীল কেমন মধুর লাগে, একবার পরখ ক'রে দেখ!"

একবার অঙ্গ ঝাড়া দিয়া যতীন্দ্রনাথ সকলের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিল। ব্যায়ামপুষ্ট দেহ স্ফীততর হইল—আলোকিত কক্ষমধ্যে সে ঋজুতর হইয়া দাঁড়াইল।

রেলের অবিশ্রান্ত গতি; কামরার মধ্যে প্রচণ্ড নীরবতা। আরোহীরা যেন বাক্‌শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে—তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গও বোধ হয় নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছিল।

ভীমদর্শন, শক্তিধর পুরুষের শুভ্র ললাটে শিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল বক্ষোদেশ আন্দোলিত হইতেছিল। যতীন্দ্রনাথ দৃঢ়পদে 'বাঙ্কের' আরোহীর দিকে অগ্রসর হইল।

সহসা আর্ত্তকণ্ঠে যুবক ফিরিঙ্গী বলিয়া উঠিল, "বাবু, ক্ষমা কর। আর কখনও এমন বেয়াদপি হবে না।"

লোকটার ক্ষীণ দেহ থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল।

"আর তোমরা?"

তাহার দৃষ্টিতে যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল। এক জনের বাহু ধরিয়া একটা ঝাঁকানি দিতেই সে কাতর-দৃষ্টিতে যতীন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি। তুমি শান্ত হও।"

তীব্রকণ্ঠে যতীন্দ্রনাথ বলিল, "আমাদের দেশে বাস ক'রে, আমাদের অর্থ শোষণ ক'রে, আমাদের দেশের উৎপন্ন জিনিষে প্রাণ ধারণ ক'রে, আমাদের অপমান করবার সাহস যে তোমাদের

হয়, সে দোষ তোমাদের তত নয়, যত আমাদের নিজের। আর তোমাদেরও বলি, পৃথিবীতে এই ভারতবর্ষ ছাড়া তোমাদের স্থান কোথায়? এই দেশই ত তোমাদের জন্মভূমি। নিজের দেশের লোককে অপমান করলে যে আপনারই অপমান করা হয়, সে জ্ঞানটা তোমাদের কবে হবে? য়ুরোপীয় ব'লে আত্মপরিচয় দিতে তোমাদের একটু লজ্জা হয় না? তোমরা যে য়ুরোপীয় নও, এ কথাটা খাঁটি ইংরাজরা তোমাদের কতরকম ক'রে স্মরণ করিয়ে দেয়, তবু তোমাদের লজ্জা হয় না।"

প্রবীণ ফিরিঙ্গীটি চুপ করিয়া বসিয়া তামাসা দেখিতেছিল। সে বলিল, "বাবু, তুমি ঠিক বলেছ। আমাদের স্থান কোথাও নেই; কিন্তু ভ্রান্ত ধারণা আমাদের মধ্যে এমন ভাবে শিকড় গেঁথে ব'সে আছে যে, আসল সত্যকে আমরা চিনতে পারি নে। যাক— এখন তুমি শান্ত হ'য়ে ব'স। খালি গায় থেক না, বড় শীত। এস, তোমার সঙ্গে গল্প করা যাক্।"

যতীন্দ্রনাথ তখন অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়াছিল। সে ধীরে ধীরে কাপড় পরিয়া জামা-কোট গায় দিল।

প্রবীণ ফিরিঙ্গী একটা ফলের টুকরী বাহির করিয়া, আপেল ও কমলালেবু তুলিয়া লইল। "বাবু, যদি কিছু মনে না কর, দুই একটা নিলে আমি অনুগৃহীত হ'ব।"

ধন্যবাদ জানাইয়া যতীন্দ্র বলিল, "মাপ করবেন, আমি গাড়ীতে কিছু খাইনে। সন্ধ্যার আগেই খেয়ে বেরিয়েছি—কোন প্রয়োজন হবে না।"

বৃদ্ধ বলিল, "তোমার বলিষ্ঠ চেহারা দেখে আমি বড় খুসী হয়েছি।" আমার বিশ্বাস ছিল, তোমরা বাঙ্গালীরা বড় বিলাসী, শারীরিক ব্যায়ামে তোমরা অভ্যস্ত নও।"

মৃদু হাসিয়া যতীন্দ্রনাথ বলিল, "তাই বুঝি আপনারা বাঙ্গালীদের অপমান করবার সুবিধে নিয়ে থাকেন?"

বৃদ্ধ ফিরিঙ্গী বলিল, "আমাদের সম্প্রদায়ের অনেকের মধ্যে হয় ত সে ধারণা থাকতে পারে—সেটা হয় ত মিথ্যা নয়! কিন্তু বাবু, তোমাদের শক্তিচর্চ্চা করা খুব দরকার। শক্তিকে সবাই ভয় করে—শক্তিমান্‌কে সকলেই শ্রদ্ধা ক'রে থাকে।"

যতীন্দ্রনাথ বাহিরের দিকে চাহিয়া কি দেখিতেছিল। মুখ ফিরাইয়া লইয়া সে অনেকটা আপন মনেই বলিল, "বাঙ্গালী সে কথা বুঝতে শিখেছে। আমার জীবনের প্রধান স্বপ্ন, সমগ্র বাঙ্গালা দেশের লোককে শক্তিমান্—বীর দেখে যাব। জানিনে সে স্বপ্ন কবে সার্থক হবে!"

তিন

হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ী না থামিতেই যতীন্দ্রনাথ একবার মুখ বাড়াইয়া প্লাটফরমের দিকে চাহিল। যথাসময়ে সে কলিকাতায় তার করিয়াছিল। যদি কোনও পরিচিত কেহ তাহাকে লইতে আসিয়া থাকে। ভবতোষ সম্ভবতঃ কোনও কর্ম্মচারীকে পাঠাইতে পারেন।

সহসা তাহার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ঐ যে, তাহার চিরপরিচিত, আশৈশবের প্রিয়তম বন্ধু স্বয়ং তাহাকে নামাইয়া লইবার জন্য আসিয়াছেন!

গাড়ী থামিবামাত্র কুলী ডাকাইয়া সে নিজের জিনিষগুলি নামাইয়া রাখিল। সহযাত্রী বৃদ্ধ ফিরিঙ্গীটিও সঙ্গে সঙ্গে জিনিষপত্র সহ নামিল।

তক্‌মা-শোভিত দুই জন দ্বারবান্ ও কর্ম্মচারী সহ ভবতোষ দ্রুতপদে বন্ধুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রসন্নহাস্যে বলিলেন, "তুই আসবি ব'লে আনন্দে সারারাত আমার ঘুম হয়নি, ভাই! সকালে নিজেই চ'লে এলাম।"

যতীন্দ্রনাথ, বন্ধুর আলিঙ্গনপাশ হইতে ধীরে ধীরে মুক্ত হইয়া বলিল, "মহারাজ, নিজে কেন কষ্ট ক'রে—"

বাধা দিয়া ভবতোষ বলিলেন, "মহারাজ?—ওসব চল্‌বে না। সত্যি ভারী রাগ করবো! তোর সঙ্গে কি আমার আপনি বলার সম্পর্ক?"

বৃদ্ধ ফিরিঙ্গী সম্ভবতঃ কিছু বিস্মিত হইয়াছিল। গাড়ীর পরিচিত বীর যুবকটি রাজা-মহারাজার পরিচিত! সে ভবতোষকে চিনিত। টুপী খুলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "মহারাজ আমাকে চিন্‌তে পারেন?"

ভবতোষ তাহার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মিঃ ব্রাউন্ ফিল্‌ড না? তোমাকে কি ভুলতে পারি? যতীন, তুমি এঁর পরিচয় জান না; আমার একটা কলিয়ারীর ইনি এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার ছিলেন। বড় ভাল লোক। মিঃ ব্রাউন্‌ফিল্‌ড, ইনি আমার সতীর্থ যতীন্দ্রনাথ বসু—বিখ্যাত ব্যায়ামবীর।"

ব্রাউন্ ফিল্‌ড সহাস্যে বলিল, "উনি যে ভারী পালোয়ান, তার পরিচয় পেয়েছি। মহারাজ, আপনার এই বন্ধুর মত শক্তিমান্ বাঙ্গালীর সংখ্যা যদি বেশী হ'ত, তবে—"

ভবতোষ হাসিয়া বলিলেন, "হবে, হবে, মিঃ ব্রাউনফিল্‌ড। বাঙ্গালী ক্রমেই শক্তিচর্চ্চায় মন দিচ্ছে। একবার প্রদর্শনী দেখতে যেও, দেখবে, এই বাঙ্গালী পালোয়ানের শক্তি কি রকম। আচ্ছা, এখন বিদায়। ব্রাউনফিল্‌ড, একদিন আমাদের ওখানে বেড়াতে যেও।"

অপর ফিরিঙ্গী যুবকগুলি তখনও প্ল্যাটফরমে এক একটি বিস্ময়-রেখার মত এই দৃশ্য দেখিতেছিল।

যে সময়ের কথা লিখিত হইতেছে, তখন কলিকাতা সহরে মোটরবাস, ট্যাক্সির আধিক্য ঘটে নাই। সম্ভ্রান্ত ধনীরাও সকলে তখন জুড়ী ছাড়িয়া মোটরযান অবলম্বন করেন নাই। অত্যন্ত সৌখীন অভিজাতবংশের দুলালগণ জুড়ীর সঙ্গে সঙ্গে এক একখানা

মোটর রাখিয়া সখ ও আভিজাত্য-মর্য্যাদার পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন মাত্র।

প্ল্যাটফরমের বাহিরে একখানি ল্যাণ্ডো অপেক্ষা করিতেছিল, জিনিষপত্রসহ কর্ম্মচারী ও দ্বারবান্‌যুগল তাহাতে চড়িয়া বসিল। রোল্‌স্ রয়েস্ মোটরে যতীন্দ্রনাথকে লইয়া ভবতোষ আরোহণ করিলেন।

"তোমাকে এখন আমাদের ওখানেই নিয়ে যাচ্ছি, যতীন! জানি, গোলমালে থাকা তোমার অভ্যাস নয়। কাছেই আর একটা বাড়ী তোমার জন্য ঠিক করা আছে; কিন্তু আগে আমার ওখানেই তোমায় নিয়ে যাব, ভাই। অনেকদিন পরে তোমায় পেয়েছি। তা ছাড়া গৃহিণী তোমাকে দেখতে চেয়েছেন।"

যতীন্দ্র ভবতোষের পূর্ব্ব-সৌহার্দ্দ্য অক্ষুণ্ণ আছে দেখিয়া মনে মনে পরিতৃপ্ত হইল। ধনীর দুলালদিগের মধ্যে এমন সহৃদয়তা সে আর কাহারও আচরণে প্রত্যক্ষ করে নাই। এজন্য সত্যই সে ভবতোষকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিত, ভালবাসিত।

বালীগঞ্জের পরিচিত ভবনে মোটর থামিলে, ভবতোষ যতীন্দ্রনাথের হাত ধরিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন। অনেকেই সেখানে তাঁহাদের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সকলের সহিত পরিচয়ের পর ভবতোষ বলিলেন, "ভাই, এ বেলা এখানে একসঙ্গে দু'জনে খাওয়া যাবে। বৈকালে তোমার বাসায় থাকবে।"

যতীন্দ্রনাথ বলিল, "তুমি ত জান ভাই, আমি নিরামিষভোজী, সুতরাং আমার সে সৌভাগ্য ত হবে না।"

সমবেত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন, "আপনি মাছ, মাংস খান না ?"

যতীন্দ্রকে উত্তর দিবার অবকাশ না দিয়াই ভবতোষ বলিলেন, "স্ত্রী-বিয়োগের পর থেকে উনি ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'রে আসছেন। একবেলা হবিষ্যান্ন আহার করেন।"

যুবকটি উত্তেজিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বলেন কি ? মাছ-মাংস না খেয়ে আপনি শরীর এমন বলিষ্ঠ রাখলেন কি ক'রে ?"

বিদ্রূপের লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া যতীন্দ্রনাথ বলিল, "মাছ-মাংস না খেলে কি শরীরে শক্তি-সঞ্চার হয় না—এই আপনার ধারণা ?"

যুবক বলিল, "আমার ত তাই বিশ্বাস। আপনি যে বড় বড় পালোয়ানের সঙ্গে লড়্‌বেন, তা আপনি পারবেন কি ক'রে ? আপনি কি খান, বলুন ত ?"

যতীন্দ্র মৃদুকণ্ঠে বলিল, "সকালে কিছু কাঁচা ছোলা, দ্বিপ্রহরে আতপতণ্ডুলের ভাত, ঘৃত, কিছু আলু, কাঁচাকলা। রাত্রিতে আটার রুটী, তরকারী, কিছু দুগ্ধ। খুব বেশী খেলেই যে গায় বেশী জোর হবে, তা মনে করবেন না। শক্তির কেন্দ্র সংযম।"

যুবক একটু অপ্রতিভভাবে বলিল, "মহারাজের কাছে আপনার অসম্ভব শারীরিক শক্তির গল্প শুনেছিলুম, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। আমার অপরাধ নেবেন না, যতীন বাবু!"

যুবকটি মেডিকেল কলেজ হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া বাহির হইয়াছিল। ভবতোষের নিকট সে সর্ব্বদাই আসিত। তিনিও

তাহাকে বন্ধুর মত ভালবাসিতেন। তাহাকে সম্বোধন করিয়া ভবতোষ বলিলেন, "ললিত, তুমি যতীনের বাসায় থেক, যেখানে বেড়াতে যাবে, সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেও। তুমি ত স্বেচ্ছাসেবক দলের একজন। যতীনের ভার তোমার উপরেই রইল।"

যতীন্দ্রনাথের জন্য যে বাসা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তথায় পাচক ও ভৃত্যের বন্দোবস্ত পূর্ব্বাহ্ণেই ছিল। যতীনের আহারাদির ব্যবস্থা সেখানেই হইবে, তাহার আদেশ দিয়া ভবতোষ বন্ধুর সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পত্নীর সহিত যতীন্দ্রনাথের বাল্যাবধি আলাপ-পরিচয়, ভবতোষের পত্নীর পিত্রালয় ও যতীন্দ্রনাথের বাড়ী একই গ্রামে; পাশাপাশি বাড়ী। এ জন্য যতীন্দ্রনাথকে ভবতোষের পত্নী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করিতেন। তাহাকে দাদা বলিয়াই ডাকিতেন।

চার

"খুকু আমাদের মাণিক! নাড়ব না চাড়্ব না—দেখব খানিক্ খানিক্।"

আদরিণী খুকুরাণী শয্যায় শুইয়া থাকিয়াও আদরে গলিয়া পড়িল। পিসীমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া সে আধ আধ স্বরে বলিল—"আমাল্ পিসীমা!"

তাহার জ্বরতপ্ত ললাটে হাত রাখিয়া যুবতী বলিল, "হাঁ যাদু, আমি তোমারই পিসীমা। এখন এই দুধটুকু খাও। ডাক্তারবাবু এসে এখুনি ভাল ওষুধ দেবেন—জ্বর সেরে যাবে।"

এবার খুকুরাণী কিছুতেই পিসীমার কথা শুনিল না। সে তাহার ক্ষুদ্র, সুন্দর, কচি হাত তুলিয়া ক্রন্দনের সুরে বলিল, "না, খাব না!"

চুমা খাইয়া, আদর করিয়া, নানারূপে ভুলাইয়া যুবতী খুকুরাণীকে কিছু দুগ্ধ পান করাইল। শিশু ক্রমে পিসীমার স্নেহশীতল ক্রোড়ে অর্দ্ধতন্দ্রাচ্ছন্ন পড়িয়া রহিল। তরুণী তাহাকে ক্রোড় হইতে নামাইল না।

বাহিরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল। প্রদীপ্ত বিদ্যুতালোকে কক্ষ সুমুদ্ভাসিত। তরুণী নিদ্রিত শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া কি দেখিতেছিল, সেই জানে। এমন সময়ে দ্বার

খুলিয়া এক জন সুন্দরী নারী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। নবাগতা বলিল, "ঠাকুরঝি' তুমি অনেকক্ষণ খুকীর কাছে ব'সে আছ। এইবার গা ধুয়ে এস, আমি ওর কাছে বসছি।"

তরুণী মৃদুস্বরে বলিল, "খুকী সবে একটু ঘুমিয়েছে, বৌদি। এখন ওকে নাড়াচাড়া করব না, একটু পরে গেলেই হবে। তুমি জোরে কথা বলো না।"

নবাগতা সন্নিহিত একখানি চেয়ারে সন্তর্পণে উপবেশন করিল। ননন্দার দিকে চাহিয়া একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাস তাহার কোমল হৃদয় ভেদ করিয়া বহির্গত হইল। আহা, যমুনার কোলে যদি এমনই একটি শিশু থাকিত! ঊনবিংশবর্ষ বয়স—এখনই তাহার সংসারের সকল সুখে পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়াছে! তবু যদি একটা নাড়িবার চাড়িবার মত ছোট ছেলে অথবা মেয়ে থাকিত, তাহা হইলে জীবনের দীর্ঘপথটা হয় ত এমন মরুময় বোধ হইত না! তাহার খুকুরাণীকে যমুনা কি স্নেহই করে! একদণ্ড নয়নের অন্তরাল করিতে চাহে না। সেই দ্বিপ্রহরে হবিষ্যান্ন গ্রহণের পর খুকীকে লইয়া বসিয়াছে, এক মুহূর্ত্তের জন্য তাহার শয্যাপার্শ্ব হইতে আর নড়িয়া বসিল না। সে শুধু খুকীকে প্রসব করিয়াছে মাত্র; কিন্তু জননীর যাহা কিছু কর্ত্তব্য, সবই ত যমুনা করিয়া আসিতেছে।

"ঠাকুরঝি!"

"আমায় ডাকৃছ, বৌদি?"

খুকীকে আস্তে আস্তে আমার কোলে দিয়ে তুমি একবার

বাইরে যাও। লক্ষ্মী ভাই আমার! সারাদিন ত ওকে নিয়ে বসে আছ; তোমার কোমরে ব্যথাও ধরে না?"

যমুনা বলিল, "আগে ডাক্তার এসে ওর জ্বর দেখে যান, তার পর যাব, ভাই। ওর জন্যে আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে। হঠাৎ এমন জ্বর হ'ল কেন?"

ভ্রাতৃজায়া হাসিয়া বলিল, "তোমার সবতাতেই বাড়াবাড়ি। সামান্য একটু জ্বর হয়েছে, ওতে ভাববার কি আছে, ভাই? দু'দাগ ওষুধ খেলেই সেরে যাবে। নাও ভাই, ওঠ—হাতে মুখে জল দিয়ে এস।"

ভ্রাতৃবধূর আশ্বাসবাক্যে যমুনা কতকটা প্রকৃতিস্থা হইল। তাহার পর বৌদিদির পীড়াপীড়িতে সে ধীরে ধীরে নিদ্রিত শিশুকে কোমল শয্যায় শোয়াইয়া দিল। খুকুরাণী একবার নড়িয়া চড়িয়া কোমল করপল্লবের মৃদুস্পর্শে আবার ঘুমাইয়া পড়িল। তখন শয্যা হইতে যমুনা সন্তর্পণে ভূমিতলে নামিয়া দাঁড়াইল।

"ডাক্তারবাবু এসেছেন," বলিয়া একজন প্রিয়দর্শন যুবক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার পশ্চাতে ডাক্তার।

যুবতী-যুগল ডাক্তারের আগমনে মস্তকের অবগুণ্ঠন ঈষৎ টানিয়া দিল। যমুনা ধীর মন্থর-গতিতে অপর দ্বার দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। তরুণবয়স্ক ডাক্তার একবার তৃষিতনেত্রে সেই দিকে মুহূর্ত্ত দৃষ্টিপাত করিল। তাহার পর ধীরে ধীরে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া রোগশয্যার পার্শ্বে উপবেশন করিল।

খুকুরাণী তখন জাগিয়া উঠিয়াছিল। ডাক্তার তাহার শরীরের

উত্তাপ এবং বুক, পেট প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া বলিল, "না, সর্দ্দিজ্বর বলেই মনে হচ্ছে, কোন ভয় নেই, এর জন্য এত ব্যস্ত হবার কোন প্রয়োজন ছিল না, সুশীলবাবু।"

সুশীল বলিল, "আমরা ত মোটেই ব্যস্ত হই নি, ডাক্তার বাবু। কিন্তু আমার বোন্‌টি আমাকে অস্থির ক'রে তুলেছিল। দারোয়ান চাকর আপনাকে ডাক্‌তে গিয়েছিল, তাতেও নিশ্চিন্ত নয়। শেষে আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে তবে ছেড়েছে। খুকী-অন্ত তার প্রাণ।"

ডাক্তারের আননে একটা প্রসন্ন স্নিগ্ধ ভাব ফুটিয়া উঠিল। ষ্টেথস্‌কোপটা নাড়িতে নাড়িতে সে বলিল, "আপনার ভগিনীর মত স্নেহকোমলা নারীর সংখ্যা খুবই কম দেখা যায়। বাস্তবিক সর্ব্বাংশে এমন গুণবতী নারী—"

ডাক্তারের মুখের কথাটা শেষ হইল না। ভদ্রঘরের সুন্দরী যুবতী বিধবার সম্বন্ধে স্তুতিবাদ শোভন নহে মনে করিতেই তাহার সুন্দর মুখমণ্ডল সহসা আরক্ত হইয়া উঠিল।

সুশীলচন্দ্রের স্ত্রী তখন কন্যার গায় ভাল করিয়া লেপখানা টানিয়া দিতে ব্যস্ত বলিয়া ডাক্তারের দিকে মনোযোগ দিতে পারে নাই। সুশীলচন্দ্রও ডাক্তারের ভাবান্তর বোধ হয় লক্ষ্য করে নাই। সে বলিল, "যমুনা আমাদের কত প্রিয়, তা আপনি হয় ত জানেন না, ডাক্তার বাবু। ওর ভাগ্যবিড়ম্বনায় আমরা মর্ম্মাহত হয়ে আছি। বড় সাধ ক'রে ভাল লেখাপড়া শিখিয়ে, ওকে বেশী বয়সে সুপাত্রেই দিয়েছিলাম। কিন্তু দুই বৎসরের বেশী ওর ভাগ্যে স্বামিসুখ ঘটল

না। আজ প্রায় দু'বৎসর যে কি রাবণের চিতা বুকে জ্বেলে দিন কাটাচ্ছি, তা বলবার নয়। মোহিতকে আপনি জানতেন। সে আপনাদের সঙ্গেই মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারী পাশ করেছিল। কি ভাল ছেলেই সে ছিল! সবই অদৃষ্ট!"

ডাক্তার যেন একটু বিব্রত হইয়াই উঠিয়াছিল। মোহিত তাহারই সতীর্থ এবং পরীক্ষায় সে প্রথম ও ডাক্তার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। সে সব কথা ললিত ডাক্তার কখনও ভুলিতে পারিবে না।

প্রাচীনা পরিচারিকা সোণার মা ইত্যবসরে ঘরের মধ্যে আসিয়া বলিল, "দাদাবাবু, দিদিমণি তোমাকে ডাক্‌ছে।"

ডাক্তার ব্যবস্থাপত্রখানি টেবলের উপর রাখিয়া বলিল, "আমি তা হ'লে এখন আসি। কা'ল সকালে আবার দেখে যাব। ঔষধটা তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াবেন।"

ডাক্তার টুপী লইয়া একটু দ্রুত-চরণে বাহিরের দিকে চলিল। বারান্দায় আসিয়া তাহার উৎসুক দৃষ্টি একবার চারিদিকে নিক্ষিপ্ত হইল। চরিতার্থতা লাভ করিবার মত কিছু না পাইয়া দৃষ্টি ফিরিয়া আসিল। পরিচারক ডাক্তারকে গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গেই চলিল।

পাঁচ

পিতা বহু পূর্ব্বেই গত হইয়াছিলেন। যমুনা যখন আট বৎসরের বালিকা, সুশীল তখন বি, এ পাশ করিয়া দ্বাদশ-বর্ষীয়া মণিমালাকে বিবাহ করিয়াছে। মাতার যত্নে ও চেষ্টায় ভ্রাতা ও ভগিনী লেখা-পড়া শিখিয়াছিল। এঞ্জিনীয়ার পিতা ব্যাঙ্কে পুত্র, কন্যা ও স্ত্রীর জন্য পর্য্যাপ্ত অর্থ জমা রাখিয়া গিয়াছিলেন। কলিকাতায় পাঁচ-ছয়খানা ভাড়াটিয়া বাড়ী, পুরী ও বৈদ্যনাথধামে বিশ্রামভবন, দশ হাজার টাকার মুনাফার জমীদারী সবই তাহাদের ছিল। ছেলেবেলা হইতেই সুশীলের বিলাতে গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিবার বাসনা ছিল। বিবাহের পর সে মাতৃ-আদেশে আজন্মের সাধ পূর্ণ করিতেও গিয়াছিল। কিন্তু জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর মা বেশী দিন ইহলোকে রহিলেন না। যমুনা তখনও অবিবাহিতা। ভগিনীকে ভালরূপে লেখাপড়া শিখাইয়া উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করিবে বলিয়া সে কিশোরী যমুনাকে পাত্রস্থ করে নাই। মাতৃবিয়োগশোক ক্রমে কমিয়া আসিলে, সুশীল প্রাণাধিকা সহোদরাকে আরও যত্নের সহিত লেখাপড়া শিখাইল। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলেও সে সম্পূর্ণরূপে অর্থাৎ বিশ আনা সাহেবীয়ানায় অভ্যস্ত হইতে পারে নাই। সে জন্য ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সে ইংরাজী-জানা প্রবীণ সংস্কৃত অধ্যাপকের নিকট ভগিনীকে দেবভাষা শিখিবারও ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল।

যমুনাধারা

পিতৃমাতৃহারা ভগিনীকে সে এমনই স্নেহ করিত যে, ঘুণাক্ষরেও একদিনও সে যমুনাকে পিতামাতার অভাব বোধ করিতে দেয় নাই। অবকাশকালে সে, পত্নী মণিমালা ও যমুনাকে লইয়া গল্প করিত, খেলা করিত, নানাবিধ বহি পড়িয়া শুনাইত, অথবা নির্দোষ আমোদ-প্রমোদের ক্ষেত্রে লইয়া যাইত। বন্ধু-বান্ধবদিগের সহিত রহস্যালাপে কদাচিৎ সে সময়ক্ষেপ করিত। এজন্য নবীন ব্যারিষ্টার-মহলে এবং বাল্যবন্ধু-সমাজে সুশীল স্ত্রৈণ ও অসামাজিক আখ্যা লাভ করিয়াছিল; কিন্তু সেজন্য সুশীল ভ্রমেও কখনও দুঃখিত বা ক্ষুব্ধ হয় নাই। সে স্ত্রী ও ভগিনীর সুখস্বচ্ছান্দ্যবিধানকেই প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিত।

পঞ্চদশবর্ষ বয়সে যমুনা যখন কূলে কূলে প্রায় ভরিয়া উঠিল, তখন অনেক বাছিয়া সুশীল নসীরামপুরের প্রসিদ্ধ জমীদার পরলোকগত হরকিশোরবাবুর একমাত্র সন্তান মোহিতের সহিত ভগিনীর বিবাহ দিল। মোহিত তখন মেডিক্যাল কলেজ হইতে ডাক্তার হইয়া বাহির হইয়াছে। বিপুল ধন-সম্পত্তির মালিক হইলেও এই খেয়ালী যুবক অর্থোপার্জ্জনের জন্য ডাক্তার হয় নাই। পুরুষানুক্রমে নসীরামপুরের জমীদারবংশ দয়া ও পরোপকারের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। চিকিৎসার অভাবে দরিদ্র পীড়িতগণ অনেক সময় অকালে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করে—তাহাদের দেখিবার কেহ নাই, তাই উদারহৃদয় মোহিত চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল। মোহিতের গুণের ও মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া সুশীল তাহার অতিপ্রিয় ভগিনীকে তাহারই হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল।

মোহিতকে স্বামিরূপে লাভ করিয়া তরুণী যমুনা যে চরিতার্থ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। যৌবন-নিকুঞ্জে তরুণ দম্পতির দিনগুলি পরম আনন্দে অতিবাহিত হইতেছিল। মোহিতের গৃহে যমুনা সেই বয়সেই গৃহিণীর দায়িত্ব লাভ করিয়াছিল। জমীদার-গৃহে পরিজনের অভাব না থাকিলেও গৃহিণীর সিংহাসনশূন্য ছিল। বিবাহের পরই যমুনা স্বহস্তে সকল ভার তুলিয়া লইল। মোহিতচন্দ্র বিদুষী সুন্দরী পত্নীর সাহচর্য্য ও সহায়তায় গ্রামের উন্নতিকল্পে সমগ্র মন নিয়োজিত করিয়াছিল। পরম সুখে তাহাদের অনাবিল প্রেমপূর্ণ জীবনযাত্রা চলিতেছিল। স্বামীর উদার, মহৎ হৃদয়কেও পবিত্র ও স্নিগ্ধ করিতেছিল। এমনই ভাবে প্রায় দুইটি বৎসর তাহাদের পুষ্পাস্তৃত মিলন-পথকে নানা মাধুর্য্যের রসধারায় সিক্ত করিয়া চলিয়া গেল।

সেবার হরিদ্বারে একটা বড় যোগ উপলক্ষে মেলার আয়োজন হইয়াছিল। বহু যাত্রী পুণ্যতীর্থে স্নান করিবার জন্য ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে সমবেত হইতেছিল। এরূপ স্থলে প্রায়ই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। মোহিতের স্বার্থলেশশূন্য উদার হৃদয় জনসাধারণের সেবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে চিকিৎসাবিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছে—এরূপ ক্ষেত্রে তাহার পরিচয় প্রদান না করিয়া সে স্থির থাকিতে পারিল না। পত্নীকে তাহার জ্যেষ্ঠের নিকট রাখিয়া মোহিত হরিদ্বারযাত্রা করিল। যমুনা স্বামীর অনুগামিনী হইবার জন্য জিদ ধরিয়াছিল; কিন্তু মোহিত তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, যমুনা যদি সঙ্গে থাকে, তাহা হইলে সে তাহার কর্ত্তব্য

সম্পূর্ণভাবে পালন করিতে পারিবে না, তীর্থক্ষেত্রের ভীড়ে পত্নীর জন্য অনেক সময় তাহাকে বিব্রত থাকিতে হইবে। তরুণী যমুনা স্বামীর যুক্তি যে না বুঝিল, তাহা নহে, কিন্তু স্বামীর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া কিছু দিন যে তাহাকে একাকিনী যাপন করিতে হইবে, এই বেদনাই তাহার হৃদয়কে পীড়িত করিল। বিবাহের পর সে স্বামিসঙ্গ ত্যাগ করিয়া এক দিনও অন্যত্র থাকিতে পারে নাই। ভ্রাতাকে দেখিতে আসিবার সময়ও সে মোহিতকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিত। তাহার ঈষৎ ম্লান আননে উৎকণ্ঠার ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে দেখিয়া মোহিত যখন পরম আদরে, তাহাকে ধৈর্য্য ধরিয়া কয়েক দিন থাকিবার জন্য অনুরোধ করিল, তাহার বলিষ্ঠ বাহুযুগলের মধ্যে টানিয়া লইয়া পত্নীর কাণে কাণে অস্ফুট গুঞ্জনে নানাকথা শুনাইল, তখন যমুনার অভিমানাহত ক্ষুদ্র হৃদয়ের ব্যথা অন্তর্হিত হইয়া গেল। স্বামীর পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইয়া সে মোহিতকে অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল-মুখে বিদায় দিল।

কিন্তু সেই দর্শনই যে তাঁহার শেষ দর্শন, যমুনা তখনও তাহা কল্পনা করিতে পারে নাই। কেই বা পারে? উৎসাহ, উদ্যম ও ভালবাসা-পূর্ণ তরুণ যৌবনের উচ্ছ্বাসভরা জীবন লইয়া স্বামী কয়েক দিনের জন্য কোনও মহৎকার্য্যের উদ্দেশে চলিয়া গেল, সে যে চিরদিনের বিদায়যাত্রা, তাহা কোন্ স্ত্রী কল্পনা করিতে পারে? যমুনা স্বামীর প্রত্যাবর্ত্তনের পথ চাহিয়া দিন গণিতে লাগিল। তাহার পর এক দিন যে ভীষণ সংবাদ আসিল, তাহার ফলে ছিন্নমূল ব্রততীর মত যমুনালতা যেন শুকাইয়া গেল।

সুশীলচন্দ্র তারযোগে সংবাদ পাইল—সেবা-সঙ্ঘের এক ব্যক্তি তাহাকে জানাইয়াছে—হরিদ্বারের গঙ্গাগর্ভ হইতে জলমগ্ন এক বালককে তুলিতে গিয়া প্রবল স্রোতো-ধারায় মোহিতচন্দ্রের প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। এই দুঃসংবাদের কথা সুশীল প্রথমতঃ কাহাকেও জানাইল না। নিজের পত্নীকে পর্য্যন্ত নহে। সংবাদ পাইবামাত্র সে কয়েক জন লোক লইয়া হরিদ্বারে চলিয়া গেল। যমুনা দাদার আকস্মিক হরিদ্বার-গমনের সংবাদে বিচলিত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে সঙ্গে যাইবার জন্য জিদ ধরিয়াছিল; কিন্তু নানাকথায় সহোদরাকে ভুলাইয়া, রাবণের চিতার আগুন বুকে জ্বালিয়া সুশীল মেলাক্ষেত্রে পৌছিল। অনুসন্ধানে সে জানিতে পারিল, ঘটনা সত্য। কর্ত্তৃপক্ষ শবদেহ তখনও জ্বালাইয়া দিবার অনুমতি দেন নাই। ক্ষত-বিক্ষতদেহ ও জলমগ্নাবস্থায় বিকৃতশরীর হইলেও সুশীল বুঝিল যে, মৃতদেহ মোহিতেরই। শোকে, অবসাদে সে অভিভূত হইলেও ভগিনীপতির মৃতদেহ সে সযত্নে সৎকার করাইল। মেলাস্থলের বহু কর্ম্মীর নিকট সে এই ধনী সন্তানের সেবাপরায়ণতা ও আত্মোৎসর্গের কত অবদান-কথাই না জানিতে পারিল! ঘটনার পূর্ব্ব-দিবস প্রচুর বারিপাত হইয়া গঙ্গার কলেবর বৃদ্ধি পাইয়াছিল, জলের খরস্রোতোধারাও যেন শতগুণ শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল! একটি দ্বাদশবৎসর বয়স্ক বালক পদস্খলিত হইয়া খরস্রোতের মধ্যে পড়িয়া যায়। সহস্র সহস্র দর্শক তথায় দণ্ডায়মান ছিল। সেই বালকের প্রাণরক্ষার জন্য কোনও সাহসীর সাহসে কুলাইল না। মোহিতচন্দ্র কয়েক জন রোগীর সেবা করিবার পর

সেই মুহূর্ত্তে ঘটনাস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল । সে কাহারও নিষেধ না শুনিয়া সলিলগর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িল। বালককে স্রোতবেগ হইতে রক্ষা করিয়া কুলে তুলিবার জন্য সে অপূর্ব্ব কৌশলে তীরের দিকে ফিরিয়া আসিতেছিল, সেই সময়ে আর একটা প্রবল জলোচ্ছ্বাস আসিয়া উভয়কে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল। পরে অনেক অনুসন্ধানে মোহিতের মৃতদেহ প্রায় দুই মাইল দূরবর্ত্তী একস্থানে আবিষ্কৃত হয়।

পরের জন্য এই আত্মোৎসর্গকর অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিয়া সুশীল আর অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না। সার্থক মোহিতের জন্ম। কিন্তু যমুনা—তাহার সহোদরা? তাহার তরুণ জীবনে এ কি নিদারুণ বজ্রাঘাত! কেমন করিয়া জীবনের দীর্ঘপথ সে নিরাপদে অতিক্রম করিবে? নিরবলম্ব জীবনের সহস্র ত্রুটি-বিচ্যুতির আশঙ্কা কল্পনা করিয়া সুশীলচন্দ্র শিহরিয়া উঠিল। দুর্ভাবনার বোঝা লইয়া সে যখন গৃহে ফিরিয়া আসিল, তখন কথাটা আর গোপন করিয়া রাখা চলিল না। শুভ্রবসনা, নিরাভরণা ভগিনীর মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার হৃদয় শতধা চূর্ণ হইল। তাহার সমস্ত অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। না—না, সে সহোদরার এ মূর্ত্তি কখনই সহ্য করিতে পারিবে না। কোনও মতেই নহে।

প্রস্তর-ক্ষোদিত মূর্ত্তির মত যমুনার ভাবলেশহীন আনন দেখিয়া সে ক্ষিপ্তপ্রায় হইল। যমুনার বৈধব্য দূর করিবার কি কোনও উপায় নাই? এই বয়সে সে কেন এমন জীবন-যাপন করিবে? সে সামাজিক শাসনকে গ্রাহ্য করে না; সময়ের প্রয়োজনে যে

ব্যবস্থা এক দিন সমাজের আচার্য্যগণ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, চিরদিনই যে তাহা অব্যাহত থাকিবে, ইহার সার্থকতা তাহার বিদ্রোহী মন স্বীকার করিতে চাহিল না। সে মনে মনে স্থির করিল, যমুনার এই অবস্থান্তরের পরিবর্ত্তনসাধন করা তাহার একান্ত কর্ত্তব্য।

অনেক আলোচনা, তর্ক, অভিমান ও অশ্রুবিসর্জ্জনের পর সুশীল যমুনাকে শ্বেত বস্ত্র ত্যাগ করাইল, এবং দাদার মনস্তুষ্টির জন্য সহোদরা শুধু করপ্রকোষ্ঠে মাত্র কয়েকগাছি সোনার চুড়ী ধারণ করিল। কিন্তু একবেলা অন্নাহার—হবিষ্যান্নভোজন হইতে সুশীলের কোনও যুক্তি যমুনাকে বিচলিত করিতে পারিল না। সুশীলচন্দ্র যমুনাকে বুঝাইয়াছিল যে, মোহিতের মৃতদেহ বিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল, সে দেহ যে অভ্রান্তভাবে মোহিতেরই, এ বিষয়ে তাহার সন্দেহের নিরসন হয় নাই। সুতরাং পূর্ণমাত্রায় বিধবা সাজিবার অধিকার হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে যমুনার নাই।

অগ্রজের এই যুক্তিতে যমুনা সায়ও দেয় নাই অথবা প্রতিবাদও করে নাই। তর্ক করিবার মত মানসিক অবস্থা তাহার ছিল না, বিশেষতঃ পরম স্নেহময় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত সে কোনও দিন তর্ক করিতে শিখে নাই। তাঁহার বাক্যকে সে আদেশের মতই চিরদিন পালন করিয়া আসিয়াছে। জীবনের অন্যতম সুবৃহৎ ব্যাপারেও সে তর্কের ধার দিয়া গেল না। দাম্পত্য-জীবনের সকল সাধ শেষ হইয়া গিয়াছে—স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু নারী-জীবনের সুখের আশাপ্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে—তবে দাদার মনে তর্কজাল বিস্তার

করিয়া, দুঃখের বোঝা ভারী করিয়া তুলিয়া ফল কি? এইরূপ চিন্তাধারাই কি তাহাকে নীরব রাখিয়াছিল?

স্বল্পভাষিণী তরুণী; শান্ত আননে যথাসাধ্য প্রসন্নতার দীপ্তি ফুটাইয়া তুলিয়া, সহোদরের সংসারে আপনাকে বিলাইয়া দিল। গৃহকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যচর্চ্চা, শাস্ত্রগ্রন্থপাঠ করিয়া ক্রমে সে অশান্ত মনকে শান্তির পথে পরিচালিত করিতেছিল।

স্বামীর বিস্তৃত জমীদারীর মালিক সে। প্রাচীন দেওয়ানজীর উপর জমীদারী পরিচালনের ভার দিয়া সে বৎসরের অধিকাংশ সময় দাদার সংসারেই বাস করিত। সে নির্ব্বান্ধব পুরীতে বাস করিতে তাহার হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিবে বলিয়া সুশীল তাহাকে তথায় যাইতে দিত না।

ছয়

"শুনছ, একবার এদিকে এস না।"

স্বামীর আহ্বানে মণিমালা তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। অদূরে তুষারশুভ্র শয্যার উপর খুকুরাণী ঘুমাইতেছিল। সকালবেলাই তাহার জ্বরত্যাগ হইয়াছিল। ডাক্তারের অনুমান সত্য—সামান্য সর্দ্দিজ্বর, দুই দাগ ঔষধেই সারিয়া গিয়াছিল।

মধ্যাহ্ন-আহারের পর অন্যকক্ষে যমুনা বিশ্রাম করিতেছিল। গত রাত্রিতে তাহার নিদ্রা হয় নাই। প্রায় সমগ্র রজনী সে খুকুরাণীর পার্শ্বে বসিয়াই কাটাইয়া দিয়াছিল।

"কি বল্‌ছিলে?"

"ব'স না—এখন ত কোন কাজ নেই। একটা কথা আছে।"

স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া মণিমালা পার্শ্বে উপবিষ্ট হইল।

সুশীল পত্নীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "ললিত ডাক্তারকে তোমার কেমন মনে হয়?"

এই আকস্মিক প্রশ্নের কোন অর্থ বুঝিতে না পারিয়া মণিমালা প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিল।

মৃদুস্বরে সে বলিল, "তোমার কথার মানে বুঝলাম না।"

সুশীল বলিল, "ডাক্তার হিসাবে নয়; পাত্র হিসাবে ললিত ডাক্তার কি মন্দ?"

মণিমালা বুঝিল, তাহার স্বামীর মনে কোন্ ভাবের ধারা বহিতেছে। সে সুশীলচন্দ্রের আননে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বলিল, "দেখতে শুন্‌তে ত ভালই। ডাক্তারীতে পসার ত হচ্ছে শুনতে পাই। ঘরের খবর তোমরা জান। পাত্র মন্দ কি!"

সুশীল কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল, "আমাদেরই পালটি ঘর। বাপ-মা কেউ সংসারে নেই, তবে ব্যাঙ্কে মোটা টাকা আছে। আমি ভাবছি, যমুনার সঙ্গে চেষ্টা করা যায় না কি?"

মণিমালা বলিল, "বিধবা-বিবাহে ডাক্তারবাবুর মত হবে?"

সুশীল বলিল, "আমি অনেক দিন থেকে ললিতবাবুর উপর নজর রেখেছি। ওঁর বন্ধু-বান্ধবদের কাছে শুনেছি, বিধবা-বিবাহে কোন আপত্তি নেই। তা ছাড়া যমুনার সম্বন্ধে আমার মনে হয়, ডাক্তারবাবুর বেশ ঝোক আছে।"

মণিমালা হাসিয়া বলিল, "বটে! গোয়েন্দাগিরিও করা হয় না কি?"

সুশীল বলিল, "তা একটু আধটু না করলে চলে না। বিশেষতঃ যমুনার মত বিধবা বোন্ যার ঘরে আছে; তাকে একটু চোখ খুলে, কাণ খাড়া ক'রে থাকৃতে হয় বৈ কি।"

"ললিতবাবু যোগ্য পাত্র; কিন্তু ঠাকুরঝির মনের সংবাদটা ত নেওয়া দরকার।"

সুশীল মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, সেটা ত খুবই দরকার। কিন্তু তার কি মত হবে না?"

মণিমালা দূরে—জানালার বাহিরে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "কি জানি !"

চিরন্তন সংস্কার তাহার চিত্তকে কি এ বিষয়ে নিরুৎসাহ করিয়া তুলিয়াছিল ?

সুশীল ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "দেখ, তার মত হবে না ব'লে আমার বিশ্বাস নেই। কেন হবে না ? মোহিতের স্মৃতি কি এখনও মনে ক'রে রেখেছে ? যাকে পাওয়া যাবে না, তার কথা মনে ক'রে রেখে লাভ ত নেই।"

মণিমালা হাসিল—সে হাস্যে প্রসন্নতা নাই, শুধু একটা করুণ রেখার বিকাশমাত্র। সে নারী—হিন্দুর, বাঙ্গালীর ঘরের কুলবধূ। আজন্মের সংস্কার—আবহমানকাল ধরিয়া যে ভাবধারা ভারতবর্ষের অস্থিমজ্জায়, ফল্গুপ্রবাহের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে, তাহার স্নিগ্ধ মাধুর্য্য যে তাহারও অন্তরের সমস্ত স্থানটা অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। ভগবান্ না করুন, যদি আজ যমুনার দুর্দ্দশা তাহার ঘটে, কয়েক বৎসরের মধ্যেই কি সকল স্মৃতি হৃদয় হইতে ধুইয়া মুছিয়া যাইবে ?

সে শিহরিয়া উঠিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। অন্তরের ভিতর হইতে একটা নির্ব্বেদ যেন মত্তহস্তীর বল ধারণ করিয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিল। সে তাড়াতাড়ি চক্ষু চাহিয়া স্বামীর অঙ্গে আপনাকে নিবদ্ধ করিয়া দিল।

সুশীল তাহার মনের কথা বুঝিল না। সে বলিয়া উঠিল, "তোমার আবার কি হ'ল ?"

"কিছু না," বলিয়া সে সমস্ত দুশ্চিন্তাকে তাড়াইয়া দিয়া সহজভাবে স্বামীর দিকে চাহিল। তাহার সমগ্র চিত্ত তখন যেন ভাষাময় হইয়া বলিতে চাহিতেছিল, ভগবান্! এমন দুর্দ্দশার পূর্ব্বে সে যেন ইহলোক হইতে বিদায় লইতে পারে।

স্বামী ও স্ত্রী অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। অদূরে একটা ত্রিতল অট্টালিকার চিলের ছাদের উপর একজোড়া পারাবত বসিয়াছিল। মণিমালা সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিল।

সুশীল বলিল, "তুমি একবার কৌশলে যমুনার মনের ভাবটা জেনে নিও, মণি। তাকে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করবার দুঃখ থেকে মুক্ত করাই আমার জীবনের একটা প্রধান ব্রত; তা ত তুমি জান।"

মণিমালার সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাহার সোদরাধিকা ননন্দাকে, কোনও সংসারের গৃহলক্ষ্মীরূপে প্রতিষ্ঠিতা হইতে দেখিলে সে-ও আনন্দ লাভ করিবে। স্বামী ও পুত্র-কন্যা-পরিবেষ্টিত সুখের সংসার কোন্ নারীর না কাম্য? কিন্তু—

মণিমালা বলিল, "তা আমি চেষ্টা ক'রে দেখব। বড় চাপা মেয়ে তোমার বোন্‌টি।"

"এখনই তাড়াতাড়ি নেই। ধীরে সুস্থে অবসর বুঝে তুমি ব'লে দেখো। তার মতের বিরুদ্ধে আমি কোন কাজ করব না; কিন্তু তাকে সংসারী করতে না পারলে আমার মনে সুখ হবে না। ভাল কথা, কা'ল সন্ধ্যার পর তোমাদের দু'জনকে নিয়ে স্বদেশী

মেলা দেখতে যাব। ভবানীপুরে—পোড়াবাজারের কাছে বিরাট মেলা বসেছে। যমুনাকে ব'লে রেখ।"

এমন সময় নিদ্রাভঙ্গে খুকুরাণী ডাকিয়া উঠিল, "মা!"

মণিমালা কন্যার কাছে উঠিয়া গেল। তার গায় হাত দিয়া দেখিল, জ্বর আসে নাই। সে কন্যাকে বুকের উপর তুলিয়া লইল।

সাত

ভবানীপুর পোড়বাজারের কাছে বর্ত্তমানে যেখানে "আলেকজান্দ্রা" কোর্ট অবস্থিত, সেইখানে পূর্ব্বে বিস্তৃত ময়দান ছিল। সেই উন্মুক্ত ক্ষেত্রে সেবার কংগ্রেসের মণ্ডপ স্থাপিত হইয়াছিল। উহার বিপরীত দিকে রাজপথের পার্শ্বে পূর্ব্বকালে ট্রামের ডিপো ছিল। ঘোড়ার ট্রামগাড়ী বৈদ্যুতিক ট্রামগাড়ীতে পরিণত হওয়ায় সেই ডিপো উঠিয়া যায়। এখন সেখানে প্রসিদ্ধ "ক্যালকাটা" ক্লাব অবস্থিত। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ট্রাম-ডিপো উঠিয়া গিয়া স্থানটি খালি পড়িয়াছিল। এখনও ক্যালকাটা ক্লাবের পর অনেকটা স্থান শূন্য পড়িয়া আছে—মাঝে মাঝে তথায় সার্কাস ও মেলা বসিয়া থাকে। স্বদেশী যুগের আমলে এখানে বিরাট মেলা বসিয়াছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে নানাবিধ স্বদেশী শিল্পজাতদ্রব্য প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে সমানীত হইয়াছিল। দেশনেতৃগণের প্রাণপণ চেষ্টা ফলে সেই মেলাক্ষেত্রে নবজাগ্রত ভারতবাসী তাহাদের পরিশ্রমজাত দ্রব্য-সম্ভারে সমগ্র দেশের সম্মুখে আশার স্বর্গ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তখন সাহিত্য-সম্রাট্, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত আসমুদ্র-হিমাচলে অনুরণিত হইয়া দেশবাসীর প্রাণে এক উন্মাদনা আনয়ন করিয়াছিল। এই মেলা যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তেমন লোক বাঙ্গালা দেশে এখনও লক্ষ লক্ষ

জীবিত আছেন। সেই দৃশ্যে বাঙ্গালী ভাবিয়াছিল, যদি এমনই ভাবে আত্মবিস্মৃত জাতি দীর্ঘনিদ্রা-ভঙ্গের জড়তা পরিহার করিয়া, আপন পায় ভর দিয়া উঠিতে পারে, তাহা হইলে নবজীবনের প্রেরণা তাহাকে মানুষ করিয়া জগতের সম্মুখে একদিন গৌরবের আসন প্রদান করিবে না, কে বলিতে পারে?

এক দিকে কংগ্রেস-মণ্ডপ, অপর দিকে বিরাট মেলা—প্রত্যহ সহস্র সহস্র দর্শক—নর-নারী মেলা দেখিতে আসিতেছিল। প্রশস্ত রাজপথে গাড়ী-ঘোড়ার ভীড় সকল সময়েই লাগিয়া রহিয়াছে। বঙ্গভঙ্গজনিত নিদারুণ ক্ষোভে বাঙ্গালার জাতীয় জীবন তখন ব্যথিত, প্রপীড়িত। সেই বেদনার বাণী সারা ভারতবর্ষকেও আহত করিয়াছিল। তাহারই ফলে কলিকাতায় দেশীয় শিল্পবাণিজ্য-প্রকরণের অপূর্ব্ব সমাবেশ। বাঙ্গালী দর্শক ত জন্মভূমিজাত পণ্য-সম্ভার দেখিবার জন্য অসীম আগ্রহে সুদূর-পল্লী হইতে আসিয়াছিল—ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতেও যাত্রিসমাগম উপেক্ষণীয় ছিল না।

শীতের কুয়াসাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় মেলাক্ষেত্র দর্শকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। রাজপথের উভয় পার্শ্বেই গাড়ী-ঘোড়ার অসম্ভব ভীড়। গ্যাসের আলো কুজ্ঝটিকার ঘনান্ধকার সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিতে পারিতেছিল না।

যতীন্দ্রনাথ ললিত ডাক্তারের সহিত মেলাক্ষেত্র দেখিয়া বেড়াইতেছিল। ডাক্তারের বক্ষোদেশে স্বেচ্ছাসেবকের নিদর্শন-সূচক একটি রেশমের ফুল সংলগ্ন ছিল। চিত্রাগার, বস্ত্রাগার প্রভৃতি

নানা দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করিয়া যেখানে মল্লযুদ্ধের প্রদর্শনী হইবে, উভয়ে তথায় উপস্থিত হইল। পরদিবস যতীন্দ্রনাথকে ভারতবর্ষীয় শ্রেষ্ঠ মল্লগণের সহিত বলপরীক্ষা করিতে হইবে। সে জন্য মল্লক্ষেত্রটি সে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল। বস্ত্রাবাসের মধ্যস্থ ব্যায়াম-ক্ষেত্রটি মল্লদিগের বল-পরীক্ষার উপযোগী করিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল, দেখিয়া যতীন্দ্র প্রীত হইল। দীর্ঘকাল ধরিয়া শক্তিসাধনায় অবহিত থাকিয়া সে যে বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছে, পরীক্ষাকালে সে কি তাহা প্রয়োগ করিয়া বাঙ্গালীর মুখ রক্ষা করিতে পারিবে না? তাহার বলিষ্ঠদেহের মধ্যে রক্ত যেন ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে ব্রহ্মচারীর ন্যায় সংযমে অভ্যস্ত, শরীরকে সে কোনও দিন অসংযমের পথে চলিতে দেয় নাই। পত্নীবিয়োগের পর হইতেই মনকে সে অপবিত্র চিন্তার সংস্পর্শ হইতে সর্ব্বদা দূরে রাখিয়া আসিয়াছে—লৌহ-দৃঢ় শরীরের ন্যায় তাহার চিত্তও অনমনীয়—কোনও প্রলোভন তাহার মনের শক্তিকে এতটুকু আহত করিতে পারে নাই। শক্তিরূপিণী জননী অবশ্যই তাঁহাকে সাফল্য দান করিবেন। ভারতবর্ষের মল্লযুদ্ধ-কৌশল সে নানা ব্যায়াম-বীরের নিকট হইতে আয়ত্ত করিয়াছে, তাহা ছাড়া জাপানী মল্লযুদ্ধের অপূর্ব্ব কৌশল-সমূহ এতদিন ধরিয়া যে সে শিক্ষা করিয়া আসিয়াছে, তাহা কি ব্যর্থ হইবার?

মনে মনে অনন্ত শক্তিরূপা জননীকে প্রণাম করিয়া সে মেলাক্ষেত্রের বাহিরে আসিল। ললিত ডাক্তার তাহাকে মল্লযুদ্ধ সংক্রান্ত নানা বিষয়ের প্রশ্ন করিতেছিল।

উজ্জ্বলালোকে মেলাক্ষেত্রটি পরম রমণীয় দেখাইলেও কুজ্ঝটিকার আবরণ তখনও অন্তর্হিত হয় নাই। তোরণের বাহিরে আসিয়া উভয়ে গল্প করিতে করিতে মন্থরগতিতে উত্তরের দিকে চলিল। রাজপথে নভোরেণুর যবনিকা তুলিতেছিল—গ্যাসের আলো যেন ম্লান। দর্শকদিগের জুড়ী, ফিটন প্রভৃতি সারি সারি দাঁড়াইয়া আছে। তখন মোটর-বাসের যুগ নহে। কদাচিৎ দুই একখানি মোটর কোথাও অপেক্ষা করিতেছিল।

ললিত ডাক্তার বলিল, "আমাদের গাড়ীখানা আবার কোথায় দাঁড়াল ?"

যতীন্দ্র বলিল, "এত ব্যস্ত কি ? আসুন, বাইরে খানিক বেড়ান যাক্। এখনও আটটা বোধ হয় বাজেনি।"

উভয়ে অগ্রসর হইল। কুয়াসার অন্ধকারে এ-পার হইতে রাস্তার ওপারের লোক চেনা যায় না।

ললিত ডাক্তার কয় দিনেই যতীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আলোচনাফলে সে জানিতে পারিয়াছিল, এই ব্যক্তিটি শুধু বলের চর্চ্চা করিয়াই অসাধারণ হইয়া উঠে নাই ; এই বিশালকায়, বলিষ্ঠ যুবকের দেহের অন্তরালে কল্পনাপ্রবণ মধুর হৃদয়টি আরও লোভনীয়। যতীন্দ্রনাথ একাধারে ব্যায়ামবীর, চিত্রশিল্পী এবং সাহিত্যিক। সঙ্গীতবিদ্যাও যতীন্দ্রনাথের অনধিগত নহে।

মুগ্ধ ভক্তের সহিত গল্প করিতে করিতে যতীন্দ্রনাথ অগ্রসর হইতে লাগিল। অদূরে সার্কুলার রোড ও চৌরঙ্গী রোডের সংযোগ

স্থল। এদিকে গাড়ী-ঘোড়ার ভীড় নাই বলিলেই হয়। শুধু একখানি বাড়ীর গাড়ী কুয়াসায় আচ্ছন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

সহসা উভয়েই চমকিয়া উঠিল। নারীকণ্ঠের চাপা আর্ত্তনাদ নহে কি? শব্দ লক্ষ্য করিয়া উভয়ে সেই গাড়ীর দিকে দৌড়িল। তাহাদের অনুমান মিথ্যা নহে। যতীন্দ্রনাথ চকিত দৃষ্টিতে দেখিল, এক ব্যক্তি ঘোড়ার মুখরজ্জু ধরিয়া রহিয়াছে। আর একজন গাড়ীর সহিস অথবা কোচম্যানকে ভূমিতলে চাপিয়া ধরিয়া তাহারই পাগড়ী অথবা উত্তরীয় দিয়া তাহার মুখ ও হাত-পা বাঁধিতেছে, তৃতীয় ব্যক্তি গাড়ীর ভিতর মাথা প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছে। গাড়ীর মধ্য হইতে শঙ্কিতা নারীর অস্ফুট চীৎকার! মুহূর্ত্ত দৃষ্টিপাতে যতীন্দ্রনাথ ব্যাপারটা বুঝিয়া লইল। বেশভূষায় তাহারা যে জাহাজের গোরা খালাসী, তাহা অনুমান করিতে বিলম্ব হইল না।

একলম্ফে যতীন্দ্রনাথ যে পাষণ্ড গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, তাহার স্কন্ধদেশ বজ্রদৃঢ়ভাবে চাপিয়া ধরিল। পর-মুহূর্ত্তে তাহাকে টানিয়া ফুটপাতের উপর নামাইল। খালাসীটা তাহার আক্রমণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ করিল। কিন্তু চিরদিনের অভ্যস্ত শক্তিসাধনা যতীন্দ্রনাথকে অপর্য্যাপ্ত সামর্থ্যের অধিকারী করিয়াছিল। স্বল্পায়াসে সে তাহাকে কায়দা করিয়া ফেলিল। কিন্তু দ্বিতীয় গোরা খালাসীটা ব্যাপার দেখিয়া বন্ধুর সাহায্যার্থ ছুটিয়া আসিল। গাড়োয়ানকে সে ইতিমধ্যে বাক্ ও চলচ্ছক্তিহীন অবস্থায় বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল।

দ্বিতীয় খালাসী যতীন্দ্রনাথের পৃষ্ঠদেশে আপতিত হইয়া বজ্রমুষ্টি

প্রহার করিয়া বন্ধুকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ তখন প্রথম খালাসীর গলদেশ তাহার দক্ষিণ পদের বন্ধনীর মধ্যে অপূর্ব্ব কৌশলে চাপিয়া ধরিয়াছিল। তার পর সে দক্ষিণ বাহু ঘুরাইয়া প্রহাররত গোরাটার একখানা হাত কয়েকবার চেষ্টার পর ধরিয়া ফেলিল। সে প্রচণ্ড মুষ্টিবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া সহজসাধ্য নহে। যুযুৎসু কৌশলে গোরাটাকে সম্মুখে টানিয়া আনিয়া যতীন্দ্রনাথ বহু চেষ্টায় তাহাকে বাম-কুক্ষিদেশে চাপিয়া ধরিল। এদিকে তৃতীয় খালাসী বিপদ দেখিয়া ঘোড়ার মুখ ছাড়িয়া দিয়া যতীন্দ্রের উপর আপতিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় খালাসীর সহিত যখন যতীন্দ্রনাথ ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতেছে, সেই অবকাশে সে তাহার শুকরমাংসপুষ্ট মুষ্টি যতীনের পৃষ্ঠদেশে নির্দ্দয়ভাবে বর্ষণ করিতে লাগিল। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আয়ত্ত করিয়া শক্তিধর যতীন, তৃতীয় ব্যক্তিকেও পূর্ব্বরূপ কৌশলে সম্মুখে টানিয়া আনিল। তার পর বহু আয়াসে তাহাকেও দক্ষিণ-কুক্ষিগত করিয়া ভীষণ শক্তিপ্রয়োগ করিয়া চাপ দিতে লাগিল। অসুরবৎ তিনটি গোরা পালোয়ান তাহার কবল হইতে মুক্তিলাভের বহু চেষ্টা করিল; কিন্তু পারিল না। অবশেষে চাপের প্রভাবে একজনের জিহ্বা প্রায় বাহির হইয়া পড়িল। যতীন্দ্রনাথ তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিল। গোরাটা নির্জ্জীব ফুটপাথের উপর পড়িয়া গেল। অপর দুই জন রুদ্ধশ্বাসে ভাঙ্গা ইংরাজিতে বলিল, "বাবু, ঘাট হয়েছে ছেড়ে দাও।"

যতীন্দ্রনাথ একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। ললিত

ডাক্তার কোথায় গেল? গোলমাল দেখিয়া সে কি আধুনিক যুগের বাঙ্গালী-নীতি অবলম্বন করিয়াছে? তেমন অবস্থাতেও দুঃখের হাসি যতীন্দ্রের ওষ্ঠপ্রান্তে বোধ হয়, ভাসিয়া উঠিয়াছিল। অদূরে লোকজনের কলরব শুনা গেল। যে খালাসীটা ফুটপাথে মুহূর্ত্তের জন্য নির্জ্জীববৎ পড়িয়াছিল, সে মনুষ্য-কলরব শুনিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং যতীন্দ্রনাথকে স্খলিত-কণ্ঠে মিনতি জানাইয়া তাহার বন্ধু-যুগলকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিল। তাহারা আর কখনও এমন কুকার্য্য করিবে না।

যতীন মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করিল। ইহাদিগকে পুলিসের হাতে দিতে গেলে গাড়ীর মহিলাদিগকেও জড়াইতে হইবে। কাজটা ভাল হইবে কি? যতীন তাহার চরণ ও বাহুর বন্ধন শ্লথ করিয়া দিল। মুক্তি পাইয়া গোরা-খালাসীরা টলিতে টলিতে উত্তরদিকে যথাসম্ভব বেগে ধাবিত হইল। পশ্চাতে মানুষের কলরব বর্দ্ধিত হইতেছিল। কথাটা হয় ত কোন কোন চিরবিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট গঞ্জিকাসেবীর খেয়ালের কথার মত শুনাইবে। কিন্তু কবি সেকস্‌পীয়ারের অমর উক্তিটি স্মরণ করিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, সংসারের অনেক বিষয়ই আমাদের জানার বাহিরে, অথচ সত্য।

একজন যুবক দ্রুতপদে গাড়ীর কাছে ছুটিয়া আসিল, যতীন বলিল, "এ গাড়ী কি আপনার?"

ব্যগ্রকণ্ঠে যুবক বলিলে, "আজ্ঞে হ্যাঁ।" সে দূর হইতে ব্যাপারটা কিছু কিছু লক্ষ্য করিয়াছিল।

যতীন বলিল, "মেয়েদের রক্ষা করবার শক্তি নেই, অথচ সাধারণ স্থানে তাদের নিয়ে আসতে লজ্জা হয় না আপনাদের ?"

তাহার চিত্ত তখন অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ।

যুবক সঙ্কুচিতভাবে বলিল, "আমি সইসকে নিয়ে টিকিট কিনতে গিছলুম। কোচম্যান গাড়ীর কাছে ছিল। কে জানে এমন বিপদ হবে!"

যতীন বলিল, "ও সব বাজে কথা। আপনি থাকলেই বা কি করতেন ? তিনটে মানোয়ারী গোরা আপনাদের তিনজনকে পিষে ফেলে, মহিলাদের বে-ইজ্জত করত। যত দিন মেয়েদের রক্ষা করবার শক্তি না হবে, এমন ক'রে লুব্ধ রাক্ষসদের দৃষ্টির সামনে তাঁদের আনা উচিত হবে না। আগে শক্তিমান হোন, তার পর ওদের নকল করবেন!"

"দাদা!"

যুবক গাড়ীর দিকে ছুটিয়া গেল।

যতীন্দ্রনাথ তখন কোচম্যানের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়া তাহাকে উঠিয়া দাঁড়াইতে বলিল। লোকটা তখনও কাঁপিতেছিল। সে আভূমি নত হইয়া সেলাম করিতে করিতে স্খলিত-কণ্ঠে বলিল, "আপ ভীমজী হ্যায়, হুজুর!"

সহিসটা আসিয়া পড়িয়াছিল। যতীন্দ্রনাথ কোচম্যানকে গাড়ীতে উঠিতে বলিল। সে ধীরে ধীরে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গাড়ীর উপর চাপিয়া বসিল।

যুবক দ্রুতগতিতে যতীন্দ্রনাথের কাছে আসিয়া তাহার

যুগলকর চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আজ আপনি আমার ধর্ম্ম, ইজ্জত সব রক্ষা করেছেন। আমার স্ত্রী ও বোন্ সংক্ষেপে সব বলেছে। ভগবান আপনার—"

বাধা দিয়া যতীন বলিল, "এখন কি মেলা দেখবার সাধ আছে ?"

যুবক বলিল, "না, আজ বাধা পড়েছে, আর যাব না। আপনি কোথায় যাবেন, চলুন পৌছে দিয়ে—"

"থাক্, আমার গাড়ী সঙ্গে আছে। আপনারা তবে গাড়ী যান। ঐ দেখুন, অনেক লোক ছুটে আস্‌ছে। এখনই নানা কৈফিয়তের হাঙ্গামা হবে। ও সব আমি ভালবাসি না।"

যতীন্দ্রনাথ যুবককে ঠেলিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া কোচম্যানকে গাড়ী হাঁকাইতে বলিল

"মশাই! আপনার নামটা—"

"কোন দরকার নেই। গাড়ী হাঁকাও, কোচম্যান!" গড়-গড় শব্দে গাড়ী উত্তরদিকে ধাবিত হইল।

"এই যে, যতীনবাবু!"

যতীন্দ্র দেখিল, দশ বারো জন স্বেচ্ছাসেবকসহ ললিত ডাক্তার দ্রুতগতিতে ছুটিয়া আসিতেছে। না, তাহা হইলে এই ডাক্তারটি ঠিক সে দলের নহে!

ললিত ডাক্তারের শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুতবেগে বহিতেছিল। সে বলিল, "ব্যাপার সঙ্গীন দেখে আমাদের আপিসে ছুটে গেলুম। লোকজন সংগ্রহ ক'রে আস্‌তে একটু দেরী হয়েছে। তার পর কি হ'ল বলুন ত ?"

ঈষৎ হাসিয়া যতীন বলিল, "সে সব চুকে বুকে গেছে। মানোয়ারী গোরা তিনটেকে ছেড়ে দিয়েছি।"

"এটা ভাল করেন নি, যতীন বাবু। তাদের পুলিসে দিলে ভাল হ'ত।"

যতীন্দ্রনাথ দীপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ভদ্রমহিলাদের এ ব্যাপারে জড়ালে খুব পৌরুষ বাড়ত?"

ললিত বলিল. "দুষ্টদের শাস্তি হওয়া দরকার।"

"দু' দশ টাকা জরিমানা বা বড় জোর দুই-এক মাস জেল, দেখুন, ডাক্তার বাবু, ওসব দুর্ব্বলের যুক্তি। এ রকম অন্যায় যারা করে, তাদের শাস্তি পদাঘাত। শক্তি সঞ্চয় করুন, নারীকে শক্তিরূপা ক'রে গ'ড়ে তুলুন। খালি আইন-আদালত নিয়ে প'ড়ে থাক্‌লে চল্‌বে না। বুঝেছেন?"

স্বেচ্ছাসেবকদলের এক জন বলিল, "ঠিক বলেছেন আপনি। নারীর মর্য্যাদা-রক্ষার জন্য আমাদের প্রচুর শক্তি সঞ্চয় করা দরকার।"

ললিত বলিল, "যাক্, ব্যাপারটা যখন মিটে গেছে, তোমরা ভাই আফিসে ফিরে যাও। আমি এঁকে নিয়ে বাড়ী চল্‌লুম।"

গম্ভীরভাবে যতীন্দ্রনাথ ললিতের সহিত গাড়ীর সন্ধানে চলিল।

আট

রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রভাতে সুশীল বাহিরের ঘরে বসিয়া সংবাদ-পত্র পড়িতেছিল।

"নমস্কার, সুশীলবাবু।"

"আসুন ডাক্তারবাবু, আমি আপনারই প্রতীক্ষা করছিলুম।"

একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া ললিত ডাক্তার তাহাতে উপবেশন করিল।

"আবার কার অসুখ?"

সুশীল মৃদু হাসিয়া বলিল, "অসুখ কারও নেই। খুকীর জন্য একটা টনিক ব্যবস্থা করবেন বলেছিলেন। বাড়ীর ভিতর থেকে তারই তাগাদা। তাই আপনাকে আন্‌বার জন্য কাল থেকে লোক যাচ্ছে।"

"ওঃ!—এর জন্য ভাবনা নেই। খুকীর আর কোন অসুখ করেনি ত?"

সুশীলচন্দ্র বলিল, "না, সেই জ্বর ছেড়ে গেছে, আর জ্বর আসে নি। তবে সামান্য একটু কাসি আছে। আমার বোন তাতেই অস্থির। সে এর জন্য অন্ততঃ কাল তিন বার আপনার ডিসপেনসারীতে লোক পাঠিয়েছিলো। কিন্তু সে আপনার দেখা পায়নি।"

ডাক্তারের মুখমণ্ডল সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে মাথার টুপীটা হাঁটুর উপর হইতে টেবলের উপর রাখিয়া বলিল, "খুকীকে একবার দেখতে হবে।"

সুশীলচন্দ্রের আদেশে ভৃত্য ভিতরে চলিয়া গেল।

"কাল-পরশু কোথায় ছিলেন ; খুব কল্ ছিল বুঝি ?"

"ডাকের জন্য নয়—একটা মুস্কিলে প'ড়েছিলাম—"

এমন সময় খুকুরাণীকে লইয়া ভৃত্য কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

কথাটা তখন চাপা পড়িয়া গেল। খুকুরাণীকে পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার বলিল, "না, বেশ ভাল আছে। কাসিটা কিছু নয়—গলার। একটা ঔষধ লিখে দিচ্ছি, আনিয়ে নেবেন।"

ডাক্তার ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিল।

"মুস্কিলের কথা কি বলছিলেন, ডাক্তারবাবু ?"

ললিত ডাক্তার বলিল, "ও! হ্যাঁ—আমাদের এক বন্ধুর প্রদর্শনীতে কুস্তী খেলার প্রতিযোগিতা করবার কথা ছিল। আজ মেলায় সেই খেলা হবে ; কিন্তু বন্ধুটি সেখানে যেতে পারবেন না।"

সুশীল বুঝিতে পারিল না, বন্ধুর মল্লযুদ্ধের প্রতিযোগিতার সহিত ডাক্তারের মুস্কিলের সম্বন্ধ কোথায় ? সে বলিল, "কেন, তাঁর কি হয়েছে ?"

"সেদিন গোটা কয়েক গোরা খালাসীর সঙ্গে লড়াই ক'রে তিনি বড় কাবু হ'য়ে পড়েছেন।"

সুশীল চকিতভাবে চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইল। অন্তঃপুরে

াইবার দরজার উপর যে যবনিকা লম্বিত ছিল, তাহাও যেন
লিয়া উঠিল।

বিস্মিতভাবে, উৎকণ্ঠাভরে সুশীল বলিল, "কি রকম ?"

ডাক্তারও সুশীলচন্দ্রের ঔৎসুক্যের পরিমাণ দেখিয়া একটু
বিস্মিত হইয়াছিল। সে বলিল, "সেদিন কয়জন মহিলা একখানা
াড়ীতে ক'রে মেলা দেখতে গিয়েছিলেন। গোরা খালাসীরা
াস্তায় অরক্ষিতা মহিলাদের সম্ভ্রমহানি করবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু
.মার এই বীরবন্ধুটি একা তাদের আটকে রেখেছিলেন।
াবগুরা তাঁর পিঠে এমন প্রহার করেছিল—তখন কিছু বুঝতে
ারেন নি—বাড়ী আসবার পর দেখা গেল, সারা পিঠ ফুলে
ঠেছে। আজ দু'দিন নানা ঔষধ দেওয়া গেছে ; কিন্তু লড়বার মত
বস্থা তাঁর এখনও হয়নি। এ যাত্রা এই বাঙ্গালী বীরের
ক্তির পরিচয় দেশের লোক পেলে না। ক'দিন তাঁর কাছেই
লাম।"

পর্দ্দাটা ঘন ঘন দুলিয়া উঠিল।

সুশীলচন্দ্র ডাক্তারের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার দুই
উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

"এই বাঙ্গালী পালোয়ানের নাম কি, ডাক্তারবাবু ?"

"যতীন্দ্রনাথ বসু। কেন বলুন ত ?"

"তিনিই আমার স্ত্রী ও বোনের ইজ্জত রক্ষা করেছিলেন।"

"বলেন কি সুশীলবাবু ? সে গাড়ীতে ওঁরাই ছিলেন ?"

ডাক্তার চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

"হ্যাঁ, আমি তখন টিকিট কিনতে গিয়েছিলুম।"

মুহূর্ত্ত নিমীলিতনেত্রে ডাক্তার কি ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিল। যদি যতীন্দ্রনাথ সেই সঙ্কট-মুহূর্ত্তে উপস্থিত না হইত, নারীদিগের কি লাঞ্ছনা ঘটিত, সেই কথা স্মরণ করিয়াই কি তাহার দেহ টলিয়া উঠিল?

"ডাক্তারবাবু, তিনি এখন কেমন আছেন? আমি তাঁকে একবার দেখতে যাব।"

"অন্য বিষয়ে ভালই আছেন। তা বেশ ত, আমার সঙ্গে চলুন না। আমি এখান থেকে সেখানেই যাব।"

এই বলিয়া সে যতীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিত, সমস্তই সংক্ষেপে বিবৃত করিল।

"সেদিন নাম জান্‌বার অনেক চেষ্টা করেছিলুম; কিন্তু তিনি কিছুতেই বলেন নি। কোথায় থাকেন, তাও জান্‌তে পারি নি। আপনি বসুন, ডাক্তার বাবু, আমি এখনই আসছি।"

সুশীলচন্দ্র ভিতরে চলিয়া গেল। মণিমালা ও যমুনাকে সম্মুখে দেখিয়া সে সোৎসাহে সংক্ষেপে বলিল, "তাঁর নাম ও ঠিকানা জান্‌তে পেরেছি। আমি ডাক্তারের সঙ্গে সেখানে যাচ্ছি।"

যমুনা ধীরকণ্ঠে বলিল, "তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলো, দাদা, দয়া ক'রে যদি তিনি একবার এখানে আসেন। আমরা তাঁকে দেখব।"

মণিমালা বলিল, "হ্যাঁ, তাঁকে এখানে আনাই চাই। তাঁর ঋণ শোধ করা যাবে না। তবে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যদি কিছু তৃপ্তি পাওয়া যায়।"

সুশীল উপরে উঠিতে উঠিতে বলিল, "অন্ধকারে তাঁর চেহারাও ভাল ক'রে দেখা হয় নি। চক্ষু সার্থক করতে হবে।"

নয়

যমুনা ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল, বেলা প্রায় বারোটা বাজে। দাদা কেন এখনও আসিতেছেন না? তিনি কি তবে তাহাদের সেই রাত্রির রক্ষাকর্ত্তা যতীন্দ্রবাবুকে সঙ্গে লইয়া আসিতেছেন?

কথাটা মনে পড়িতেই তরুণীর দেহ শিহরিয়া উঠিল। উঃ! সেই মানোয়ারী গোরাটার শূকর-মাংসপুষ্ট প্রকাণ্ড হাতখানা প্রথমে তাহার দিকেই ত বিস্তৃত হইয়াছিল! আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলেই ত সেই পাষণ্ড তাহাকে স্পর্শ করিত!—যমুনা বিকৃতমুখে নয়নযুগল নিমীলিত করিল।

সম্ভাবিত লাঞ্ছনার চিত্র যেন তাহার নেত্রপথে বীভৎস মূর্ত্তি ধরিয়া সমুদিত হইল।

অসীম-শক্তিশালী বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি যদি সে সময় না আসিয়া পড়িতেন? নাঃ, নারীজন্ম সার্থক ও সুন্দর হইলেও দানব-শক্তির নিকট চিরকালই নারী লাঞ্ছিতা, ধর্ষিতা হইতে থাকিবে! ইহার কি কোন প্রতিকার নাই?

ক্রোধ, ক্ষোভ, আশঙ্কা ও নৈরাশ্যে কল্পনাপ্রবণা সুন্দরী তরুণীর নয়নে একটা আলোকশিখা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। হ্যাঁ, এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য, নারী সকল বিষয়ে পুরুষের সমকক্ষতা করিতে পারিলেও, সাধারণভাবে পুরুষের শারীরিক শক্তির কাছে নারী অতি

তুচ্ছ। পুরুষ স্বল্পায়াসে নারীর মর্য্যাদাহানি ঘটাইতে পারে। ইহা ত জীয়ন্ত সত্য! কিন্তু ভারতবর্ষের পুরাণ, ইতিহাস কি প্রমাণ করে? হিন্দু নারীকে মহাশক্তিস্বরূপিণীরূপে কল্পনা করিয়াছে। পুরুষের প্রচণ্ড দানবীশক্তি নারীর দ্বারা বিধ্বস্ত। তাই অপরিমেয় শক্তিশালী মহা অসুরের পরাজয়বার্ত্তা দশভুজা এবং কালিকা-মূর্ত্তির পূজায় পরিস্ফুট। এমন কত আছে। তবে?

যমুনা ভাবিতে লাগিল। পরলোকগত দয়িতের ব্যায়াম-পুষ্ট বলিষ্ঠ দেহ কি তখন তাহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইয়াছিল? স্বামী তাহাকে ব্যায়াম করিবার জন্য কিরূপ আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিত; কিন্তু লজ্জা ও সঙ্কোচের মায়া কাটাইয়া সে কোনও দিন স্বামীর এই অনুরোধ রক্ষা করিতে পারে নাই—ব্যায়ামে মন দিতে পারে নাই, সেই কথাই কি আজ তাহার চিত্তকে পীড়িত করিতেছিল?

যমুনা ক্লান্ত দৃষ্টি তুলিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিল। রৌদ্র-করোজ্জ্বল নীল আকাশে দুই একটা পাখী উড়িয়া যাইতেছিল। তরুণী সেই দিকে চাহিয়া স্থিরভাবে বসিয়া রহিল।

"পিতিমা!"

শিশুকণ্ঠের কলধ্বনি তরুণীর কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র সে ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, তাহার আদরিণী খুকুরাণী দরজার কপাট ধরিয়া হাসিতেছে। আর তাহার পশ্চাতে ভ্রাতৃজায়া মণিমালা।

যমুনা ত্রস্ত-চঞ্চল-চরণে ছুটিয়া গিয়া ব্যগ্রভাবে খুকুরাণীকে বুকের উপর তুলিয়া লইল।

"এর মধ্যে ঘুম থেকে উঠেছিস্?"

শিশু তাহার পিসীমার কণ্ঠদেশ কমনীয়, শুভ্র, কোমল বাহুলতার দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিল।

তরুণীর আননে স্নেহের যে অপূর্ব্ব দীপ্তি বিকশিত হইয়া উঠিল, তাহা শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের তুলিকায় চিত্রিত হইবার যোগ্য। শ্যামসুন্দরকে কোলে লইয়া মা যশোদার মুখে বোধ হয় এইরূপই একটা মধুর দীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। শিশু-খৃষ্ট-ক্রোড়ে ম্যাডোনার চিত্র তাই বোধ হয় জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্প।

মণিমালা, ননন্দার দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া সম্ভবতঃ সেই অপূর্ব্ব চিত্রের কথাই ভাবিতেছিল। তাহার নেত্র সহসা সজল হইয়া উঠিল। সে নারী—জননী। সুতরাং তাহার কাছে মাতৃত্বের মাধুর্য্য কি পবিত্র এবং সুন্দর, তাহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তরুণ যৌবনে যাহার সর্ব্বস্ব চিরদিনের জন্য অনন্ত অন্ধকার গহ্বরে হারাইয়া গিয়াছে, মাতৃত্বের বিকাশ ঘটিবার পূর্ব্বে যাহার জীবনে ব্যর্থতার অমানিশা যবনিকা নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহার জন্য মমতাময়ী নারীর প্রাণ কাঁদে না?

ধীরে ধীরে মণিমালা যমুনার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

যমুনা বলিল, "দাদার এত দেরী হচ্ছে কেন, ভাই? বেলা দুপুর হ'য়ে গেল!"

মণিমালা বলিল, "পথ ত অনেক দূর। প্রায় নয়টার সময় গেছেন, তাতে ভদ্রলোকের সঙ্গে খানিক কথাবার্ত্তাতেও সময় যায়। এই এলেন ব'লে।"

যমুনা খুকুরাণীকে আদর করিতে লাগিল। চুম্বনে চুম্বনে শিশুর চাঁদ-মুখ ছাইয়া দিল।

ননন্দার কাছে আসিয়া মণিমালা কয়েক মুহূর্ত্ত স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। এই শুভ মুহূর্ত্তে তরুণীর মনের গতি পরীক্ষার চেষ্টা করিলে কেমন হয়? সমস্ত অন্তর যখন স্নেহরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তখন কৌশলে প্রসঙ্গের আভাস দিলে সম্ভবতঃ মনের অবস্থার গতি কোন্ দিকে, তাহা ধরা যাইতে পারে।

মণিমালা বলিল, "ঠাকুরঝির কোলে খোকাখুকী এমন সুন্দর মানায়!"

যমুনা প্রশান্ত দৃষ্টিতে ভ্রাতৃবধূর হাস্যপ্রফুল্ল আননের দিকে নেত্রপাত করিল। মধুর হাসি হাসিয়া বলিল, "তার মানে?—তোমার কোলে তেমন মানায় না কি, বৌদি?"

মণিমালা উচ্ছ্বসিতভাবে হাসিয়া বলিল, "আমার কথার অর্থ কি ঐ রকমই হয়? আর কিছু হয় না?"

যমুনা খুকুরাণীকে দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া নাচাইতে নাচাইতে বলিল, "একটা কথার মানে হয় ত নানারকম হ'তে পারে, কিন্তু আমার ব্যাখ্যাটাও কি মাঠে মারা যাবার মত, বৌদি?

"ওরে বাবা! তা কি বল্‌তে পারি! তুমি বিদুষী—তোমার কথার ভুল ধরবার শক্তি আমার নেই, ভাই!—আমি বল্‌ছিলুম, খুকুকে কোলে নিলে তোমাকে ঠিক মা যশোদার মত দেখায়। এম্‌নি একটি খোকা—"

মণিমালা সহসা আপনাকে সংবরণ করিয়া লইল। না,

এ ভাবে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে যমুনার চিত্তে হয় ত আঘাত লাগিতে পারে।

কিন্তু যমুনা হয় ত সে দিক্ দিয়া কথাটার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করে নাই। সে সহজভাবে বলিল, "দাদার মেয়ে আমার সে অভাব ত পূর্ণ করেছে, বৌদি।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়! ও ত তোমারই, ভাই।"

মণিমালা সে প্রসঙ্গ ঐ ভাবে উত্থাপন করা আর সঙ্গত বলিয়া মনে করিল না। সে ভিন্নপথে আলোচনার উৎসমুখ খুলিয়া দিল।

খুকুরাণীর পীড়ার কথা তুলিয়া ক্রমে ললিত ডাক্তারের চিকিৎসা-নৈপুণ্যের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া মণিমালা বলিল, "ডাক্তার বাবুটি বেশ! সুন্দর চিকিৎসা করেন।"

কিন্তু যমুনার তরফ হইতে বিশেষ উৎসাহ বা নিরুৎসাহের লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। মণিমালার নারী-হৃদয় ইহাতে যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

এমন সময় বাহিরে জুতার চিরপরিচিত শব্দ যমুনা ও মণিমালার কর্ণে প্রবেশ করিল।

"এই যে দাদা এসেছেন!"

সুশীল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "না, যতীনবাবুকে আনতে পারলাম না। তিনি আজকের গাড়ীতেই দেওঘরে ফিরে যাচ্ছেন, কিন্তু কি চমৎকার লোক এই যতীনবাবু!"

মণিমালা ও যমুনা প্রত্যাশিত দৃষ্টিতে সুশীলের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুশীল বলিল, "বাস্তবিক এমন মিষ্ট কথা, এমন মধুর ব্যবহার এমন শক্তিশালী মানুষের পক্ষে যে সম্ভবপর, তা জানতাম না। পালোয়ান যাঁরা, প্রায় তাঁরা রুক্ষস্বভাব হ'য়ে থাকেন, এই ধারণা আমার ছিল। কিন্তু যতীনবাবুর সঙ্গে এতক্ষণ আলাপ ক'রে আমার সে ধারণা বদলে গেছে। সত্যি, এমন চমৎকার লোক আমি খুব কমই দেখেছি। তোমাদের কথাও বেশ যত্ন ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন। খুব ভয় পেয়েছিলেন কিনা, সে বিষয়েও খোঁজ নিলেন।"

যমুনা প্রীতি-বিস্ফারিত-নেত্রে জ্যেষ্ঠের দিকে চাহিয়া বলিল, "তাঁকে একবার আধঘণ্টার জন্য সঙ্গে আন্‌তে পারলে না, দাদা ?"

"অনেক চেষ্টা করেছিলুম ; কিন্তু ভাবে বুঝলুম, তিনি নারীর সঙ্গ এড়িয়ে চল্‌তে চান বলেই এলেন না। ভাল কথা, যতীন বাবু বিপত্নীক। তাঁর একটি ছোট ছেলে আছে। আর বিয়ে করেন নি।"

সুশীল কথাটা বলিয়াই পত্নীর দিকে একবার কটাক্ষ-পাত করিল।

যমুনার শান্ত আননে একটা মধুর দীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "বাড়ীতে তাঁর আর কে আছে, দাদা ?"

জামা খুলিতে খুলিতে সুশীল বলিল, "তাঁর এক বৃদ্ধা পিসীমা আছেন। তিনিই সংসার দেখছেন। যতীনবাবু বোধ হয় ছেলেটিকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। দেখলুম, তার কথা বল্‌তে বল্‌তে যেন ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। তাই কারও কোন অনুরোধ না শুনে

আজই দেওঘরে চ'লে যাচ্ছেন। মহারাজার অনুরোধ পর্য্যন্ত রাখতে পারলেন না।"

যমুনা গভীর আগ্রহ সহকারে সকল কথা শুনিতেছিল। সে মৃদুস্বরে বলিল, "এমন লোককে একবার প্রণাম করতে না পারলে মনে শান্তি পাওয়া যাবে না।"

মণিমালা বলিল, "সত্যি কথা। তাঁকে আমারও প্রণাম করবার জন্য মন ব্যাকুল হয়েছে।"

সুশীলচন্দ্র বলিল, "তা বেশ ত, খুকীর শরীরটা এখনও খুব ভাল হয়নি। দিনকতক আমাদের দেওঘরের বাড়ীতে গিয়ে থাকলে মন্দ হয় না।"

মণিমালা ও যমুনা উৎসাহ ভরে সমস্বরেই বলিয়া উঠিল, "তাই চল।"

দশ

তাহার সাধ—কামনা কি পূর্ণ হইবে না? তরুণী যমুনা শুধু সুন্দরী বলিয়া নহে, ক্ষণিক দৃষ্টিপাতে তাহার আননে বৈধব্যের যে ম্লানছায়া সে দেখিয়াছে, তাহাতে এই নারীর অন্তরের সমস্ত বেদনা সে মুছাইয়া দিয়া তাহাকে সুখী করিতে পারিলেই তাহার জীবন সার্থক হইবে। এমন অনবদ্য কুসুম তাহার শ্রী ও সুবাসে যদি সযত্নে রচিত উদ্যানের শোভা ও মাধুর্য্য বৃদ্ধি না করিয়া অযত্নে শুকাইয়া যায়, তাহা হইলে সে অপরাধের কি মার্জ্জনা আছে?

ললিত ডাক্তার মধ্যাহ্নে নিজের বসিবার ঘরে বিজলী পাখার নীচে বসিয়া এমনই একটি চিন্তার স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছিল। এই যমুনা তাহার সতীর্থের পরিণীতা পত্নী, কিন্তু দুই বৎসরের দাম্পত্য-জীবনের পর মোহিত ইহলোক হইতে অকালে অন্তর্হিত হইয়াছে। এ দুঃখের প্রতীকার নাই। কিন্তু এই সুন্দরী তরুণী কেমন করিয়া এই প্রলোভন-পূর্ণ সংসারের মোহজাল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবে? বাস্তব জগতে—বিশ্বস্রষ্টার বিচিত্র রচনার অমোঘ প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইবার মত কি পাথেয় এই নবীনা সুন্দরী সঞ্চয় করিতে পারিয়াছে? ভোগ সযত্নে নানা উপচার-পূর্ণ অর্ঘ্য সাজাইয়া সবে তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিল; আলোকমালা-প্রদীপ্ত জীবন-রঙ্গমঞ্চে সবে

প্রথম অঙ্কের অভিনয় আরম্ভ হইয়াছিল; ইমন-কল্যানের বাঁশী সবে গানের প্রথম কলি গাহিতে আরম্ভ করিয়াছিল—সহসা প্রলয়-ঝঞ্ঝার উৎসবানন্দের আলোকমালা নিভিয়া গেল, বাঁশী ভাঙ্গিয়া পড়িল, রঙ্গমঞ্চ ধূল্যবলুণ্ঠিত। কিন্তু জীবনের মুকুলিত পুষ্পগুলি যখন সহস্রদলে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, তখন তাহার সার্থকতা না ঘটিলে স্রষ্টার সৌন্দর্য্যের অবমাননা করা হয় না কি?

ডাক্তার উঠিয়া একটা বাতায়নের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুশীলবাবু যদি অনুমতি দেন, যমুনার যদি অভিমত পাওয়া যায়, তাহা হইলে সে সর্ব্বস্ব পণ করিয়া এই সুন্দরীকে সুখী ও তৃপ্ত করিবার চেষ্টা সর্ব্বান্তঃকরণে করিতে প্রস্তুত। যমুনাকে সে ভাল করিয়া দেখে নাই, তাহার সহিত একটিমাত্র বাক্যালাপের সুযোগ পর্য্যন্ত সে এখনও পায় নাই; কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? যমুনার জীবন-নাট্যের বিয়োগান্ত কাহিনীই তাহার সমগ্র চিত্তকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। একটিমাত্র ব্যর্থ জীবনকেও যদি সে সার্থকতার দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে, তবেই তাহার শিক্ষা, দীক্ষা—মনুষ্যজন্ম সার্থক হইবে।

সংসারে তাহার কেহ নাই। মাতার স্মৃতি তাহার মনে পড়ে না, পিতা সংসার-সংগ্রামে জয়লাভ করিবার উপযোগী অর্থ ও কিছু সম্পত্তি তাহার জন্য রাখিয়া কয়েক বৎসর হইল, ইহলোক হইতে সরিয়া গিয়াছেন। ভ্রাতা বা ভগিনী বলিবার কেহ তাহার নাই। এক মাতুল আছেন; কিন্তু সংসার ও সম্পত্তি লইয়া তিনি দেশে এমনই ভাবে কায়েম মোকাম হইয়া আছেন যে, ভাগিনেয়ের প্রতি

তেমন ভাবে দৃষ্টি দিবার সুযোগ ও সময় তাঁহার নাই। সুতরাং তাহার সম্বন্ধে দুর্ভাবনায় পীড়িত হইবার কেহ নাই বলিলেই চলে।

ডাক্তার ভাবিতে লাগিল।

বিধবা-বিবাহ হিন্দুসমাজে তেমন ভাবে প্রচলিত নাই। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র ত তাহার বিরোধী নহে। তবে সে কেন এই সুন্দরী তরুণীকে বিবাহ করিবে না? হিন্দুসমাজ তাহাকে এক পার্শ্বে ঠেলিয়া রাখিবে? হাঁ, তাহাতে সে দুঃখিত হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া—

ললিতচন্দ্রের আনন ও ললাট রেখাঙ্কিত হইল।

সমাজের কেহ কেহ এখন বিধবা-বিবাহ করিতেছে। আপত্তি থাকিলেও এক দল লোক ইহার বিশেষ সমর্থক। সুতরাং সে একবারে হিন্দুসমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া থাকিবে না। তাহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন লোকের অভাব নিশ্চয়ই ঘটিবে না। সে ধর্ম্মান্তর গ্রহণের বিরোধী। সুতরাং হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার গৌরব হইতে বঞ্চিত হইতে না হইলেই তাহার আর কোন দুঃখ থাকিবে না।

গৃহমধ্যে পদচারণা করিতে করিতে ডাক্তার বোধ হয় শ্রান্তি অনুভব করিতেছিল। সে একখানি আরাম-কেদারায় দেহ বিছাইয়া দিল। চিন্তার সূক্ষ্মতন্ত্রী ঊর্ণনাভের রচিত গোলকধাঁধার ন্যায় জালচক্র রচনা করিয়া চলিল। ললিতচন্দ্রের নয়ন ভাবাবেশে নিমীলিত হইল। তাহার মানস দৃষ্টির সম্মুখে ঈষৎ অবগুণ্ঠনাবৃতা তরুণীর চিত্র সমুজ্জ্বলভাবে উদ্ভাসিত হইল।

বিজ্ঞানের শিষ্য হইলেও মনস্তত্ত্ব-সংক্রান্ত দর্শনের সহিত তাহার অপরিচয় ছিল না। মহারাজ ভবতোষের সহিত তাহার এ বিষয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা হইয়া থাকে। ভবতোষ দর্শন, ইতিহাস ও কাব্যের একান্ত অনুরাগী। তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার সংস্রবে আসিয়া ললিতের অনেক বিষয়ে চিন্তা করিবার অধিকার জন্মিয়াছিল।

সে ভাবিতে বসিল, তাহার মনের এই অবস্থার নামই কি প্রেম বা অন্য কিছু? সুন্দরী তরুণী নারী দেখিলে পুরুষের মন সাধারণতঃ বিচলিত হয়, ইহা বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক সিদ্ধান্ত। পুরুষের বহুমুখী চিত্তের সাধারণ অবস্থা এইরূপ হইতেই হইবে। তবে শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান ও সংযমের দ্বারা পুরুষ মনের এই প্রকার উচ্ছৃঙ্খল গতিবেগকে সংবরণ করিতে পারে।

যমুনার প্রতি তাহার চিত্তের এই প্রচণ্ড আকর্ষণ কি বহুমুখী চিত্তেরই একটা বিকাশ মাত্র? না, সত্যই সে এই তরুণীকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে? শকুন্তলাকে দেখিয়া দুষ্মন্তের মনে যে অনুপ্রেরণার উদ্ভব হইয়াছিল, জুলিয়েটের সহিত প্রথম দৃষ্টি-বিনিময়ের ফলে যে ভাবধারা রোমিওকে অধীর করিয়া তুলিয়াছিল, সুভদ্রার বিচিত্র সৌন্দর্য্য দর্শনে অর্জ্জুনের চিত্তে যে প্রেমের সমুদ্র উথলিয়া উঠিয়াছিল, তাহার এই প্রেম কি সেই জাতীয়?

কিন্তু সে ত এই ভাগ্যবিড়ম্বিতা তরুণীর সমগ্র মুখকান্তি, দেহসৌষ্ঠব ও লাবণ্যের স্বরূপ দর্শনের অবকাশ পায় নাই—

যমুনা শুধু ক্ষণিকদৃষ্টা—আবছায়ামাত্র। তবে তাহার মনের এই অবস্থার প্রকৃত পরিচয় কি ?

"সখি ! কে'বা শুনাইল শ্যাম নাম !
কাণের ভিতর দিয়া
মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

সাধক কবি শুধু নাম-মাহাত্ম্যের অন্তরালে প্রেমাস্পদকে প্রেমিকার চিত্তক্ষেত্রে যে আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেই আসনে কি ললিত, যমুনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে বলিয়াই, তাহার সমগ্র চিত্ত এই তরুণীর প্রতি প্রধাবিত হইয়াছে ?

ললিত আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার সুস্থ, সবল দেহের অন্তরালে চিত্ত এমন দুর্ব্বল, এমন কল্পনাপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া সে সত্যই যেন একটু লজ্জা অনুভব করিল। পৌরুষের সে আজীবন ভক্ত। এজন্য পুরুষের জীবনে নারীজনোচিত মৃদুতা এবং অপৌরুষেয় মনোবৃত্তির প্রকাশকে সে কোনও দিনই ক্ষমা করিতে পারে নাই। নিজের মনে এই নারীসুলভ অধীরতা অনুভব করিয়া সে মনের উপর রক্তচক্ষু দেখাইল।

"ডাগ্‌দার সাব !—"

ললিতের চিন্তাসূত্র সহসা ছিন্ন হইয়া গেল। সে দরজার বাহিরে চাহিয়া দেখিল, সুশীল বাবুর দ্বারবান্ তাহাকে

কুর্ণীশ করিয়া একখানা পত্র তাহার দিকে আগাইয়া দিতেছে।

মুহূর্ত্ত মাত্র। তার পর আপনাকে সংযত করিয়া ললিত ডাক্তার চিঠিখানা গ্রহণ করিল।

কিন্তু এ কি দুর্ব্বলতা! সুশীলচন্দ্রের বাড়ীর দ্বারবান্, অথবা চিঠি দেখিয়াই তাহার সমগ্র চিত্ত এমন অসম্ভববেগে আন্দোলিত হইতেছে কেন?

খাম খুলিয়া সে পড়িল, সুশীলচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"বিশেষ জরুরী পরামর্শ আছে, একবার আসিলে সুখী হইব। আজই আসিবেন।"

কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ললিতচন্দ্র যখন কাগজ কলম তুলিয়া লইল, তখন তাহার লেখনী বিন্দুমাত্র স্পন্দিত হইল না। সে সংক্ষেপে লিখিয়া দিল, আজ অপরাহ্নে সে অবশ্যই যাইবে।

দ্বারবান্ চলিয়া গেল, সে টেবলের উপর মাথা রাখিয়া নীরবে কি ভাবিতে লাগিল।

এগার

হাওয়ার বন্দুক ঊর্দ্ধে তুলিয়া সতু ঘোড়া টিপিয়া দিল। ধপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল, কিন্তু গাছের পাখী মাটীতে লুটাইয়া পড়ার পরিবর্ত্তে উড়িয়া গেল।

হতাশভাবে সতু পিতার দিকে ফিরিয়া বলিল, "বাবা পাখী উড়ে গেল!"

যতীন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিল, "তুমি ভাল ক'রে তাগ্ করতে পার না কি না, তাই পালিয়ে গেল। ভাল ক'রে শেখ, তখন আর পালাতে পারবে না।"

সতু তখন চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু একটা পাখীও আর দেখিতে পাইল না। তখন তরঙ্গায়িত মুক্ত প্রান্তর অস্তগামী সূর্য্যের রক্ত-আলোকধারায় অবগাহন করিতেছিল। স্বাস্থ্যকামী প্রবাসী নর-নারী, বালক-বালিকা প্রান্তরের বক্ষোবিসর্পিত পথের উপর দিয়া হাস্য-কলোচ্ছ্বাস তুলিয়া চলিতেছিল।

পিতার পার্শ্বে বন্দুকটি রাখিয়া দিয়া সতু প্রান্তরে আপন মনে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে যতীন্দ্রনাথ পুত্রের দিকে চাহিয়া রহিল।

মাতৃহারা সন্তানকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। পুরুষের পক্ষে এ-কার্য্য যে কত কঠিন, কয় বৎসরে যতীন্দ্রনাথ তাহা কি বুঝে

নাই ? জননীর স্নেহ-সতর্ক দৃষ্টি, প্রাণভরা-ভালবাসা, যত্ন ও সেবা সন্তানকে সকলপ্রকার অকল্যাণ হইতে যেরূপ অনায়াসে রক্ষা করিয়া থাকে, পুরুষের পক্ষে সে জন্য বহু আয়াস স্বীকার করিতে হয়। শৈশবে যে মায়ের এই স্নেহ হইতে বঞ্চিত, তাহার মত দুঃখী কে ? যতীন্দ্রনাথ স্বয়ং বাল্যকালে মাতা ও পিতা উভয়কেই হারাইয়াছিল। তাই মাতৃহারা সন্তানের দুঃখ ও বেদনা যে কি অসীম, তাহা সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া আসিয়াছে। গভীর দুঃখ, বেদনা বা আনন্দের কোনও সংবাদ সে কোনও বিশ্বস্ত হৃদয়ের কাছে প্রকাশ করিয়া তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করিতে পায় নাই। অবশ্য পিসীমার স্নেহশীতল হৃদয়তলে সে আশ্রয়লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু দীর্ঘ দিনের জন্য সে সুযোগ তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। অধ্যয়নের জন্য কলিকাতায় বাসকালে সে পিসীমাতার সাহচর্য্য পাইত না। নিজের সংসার ছাড়িয়া—স্বামীর পরিচর্য্যা ত্যাগ করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের গৃহে বাস করিবার সুবিধা তখন তাঁহার ছিল না। অনেক বৎসর পরে, বৈধব্যের দুর্দ্দশা ঘটিবার পর, তবে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে আবার কাছে পাইয়াছিলেন।

যতীন্দ্রনাথের নাসাপথে একটা দীর্ঘশ্বাস নির্গত হইল।

হাঁ, সতুকে মানুষের মত গড়িয়া তুলিতে হইবে। কল্যাণীর বড় সাধের সতুকে সে তাহার হাতে সমর্পণ করিয়া গিয়াছে। বত্রিশ নাড়ী-বন্ধন ছিন্ন করিয়া যে তাহার ক্রোড়ে আসিয়াছিল, তাহাকে কি ভাবে বাঙ্গালা মায়ের সুসন্তান-রূপে গড়িয়া তুলিবে, যতীন্দ্রের বিদুষী পত্নী স্বামীর সহিত সে বিষয়ে যে সকল আলোচনা

করিত, এই পাঁচ বৎসরে সে কি তাহার একটি শব্দও বিস্মৃত হইয়াছে ?

বিস্মৃত হইবে ? প্রত্যেকটি শব্দ, পত্নীর বাক্যধারার মধ্যে যে হৃদয়াবেগের স্পন্দন, নয়ন ও আননে ভাবের যে অভিব্যঞ্জনা সে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহা কি তাহার সমগ্র অন্তর প্রভাবিত করিয়া রাখে নাই ? প্রতিদিন, প্রতি কার্য্যে দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের ন্যায় তাহার মনকে সেই সকল কথা ও ভাব পথ দেখাইয়া দিতেছে না কি ?

সূর্য্য মাঠের শেষে, পাহাড়ের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। চঞ্চল আলোক দীপ্তিকে পশ্চিমাকাশের প্রান্তে ঠেলিয়া দিয়া, পূর্ব্বদিক্‌চক্রবাল হইতে সন্ধ্যার অঞ্চল নামিয়া আসিতেছিল।

সতু লাফাইতে লাফাইতে ছুটিয়া আসিল। তাহার কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশগুলি আন্দোলনের তালে তালে নাচিতেছিল। সে পিতার গলদেশ তাহার ক্ষুদ্র বাহুর সাহায্যে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া বলিল, "বাবা, চল, বাড়ী যাই।"

"চল", বলিয়া যতীন্দ্রনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল।

মাঠ হইতে রাজপথে আসিয়া উভয়ে গৃহের দিকে ফিরিল। সতু তখন হাওয়ার বন্দুকটি শিকারীদিগের ন্যায় পৃষ্ঠে ঝুলাইয়া লইয়াছিল।

পুত্রের হাত ধরিয়া চলিতে চলিতে যতীন্দ্র কিছু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। অন্ধকার তখনও ঘনীভূত হয় নাই। ত্রয়োদশীর চাঁদের আলো তখনও ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই।

"যতীন বাবু না ?"

যতীন্দ্রনাথ থমকিয়া দাঁড়াইল।

এক দল স্ত্রী ও পুরুষ তাহার সম্মুখে।

নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেই পুরোবর্ত্তী যুবকের আকৃতি তাহার পরিচিত বলিয়া মনে হইল।

"সুশীল বাবু?"

সুশীলচন্দ্র সহাস্যে বলিয়া উঠিল, "তা হ'লে চিনতে পেরেছেন?"

"নিশ্চয়!—এই যে ডাক্তার বাবু, আপনিও দেওঘরে হাজির!"

ললিত ডাক্তার নমস্কার করিয়া প্রসন্ন হাস্যে বলিল, "আপনার বাড়ীর খোঁজেই আমরা বেরিয়েছিলুম। বাড়ী বার করেছি। আপনার চাকর বল্‌লে, এই দিকে আপনি বেড়াতে গেছেন। তাই আমরাও চলেছিলুম।"

যতীন্দ্রনাথ সবিস্ময়ে বলিল, "বহু ভাগ্য। আপনারা আমার সন্ধান নিয়েছেন! আপনারা কবে এখানে এলেন?"

সুশীল বলিল, "আমরা আজ সকালেই এসেছি। উইলিয়মস্ টাউনে আমাদের একখানা বাড়ী আছে। এখানে আসার প্রধান উদ্দেশ্য তা হ'লে বলি?"—

বলিয়া সুশীল, পত্নী ও সহোদরার দিকে ফিরিয়া মৃদু হাসিল।

মণিমালা ও যমুনা ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল।

সুশীল বলিল, "ইনি আমার বোন্, আর ইনি আমার স্ত্রী। আপনি এঁদের সে দিন রক্ষা করেছিলেন। আপনাকে দেখবার সাধ এঁদের এত বেশী যে, শেষকালে দেওঘরে ছুটে আসতে হ'ল।"

যতীন্দ্রনাথে মুখে স্মিতহাস্যরেখা উদ্ভাসিত হইল। সে সম্ভ্রমভরে

বলিল, "আমার সৌভাগ্য, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি এমন একটি অদ্ভুত জীব নই যে, আমার জন্য এঁদের এতখানি কষ্টস্বীকারের প্রয়োজন ছিল। যাক, যখন এ দিকে এসেছেন, আমাদের বাড়ীতে একটু পায়ের ধূলা না দিলে ছাড়ছি না।"

ললিত বলিল, "এটি কি আপনার ছেলে, যতীন বাবু?"

সকলেরই দৃষ্টি তখন সতুর দিকে কেন্দ্রীভূত হইল।

"চমৎকার ছেলে!"

মৃদু গুঞ্জনে কথাটা বলিয়াই যমুনা সতুকে দুই হাত বাড়াইয়া কোলে তুলিয়া লইল।

সতু হাস্যস্ফুরিতাধরা, প্রতিমার তুল্য আনন্দময়ী যমুনার কোলে উঠিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিল।

জ্যোৎস্নাধারা তখন যমুনার কমনীয় মুখে লীলায়িত হইতেছিল। সে সতুর মুখে চুম্বনরেখা মুদ্রিত করিয়া দিল। সেই স্নেহ-চুম্বনে বালক সতু যেন অভিভূত হইয়া যমুনার স্কন্ধদেশে মস্তক রক্ষা করিল।

ললিত ডাক্তারও অভিভূতের মত এই দৃশ্য দেখিতেছিল। যমুনাকে এত কাছাকাছি এমন ভাবে দেখিবার অবকাশ আজিকার পূর্ব্বে তাহার কখনও হয় নাই।

যমুনার ক্রোড় হইতে মণিমালা সতুকে টানিয়া লইয়া বলিল, "আমি তোমার মাসী হই, চল তোমাদের বাড়ী যাই।"

এতক্ষণে সতুর মুখে কথা ফুটিল। সে উৎসাহভরে বলিল, "চলুন, মাসীমা!"

যতীন্দ্র কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধভাবে এই সম্পূর্ণ অপরিচিত দুইটি তরুণীর পরমাত্মীয় ভাবের পরিচয় লক্ষ্য করিতেছিল। তারপর সহসা সে বলিয়া উঠিল, "সুশীল বাবু, চলুন, আসুন, ডাক্তার বাবু আমাদের বাড়ী বেশী দূরে নয়।"

সতু বাবু এইবার মণিমালার ক্রোড় হইতে নামিয়া অগ্রে চলিতে চলিতে বলিল, "বাবা, আমি এঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাই ?"

যতীন বলিল, "নিশ্চয়।"

"আসুন", বলিয়া মণিমালা ও যমুনাকে লইয়া সে অগ্রে চলিল। যতীন্দ্রনাথ, সুশীল ও ললিত ডাক্তারের সহিত আলোচনা করিতে করিতে মন্থরপদে পশ্চাতে আসিতে লাগিল।

বার

"ঠাকুরমা! ঠাকুরমা!"

"কি দাদা?" বলিয়া বৃদ্ধা বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। নবাগতা দুইটি তরুণীর সহিত সতুকে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন

"দেখ ঠাকুরমা, মাসীমাদের এনেছি।"

মণিমালা ও যমুনা বিস্মিতা বৃদ্ধার চরণে প্রণাম করিল।

"এস মা, এস।

যমুনা বলিল, "আপনি আমাদের চেনেন না। আপনার ভাইপো যতীন বাবু আমাদের মান-ইজ্জৎ বাঁচিয়েছিলেন।"

পিসীমার মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। ভ্রাতুষ্পুত্রের এই বীরত্ব-কাহিনী তিনি জানিতেন না। যমুনা সংক্ষেপে সকল কথা বিবৃত করিল। পিসীমার আহ্বানে মণিমালা ও যমুনা গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল।

সতু উৎসাহভরে তাহার নবলব্ধ মাসীমাদিগকে পিতার কক্ষে লইয়া গেল। গৃহের মধ্যে বিলাসোপকরণের কোনও প্রকার প্রাচুর্য্য নাই। তক্তপোষের উপর একখানি কম্বল বিস্তৃত। ধূপ-ধূনার গন্ধ ঘরের বাতাসকে তখনও প্লাবিত করিতেছিল। প্রাচীর-গাত্রে একখানি বৃহৎ ব্যাঘ্রচর্ম্ম দুলিতেছে। উৎসাহভরে সতু বলিল

যে, তাহার বাবা কিছুদিন আগে ঐ চর্ম্মের অধিকারী শার্দ্দূলরাজকে স্বহস্তে শিকার করিয়াছিলেন। তাহার পিতা শিকারব্যাপারে কিরূপভাবে ব্যাঘ্র-কবলে বিপন্ন হইয়াছিলেন, তাহার ব্যাদিত মুখবিবরের করাল দংষ্ট্রারাজি কিরূপে পিতার মস্তক-চর্ব্বণে উদ্যত হইয়াছিল, কিরূপে তাঁহার অসীম শক্তিপ্রভাবে বন্দুকের আঘাতে খাদের মধ্যে আহত ব্যাঘ্র গড়াইয়া গড়িয়াছিল, তাহার বিবরণ দিবার সময় পুত্রের আয়ত নয়ন-যুগল উত্তেজনা ও পিতৃগর্ব্বে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। পিতার দেহে ব্যাঘ্রনখরের চিহ্ন এখনও মিলায় নাই।

শুনিতে শুনিতে তরুণীযুগল অন্তরে শিহরিয়া উঠিতেছিল। গৃহের এক কোণে একজোড়া সুবৃহৎ, ভারী ডাম্বেল দেখাইয়া বালক জানাইয়াছিল, তাহার পিতা অনায়াসে প্রত্যহ ঐ ভারী ডাম্বেল লইয়া অর্দ্ধঘণ্টা ব্যায়াম করেন। বড় হইলে সেও বাবার মত শক্তির চর্চ্চা করিবে।

গৃহপ্রাচীরের অপর দিকে একখানি তৈলচিত্র দুলিতেছিল। তাহার প্রতি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া সতু বলিল, "ঐ আমার মা'র ছবি।"

মণিমালা ও যমুনা চাহিয়া দেখিল, আলেখ্যচিত্রিত মূর্ত্তি যেন তাহাদের দিকে চাহিয়া হাসিতেছে। দীর্ঘায়ত কৃষ্ণতার নয়ন-যুগলে যেন প্রেম ও করুণার বন্যা বহিয়া চলিয়াছে। ললাট ও সীমন্ত-দেশকে সিন্দূররাগ যেন মহিমাময় শোভায় উজ্জল করিয়া তুলিয়াছে! কি ভাগ্যবতী এই নারী, যিনি এমন স্বামীর পত্নী, এমন পুত্রের

জননী ! কিন্তু এমন অসময়ে তিনি কেন সতুকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন ?

যমুনা একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার নয়নযুগল সমবেদনার ব্যথায় যেন ছল-ছল করিয়া উঠিল। বোধহয় মণিমালার অন্তরেও সেই একই ভাবের সমুদ্র উথলিয়া উঠিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া অঞ্চলে নেত্রযুগল মার্জ্জনা করিল।

ঘরের প্রত্যেক বস্তু সযত্ন-মার্জ্জিত, ধূলি-বর্জ্জিত। অনবদ্য পবিত্র বায়ুর প্রবাহ যেন কক্ষটিকে অনুক্ষণ স্নিগ্ধ করিয়া বহিতেছিল।

সতু বলিল, "জানেন, মাসীমা ! বাবা রোজ মা'র ছবির কাছে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকেন। তখন—"

পিসীমা ডাকিলেন, "সতু, তোর মাসীমাদের জন্য পাণ নিয়ে যা।"

লঘু গতিতে বালক ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল।

মণিমালা যমুনার দিকে চাহিল।

যমুনা তখন নিবিষ্ট-মনে প্রাচীরগাত্রবিলম্বিত তৈল-চিত্রখানির দিকে চাহিয়াছিল। তাহার অন্তরে তখন কি ভাবের বন্যা বহিতেছিল, তাহা তাহার মুখে বা দৃষ্টিতে প্রকাশ পাইল না। সে যেন কোন স্বপ্নলোকে আপনাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছিল।

মণিমালা ডাকিল, "ঠাকুরঝি !"

যেন স্বপ্নঘোর হইতে জাগ্রত হইয়া যমুনা বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসিল।

এমন সময় বাহিরে পদশব্দ ও সুশীলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

মণিমালা বলিল, "চল, আমরা পিসীমার কাছে যাই।"

তাহারা নিষ্ক্রান্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ, সুশীল ও ললিতকে লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

মাদুর বিছাইয়া দিয়া যতীন বলিল, "হিন্দু বাঙ্গালীর ঘরে চেয়ার-টেবলের বালাই নেই। আপনাদের হয় ত অসুবিধা হবে, সুশীল বাবু।"

সুশীলচন্দ্র প্রসন্ন হাস্যে বলিল, "বলেন কি, যতীন বাবু? আমরাও ত বাঙ্গালী হিন্দু। আজই না হয় চেয়ার-টেবলের রেওয়াজ হয়েছে; কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা চিরদিনই মাদুর-সতরঞ্চিতে ব'সে এসেছেন।"

যতীন হাসিয়া বলিল, "কিন্তু আমাদের সে মন কি এখন আছে, সুশীলবাবু? ডাক্তারবাবু কি বলেন? মনটা আমরা কি পশ্চিম উপকূলে নির্ব্বাসিত ক'রে দেই নি?"

ললিত বলিল, "সে কথা অস্বীকার করা চলে না। বাঙ্গালার শিক্ষিত জনসাধারণ বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা হারিয়ে ফেলেছে বৈ কি। অন্ততঃ বেশীর ভাগ লোকই সে অপরাধে অপরাধী, স্বীকার করতে বাধা নেই।"

আলোটা বাড়াইয়া দিয়া যতীন্দ্রনাথ বলিল, "আপনারা আমাকে কি ভাবেন জানিনে; কিন্তু একটা কথা বল্‌তে আমার কোন সঙ্কোচই হয় না—আমার দেশের সকল প্রকার বৈশিষ্ট্যকে আঁকড়ে ধ'রে থাকতে আমার বড় ভাল লাগে। বিশ্বে আমার আছে,

এ অহঙ্কার করবার যোগ্যতা আমার নেই ; কিন্তু তবু মনে হয়, আমাদের দেশের সভ্যতা পশ্চিমের সভ্যতার চাইতে অনেক বড়, অনেক উন্নত। সুশীলবাবু, আপনি ত পণ্ডিত লোক। আপনার কি ধারণা ?"

ললিত সহসা বলিয়া উঠিল, "যতীনবাবু, মহারাজের কাছে শুনেছি, আপনি দর্শন-শাস্ত্রে এম্, এ পাশ করেছিলেন না ?"

যতীন্দ্র বিনীতভাবে হাসিয়া বলিল, "পাশ ক'রে ডিগ্রী পেয়েছি বটে, কিন্তু তাতে জ্ঞান যে কিছু হয়েছে, সে বিশ্বাস আমার নেই।"

সুশীল তখন কাচের আলমারীর মধ্যে সযত্ন রক্ষিত বাঁধান বইগুলি দেখিতেছিল। পাঁচটি আলমারীপূর্ণ ইংরাজী, সংস্কৃত এবং বাঙ্গলা ভাষার মূল্যবান্ গ্রন্থগুলি যতীন্দ্রনাথের রুচি এবং পাঠস্পৃহার পরিচয় দিতেছিল। সে বলিয়া উঠিল, "যতীনবাবু, আপনার সংগ্রহ ত কম নয় !"

যতীন্দ্রনাথ বলিল, "সতুর মা চ'লে যাবার পর, ওরাই আমার নিত্য সহচর।"

কণ্ঠস্বরে একটা আপ্লুত ব্যঞ্জনা যেন রূপ গ্রহণ করিল। ডাক্তার ললিত মুখ তুলিয়া বলিষ্ঠ যুবকের দিকে চাহিল। সে ভবতোষের নিকট শুনিয়াছিল, যতীন্দ্রনাথ পত্নীবিয়োগের পর সংসারের সকল প্রকার ভোগবিলাস হইতে আপনাকে শুধু বঞ্চিত রাখে নাই, স্ত্রীর চিন্তা অনুক্ষণ তাহাকে নিরত রাখে।

সে প্রাচীরবিলম্বিত তৈল-চিত্রের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "আপনার স্ত্রীর তৈল-চিত্র ?"

"হ্যাঁ, উনিই আমার সহধর্ম্মিণী।"

"বাবা!"—

সতুর দুই হাতে দুইখানি রেকাবী। সে ধীরে ধীরে সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেছিল।

সুশীল বলিয়া উঠিল, "আবার এ সব কি, যতীনবাবু?"

যতীন মৃদু হাসিয়া বলিল, "পিসীমা পাঠিয়েছেন। আমার স্ত্রীর জীবনের একটা ব্রত ছিল, বাড়ীতে যখনই যিনি আসবেন, তাঁকে কিছু না খাইয়ে যেতে দেবেন না। পিসীমা সেটা জানেন, তাই—" যতীন সহসা থামিয়া গেল।

গভীর শ্রদ্ধাভরে ললিত বলিল, "তাঁর ব্রতের স্মৃতির অমর্য্যাদা আমরাও করব না, যতীন বাবু।"

সতুর হাত হইতে খাবারের রেকাবী দুইখানি লইয়া মাদুরের পার্শ্বে রাখিয়া ডাক্তার সতুকে কোলের মধ্যে আকর্ষণ করিল।

তের
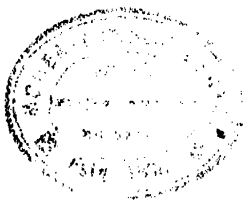
প্রভাত-সূর্য্যের আলোক সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। "দেব-নিবাসের" প্রশস্ত উদ্যানে ললিত ডাক্তার পদচারণা করিতেছিল। প্রায় বিশ বিঘা জমীর উপর বাড়ী ও উদ্যান রচিত। সুদৃশ্য একতল অট্টালিকার সম্মুখে ফুলের বাগান। গোলাপ হইতে আরম্ভ করিয়া দেশীয় বিবিধ প্রকার ফুলের গাছ সযত্নে রোপিত। মাঝে মাঝে কঙ্করাকীর্ণ নাতিপ্রশস্ত পথ বৃক্ষবীথির মধ্য দিয়া বিসর্পিত। বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে আম্র, কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের বাগান। শাকসব্জীর শ্যামল ক্ষেত্রগুলি নয়ন-তৃপ্তিকর।

সুশীলচন্দ্রের পিতা বৎসরের মধ্যে সমগ্র শীতকাল এইখানে প্রায়ই যাপন করিতেন; এ জন্য গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থা তিনি করিয়া রাখিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর সুশীল বড় একটা দেওঘরে আসিবার সুবিধা করিতে না পারিলেও বাড়ী ও উদ্যানটিকে সযত্নে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। নিজে আসিতে না পারিলেও জমীদারীর ভারপ্রাপ্ত প্রবীণ ম্যানেজারকে সে প্রায়ই ত[illegible] জন্য পাঠাইয়া দিত। পিতার সাধের এবং প্রিয় পদ[illegible]ত রাখিবার জন্য তাহার শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা[illegible]ভাব ছিল না।

ডাক্তার উদ্[illegible]ধ্য ভ্রমণের অবকাশে এক একবার বাড়ীর

দিকে আগ্রহভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। কয়দিন সে দেওঘরে আসিয়াছে। যমুনাকে দেখিবার অবকাশ মাঝে মাঝে পাইলেও, ভ্রমণকালে একত্র বাহির হইবার সুবিধা ঘটিলেও এ পর্য্যন্ত যমুনার সহিত তাহার কোন প্রকার আলোচনার সুযোগ হয় নাই। এই আত্মস্থা তরুণী হাস্যচঞ্চলা এবং প্রিয়ভাষিণী হইলেও অনাত্মীয় পুরুষের সহিত আলোচনার সুযোগ পরিহার করিত। ললিত ডাক্তার দাদার সুহৃদ্‌স্থানীয় এবং পরিবারের হিতকামী জানিয়াও সে তাহার সংসর্গ এড়াইয়া চলিত। এ জন্য ললিতের মনে গভীর দুঃখ ছিল; কিন্তু আকারে ইঙ্গিতেও সে তাহার মনের ভাব প্রকাশ পাইতে দিত না।

এই ভাগ্য-বিড়ম্বিতা সুন্দরী তরুণীর প্রতি তাহার শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। সতীর্থের পত্নী তরুণবয়সে বৈধব্যের গুরুভার বহন করিয়া চলিয়াছে, এই বয়সেই ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় সংযমের কঠোরতা অবলম্বন করিয়া বিচিত্র ভোগোপকরণ-পূর্ণ সুন্দরী ধরণীর যাবতীয় ভোগের আনন্দ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, ইহা ললিতের প্রাণে বেদনার সঞ্চার করিত। সে সুশীলের সহিত আলোচনা-প্রসঙ্গে জানিতে পারিয়াছিল, সহোদরাকে পুনরায় সুপাত্রে বিবাহ দিতে তাহার একান্ত অভিলাষ। এই তরুণবয়সে যমুনাকে যোগিনীর ন্যায় দিনযাপন করিতে হইতেছে, ইহা সুশীলের জীবনে যেন ভীষণ অভিসম্পাত। যমুনা যদি ঘোর আপত্তি প্রকাপ না করে, তাহা হইলে তাহাকে সংসার-জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে, ইহা সুশীলের আন্তরিক অভিলাষ।

ললিতের মনে এ জন্য আশা ছিল, সে প্রার্থী হইলে সুশীলচন্দ্র তাহাকে অযোগ্য বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবে না। বিশেষতঃ সুশীলের ভাবভঙ্গীতে সে এমন একটা আশ্বাস পাইয়াছিল—যাহাতে আশার আলোক তাহার মনের একাংশকে আলোকিত করিয়াছে।

যমুনার কথা মনে পড়িলেই ললিতের অন্তররাজ্যে যে আনন্দ-শিহরণ জাগিয়া উঠিত, তাহাতে সে কিছুক্ষণের জন্য অভিভূত হইয়া পড়িত। তাহার মনে হইত, এই নারী জন্মান্তরে নিশ্চয়ই তাহার অত্যন্ত প্রিয়জন ছিল ; নহিলে এমন অনুভূতির অর্থ তাহার বিজ্ঞান-আলোক-উদ্ভাসিত আধুনিক মনও কল্পনা করিতে সমর্থ হইত না। ললিতচন্দ্র ধর্ম্মশাস্ত্র-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত ছিল না—জানিবার সুযোগ সে এত দিন পায় নাই, কিন্তু তথাপি সে পুনর্জ্জন্ম বিশ্বাস করিত। প্রতীচ্য শিক্ষার প্রভাবে, তাহার প্রাচ্য মন সম্পূর্ণরূপে বিমূঢ় হইতে পায় নাই। সম্ভবতঃ সুপণ্ডিত মহারাজ ভবতোষের সহিত ঘনিষ্ঠ সাহচর্য্যই তাহাকে স্বদেশের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি এবং ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অনুরাগী করিয়া তুলিয়াছিল।

পুরাতন পরিচারক নিতাই ডাকিল' "ডাক্তার বাবু!"

ললিত চমকিতভাবে ফিরিয়া চাহিল। সত্যই সে অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল।

নিতাই বলিল, "চা তৈরী। দিদিমণি আপনাকে ডাকতে বললেন।"

দিদিমণি তাহাকে ডাকিতেছে? এই কয় দিনের মধ্যে যমুনা তাহার সম্বন্ধে এতটুকু সচেতন হইয়াছে, এপরিচয় ললিত পায় নাই!

পুলকিত অন্তরের স্পন্দনবেগ সংযত করিয়া ডাক্তার বলিল, "চল, যাচ্ছি।"

বাহিরের বসিবার ঘরে একটা শ্বেতপাথরের গোলটেবলের চারিপার্শ্বে কেদারাগুলি সজ্জিত। সুশীল একখানি আরাম-কেদারায় হেলান দিয়া বসিয়াছিল। টেবলের উপর দুইখানি রেকাবীতে গরম সিঙ্গাড়া ও গৃহজাত গজা সজ্জিত। সিঙ্গাড়াগুলি তখনও ধূম নির্গত করিয়া যেন ভোগীকে আহ্বান করিয়া বলিতেছিল, আর দেরী করিও না—শীঘ্র সদ্ব্যবহার কর।

"আসুন ললিতবাবু! যমুনা বলছিল, 'ডাক্তারবাবু এখানে যেন মনমরা হ'য়ে আছেন; সারা দিন কি যেন ভাবেন। ঐ দেখ না, বাগানে উদাস-দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন।' সত্যি কি এখানে আপনার অসুবিধা হচ্ছে, ডাক্তারবাবু?"

ললিত বলিল, "অসুবিধা? এত আদর-যত্ন, এমন রসনা-তৃপ্তিকর আহার্য্য—কলকাতায় এমন যত্ন কে করত বলুন ত?"

সুশীল জানিত, ত্রিসংসারে ললিতের আপনার বলিবার কেহ নাই। মাতা, পিতা, সহোদর, সহোদরা যাহাদের নাই, তাহারা শুধু নিঃসঙ্গ জীবনের ভারে কাতর নহে; সংসারের আদর-যত্ন, স্নেহ-ভক্তির সংস্রবচ্যুত হইয়া তাহারা মরুপথের যাত্রীর ন্যায় ক্লান্তচরণে পথ চলিতে থাকে।

সুশীলচন্দ্র বলিল,—"আচ্ছা, বসুন। চা এলো ব'লে, ততক্ষণ—" বলিতে বলিতেই সুশীল একখানা রেকাবী ডাক্তারের দিকে আগাইয়া দিয়া নিজে অপরখানি টানিয়া লইল।

গরম সিঙ্গাড়া শীতের প্রভাবে মুখরোচক। ডাক্তার পরিতোষ সহকারে উহার সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল।

চা আসিল, কিন্তু যমুনার করধৃত আধারে নহে—নিতাই উহার বাহক।

ভিতরদিক্ হইতে যে পথে নিতাই আসিয়াছিল, সেই দিকে ললিত একবার দৃষ্টিপাত করিল। তাহার নাসাপথে কি দীর্ঘশ্বাস নির্গত হইল?

সুশীল চা'র পেয়ালায় চুমুক দিয়া বলিল, "দেওঘরটা কেমন লাগছে আপনার?"

ডাক্তার বলিল, "বেশ যায়গা। তবে এখানে এলে মনে হয় না যে, বাঙ্গালা দেশ ছেড়ে এসেছি। চারিদিকেই বাঙ্গালার ছেলে-মেয়ের মুখ! সেই ধানের ক্ষেত, আম-কাঁঠাল- গাছের প্রাচুর্য্য। তফাতের মধ্যে সমতল ক্ষেত্র নেই—ঢেউ-খেলান দেশ।"

"আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করবার। মেয়েরা এখানে অবাধে চলাফেরা করে। এটা আমার বড় ভাল লাগে।"

ললিত বলিল, "ভারী সুন্দর। খোলা মাঠ—অবাধ বাতাস ও সূর্য্যের আলো স্বাস্থ্যের পক্ষে কত প্রয়োজন, বাঙ্গালা দেশের সহরের লোক তা বোঝে না। কিন্তু আপনার বাড়ীর মেয়েরা এমন সকালবেলা ঘরে ব'সে থাকেন কেন? এই সময় একটু বাইরে বেড়িয়ে আসা ভাল।"

সুশীল বলিল, "ওরা ত রোজই বেড়াতে যায়। আমাদের চায়ের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েই চ'লে গেছে।"

ললিত একটু বিস্মিত হইল। কৈ, সে ত কাহাকেও বাহিরে যাইতে দেখে নাই। তবে বাগানের অপর দিক্ দিয়া আর একটা ফটক আছে। কিন্তু যে দেশে অবরোধের বালাই 'নাই, সেখানে এমন ভাবে সম্মুখের পথ বর্জ্জন করিবার প্রয়োজন কি? তাহার সান্নিধ্য এড়াইবার জন্যই কি এই ব্যবস্থা?"

ডাক্তার মনের চাঞ্চল্যকে সবলে দমন করিয়া বলিল, "আপনি কি বেরোবেন, না ঘরে বসেই থাক্‌বেন?"

শূন্য চা'র পেয়ালা টেবলের উপর রাখিয়া দিয়া সুনীলচন্দ্র বলিল, "আজ একবার মীনাবাজারের দিকে যাবার ইচ্ছা আছে। বাজারটা একবার ঘুরে আসব। আপনি কোন্ দিকে যাবেন?"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া ললিত বলিল, "বাজারের দিকে গেলেও চলে, কিন্তু দাড়োয়ার দিকে যাবার জন্যই মন টান্‌ছে।"

সহাস্যে সুশীল বলিল, "মন যে দিকে টানে, সেই দিকে যাওয়াই ভাল। দার্শনিকগণ বলেন যে, মন ভবিষ্যদর্শী। নিষ্ঠাভরে তার কথা শুনে কায করলে লাভই হয়, লোকসান ঘটে না। "শিবাস্তে পন্থানঃ'।"

ললিত ধীরে ধীরে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। আলোয়ানখানা গায় জড়াইয়া, একখানি ভ্রমণ-যষ্টি হাতে লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল।

চৌদ্দ

দলে দলে নর-নারী—বালক-বালিকা অসঙ্কোচে শীতের রৌদ্র-করোজ্জ্বল বায়ু সেবন করিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু তাহার নয়ন যাহার দর্শনপ্রার্থী, মন যাহাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র, উন্মুখ, তাহার কোন চিহ্নই নাই। ললিত নিতাই-প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছিল, মণিমালা যমুনা, সোনার মার কোলে খুকুরাণীকে চাপাইয়া, দ্বারবান্ হিন্দ্‌পাল সিংয়ের সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে।

ললিত ভাবিয়াছিল, দাড়োয়ার দিকে সকালবেলা তাহারা নিশ্চয়ই বেড়াইতে যাইবে। কারণ, কয় দিন ধরিয়া সে দেখিতেছে যে, স্বাস্থ্যান্বেষী প্রবাসীরা প্রায়ই এই দিকে বেড়াইতে আইসে। তাই সে এই দিকেই আসিয়াছিল।

সুশীলের কথার ইঙ্গিতটা সে নিজের মনের অভিপ্রায় অনুসারে গ্রহণ করিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল, সুশীল তাহার মনের কথা না জানিয়াই সাধারণ দার্শনিকের ন্যায় যে মন্তব্য করিয়াছিল, তাহার মধ্যে যেন সত্যের ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

কিন্তু কৈ, সে যাহার সন্ধানে বাহির হইয়াছে, তাহার ত দেখা নাই!

সহসা ললিতের মনে হইল, তাহার মনের এই কাঙ্গাল-পণা, ইহা কি সমর্থনযোগ্য? একটি তরুণী বিধবার প্রতি তাহার মনের এমন প্রচণ্ড আকর্ষণ, ইহা কি সঙ্গত?

সঙ্গত নহে কেন? অল্পবয়সে যমুনা স্বামী হারাইয়াছে। তাহার সন্তানও নাই—শ্বশুরালয়ে আপনার জন বলিয়া দাবী করিবারও কেহ নাই। এই তরুণী বিধবার জ্যেষ্ঠ সহোদর পুনরায় ভগিনীর বিবাহ দিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। ললিত যদি প্রার্থী হয়, তবে খুব সম্ভব তাহার আবেদনে সুশীলচন্দ্র কোন আপত্তিই করিবে না। ললিত স্বয়ং যমুনার প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রীতির অঞ্জলি নিবেদন করিবার জন্য উন্মুখ। সে সমগ্র অন্তর দিয়া তরুণীকে—হাঁ, ভালবাসে। সুতরাং তাহার অন্তরের এই দর্শনপিপাসা কিরূপে সমর্থনের অযোগ্য হইতে পারে?

না, সে কোনও অপরাধ করে নাই। ভারতীয় হিন্দুর মনোবৃত্তির দিক্ দিয়া বিচার করিলে কোনমতেই তাহার মনের এই নির্দোষ অভিসারকে নিন্দা করা চলে না।

ললিত মৃদুগতিতে চলিতেছিল। যে যুক্তিজাল রচনা করিয়া সে আপনার মানসিক আবেগের সমর্থন করিতেছিল, গতির তালে তালে তাহা আন্দোলিত হইতে লাগিল।

সহসা তাহার গতিবেগ বর্দ্ধিত হইল।

সত্যই কি তাহার যুক্তিজাল অমোঘ, অব্যর্থ? তবে ভিতর হইতে সম্পূর্ণ অনুমোদন আসিতেছে না কেন? কে যেন প্রতিবাদ করিয়া মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিতেছে, না—ঠিক হইতেছে না।

সে আরও দ্রুত চলিতে লাগিল।

সবই সত্য। কিন্তু এই তরুণী—এই বিধবা হিন্দুর অন্তঃপুরচারিণীর দিক্ দিয়া বিষয়টি কি বিবেচনা করা হইয়াছে?

যমুনা ঠিক বালিকা-বয়সে পরিণীতা হয় নাই,তাহার স্বামীকে সে অল্পদিনের মধ্যেই হারাইয়াছে সত্য ; কিন্তু সে দাম্পত্য-জীবনের রসাস্বাদ করিয়াছে। অবশ্য সাধ ভাল করিয়া চরিতার্থ হইবার পূর্ব্বেই সে যৌবনের প্রথম পাদেই স্বামিহারা হইয়াছে।

হিন্দু-স্ত্রী যেরূপ নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা-সহকারে স্বামীর সুখে-দুঃখে আপনাকে বিলাইয়া দেয়, তাহা ত ছেলেখেলার মত উপেক্ষণীয় নহে। পুনরায় অন্যের পত্নী হইবার মত মনোবৃত্তি যমুনার পক্ষে কতদূর সত্য, তাহা যতক্ষণ প্রকাশ না পাইতেছে, ততক্ষণ এই তরুণীকে পরপত্নী হিসাবে গণনা করা কি হিন্দুর পক্ষে একান্ত বাঞ্ছনীয় নহে ?

ললিতের মার্জ্জিত মনোবৃত্তি এই সত্যকে অস্বীকার করিতে পারিল না। তাহার অন্তরতম প্রদেশ হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল, না, তোমার এমন ভাবে পরস্ত্রীর প্রতি লোলুপতা সহস্র সহস্র বৎসরের পুরাতন, সনাতন সভ্যতার অনুযায়ী নহে। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা মনের এই সহজ ও স্বাভাবিক গতিবেগকে সংযত করিবার ব্যবস্থাই দিয়াছে। য়ুরোপের সভ্যতা, প্রতীচ্যের দর্শন শাস্ত্র, সাহিত্য ও যৌনতত্ত্বশাস্ত্র, যাহাই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করুক না কেন, ভারতীয় হিন্দু-শাস্ত্র, হিন্দু-দর্শন, হিন্দুর নীতিবিজ্ঞান কোনও মতেই তাহা সমর্থন করিবে না।

ললিত শান্তভাবে দাড়োয়ার সিকতা-ভূমির উপর বসিয়া পড়িল। মনের প্রবল আবেগ এবং চিরন্তন সংস্কার—উভয়ের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল।

বহুক্ষণ ধরিয়া মানসিক তর্কদ্বন্দ্বের পরও ললিত কোনও

মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিল না। অন্যমনস্কভাবে সে একবার তাহার বাম হস্তের মণিবন্ধের দিকে চাহিল। ঘড়ির কাঁটার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে বাস্তব-জগতে নামিয়া আসিল।

নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। সে প্রায় সওয়া ঘণ্টা এখানে বসিয়া আছে। না, আর বিলম্ব করা চলে না। সে উঠিল—দাড়োয়ার বুকের উপর দিয়াই চলিল। নদীর বক্ষ শুধু বালুকাময়। জলের রেখা কদাচিৎ কোথাও দেখা যাইতেছে। গৃহস্থ বালি খনন করিয়া পানীয় জল সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছে। সেই খনিত অংশে কিছু জল জমিয়া রহিয়াছে।

ললিত নত হইয়া জল তুলিয়া উত্তপ্ত ললাট ও মুখ ধৌত করিল। শীতল, স্নিগ্ধ সলিলস্পর্শে তাহার ললাটদেশ যেন জুড়াইয়া গেল।

খানিকদূর এইভাবে চলিয়া সে মাঠ ভাঙ্গিয়া সদর-রাস্তায় উঠিল। মিশনগৃহের সন্মুখে উপস্থিত হইয়া সে কয়েক মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। একদল নর-নারী দক্ষিণদিক্ হইতে আসিতেছে দেখিয়া সে দক্ষিণ-দিকেই চলিতে আরম্ভ করিল।

অকস্মাৎ তাহার হৃৎপিণ্ড দ্রুততালে নৃত্য করিয়া উঠিল।

হাঁ, তাহার অনুমান সত্য। মণিমালা ও যমুনা আসিতেছে। সোণার মার কোলে খুকুরাণী। হিন্দপালসিং দীর্ঘ যষ্টি হস্তে সকলের পশ্চাতে। তাহার প্রকাণ্ড এবং শুভ্র গুম্ফ বাতাসে ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে দেখা গেল।

মুহূর্ত্তের জন্য সংশয়-দোলায় তাহার চিত্ত আলোড়িত হইল। এ অবস্থায় সে কি করিবে? অগ্রসর হইবে, না ফিরিয়া যাইবে?

তাহাদিগকে দেখিয়া ফিরিয়া যাওয়া কিন্তু সঙ্গত হইবে না। উহারা নিশ্চয়ই তাহাকে লক্ষ্য করিয়াছে। সুতরাং এখন ফিরিতে গেলেই তাহার অর্থ অন্যরূপ দাঁড়াইবে না কি?

ললিত ডাক্তার সোজা অগ্রসর হওয়াই সমীচীন মনে করিল। কারণ, সে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে—তাহাদিগকে দেখিবার উদ্দেশ্যে নহে—সোজা, অসঙ্কোচে অগ্রসর হইলে উহাই প্রমাণিত হইবে।

ডাক্তার সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইল। কাছে আসিতেই হিন্দপালসিং ডাক্তারকে সেলাম করিল। অভিবাদন ফিরাইয়া দিয়া ললিত অপাঙ্গে যমুনার দিকে চাহিয়া লইল। তাহার পর সে সোজা চলিতে লাগিল।

যমুনার আননে প্রসন্নতার দীপ্তি পলক দৃষ্টিপাতে সে দেখিয়া লইল। কথা কহিবার প্রবল বাসনা সত্ত্বেও সে সাহস করিয়া সম্ভাষণ জানাইতে পারিল না। কারণ, এই তরুণীযুগল সেরূপ কোনও লক্ষণ প্রকাশ না করায় ডাক্তারও পথের মাঝে আত্মীয়তা-জ্ঞাপনের প্রয়াস প্রকাশ করিতে পারিল না।

চলিতে চলিতে ললিত একটু অন্যমনস্ক হইয়াছিল। সহসা কাহার আহ্বানে সে পার্শ্বে ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, যতীন্দ্রনাথ পুত্রের হাত ধরিয়া গেটের পাশে দাঁড়াইয়া তাহাকে আহ্বান করিতেছে।

যমুনারা কি তবে যতীন বাবুর বাড়ীতেই বেড়াইতে আসিয়াছিল?

ললিতের মুখমণ্ডলে কি ছায়া ঘনাইয়া উঠিল? কিন্তু সে যখন সহাস্যমুখে যতীনের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন তাহার ভাবপরিবর্ত্তনের কোনও আভাস মুখমণ্ডলে প্রকাশ পাইল না।

যতীন্দ্রনাথ বলিল, "বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি? একটু আগে ওঁরা চ'লে গেলেন।"

ডাক্তার কিন্তু চমকিয়া উঠিল না। পূর্ব্বাহ্নেই এ অনুমান তাহার হইয়াছিল। সে বলিল, "আপনার এ অঞ্চলটা আরও সুন্দর। দিগড়িয়া পাহাড়টা এখান থেকে বেশ দেখা যাচ্ছে। আপনি সকালে বেড়াতে যান নি, যতীন বাবু?"

যতীন হাসিয়া বলিল, "আমার বেড়ান বেলা আটটার মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। আপনি এখন ফিরবেন, না গরীবের কুটীরে পায়ের ধূলো দেবেন?"

লজ্জিতভাবে ডাক্তার বলিল, "কি যে বলেন আপনি। কিন্তু এখন বাসার দিকে ফেরাই ভাল। বেলা সাড়ে নয়টা হয়ে গেছে। বাসায় পৌছতে দশটা বেজে যাবে।"

নমস্কারের আদান-প্রদানের পর ললিতচন্দ্র পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতপদে ফিরিয়া চলিল।

পনের

"শোন, শোন, তোমার চিঠি আছে।"

স্বামীর আহ্বানে মণিমালা কাছে আসিল। সুশীল তাহার হাতে একখানা খামে আঁটা পত্র দিল। মীনাবাজারে যাইবার সময় ডাকঘরে গিয়া সে ডাকের চিঠিপত্র চাহিয়া লইয়াছিল। ডাকঘর হইতে প্রত্যহ হিন্দপালসিং ডাক লইয়া যাইত। আজ সে মণিমালাদের সঙ্গে বাহির হওয়ায়, সুশীল নিজেই বাজারের পথে সে কাযটা সমাধা করিয়া লইয়াছিল।

চিঠি দেখিয়াই মণিমালা বুঝিতে পারিল, তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী লিখিয়াছে। সুষমা তাহার সহোদরা নহে, মাতৃসমা মাসীর একমাত্র কন্যা। মণিমালা খাম খুলিয়া পড়িল—

"শ্রীচরণেষু

দিদি,

এখানে আসিয়াই শুনিলাম, তোমরা দেওঘরে গিয়াছ। বৃন্দাবন হইতে আজ সাত দিন আসিয়াছি। দাদা মাকেও লইয়া আসিয়াছেন। প্রেম মহাবিদ্যালয়ের পড়া একরকম শেষ হইয়াছে। সুতরাং আর সেখানে থাকিবার প্রয়োজন হইবে না। মা বৈদ্যনাথজী দেখিতে যাইবেন বলিতেছেন। কাযেই আমরা সঙ্গে যাইব। দাদা আমাদিগকে ওখানে পৌছাইয়া দিয়াই পাটনায়

চলিয়া যাইবেন। বৌদিরা সেখানে আছেন। মা ও আমি তোমাদিগকে দেখিবার জন্যই কলিকাতার বাড়ীতে আসিয়াছিলাম। তোমার মেয়েটিকে ছয় মাসের দেখিয়া গিয়াছিলাম। খুকুরাণী এখন বড় হইয়াছে। কেমন দেখিতে হইয়াছে, দিদি? সুশীল বাবু কেমন আছেন? তুমি ও জামাইবাবু আমার প্রণাম লইও। যাওয়ার দিন এখনও স্থির হয় নাই। তোমাদের ওখানেই উঠিব। জামাইবাবুকে বলিও। ইতি—

তোমার স্নেহের বোন,

সুষমা।"

মণিমালার মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এই মাসীমাই তাহাকে শৈশবে লালনপালন করিয়াছিলেন। মণিমালা অল্পবয়সেই মাকে হারাইয়াছিল। মাসীমাই তাহাকে বুকে-পিঠে করিয়া নিজের মেয়ের মত লালনপালন করিতেন। তাঁহার কন্যা ছিল না। একটি পুত্র। মণিমালাকে পাইয়া তাঁহার কন্যা-স্নেহ সার্থক হইয়াছিল। তার পর যখন সুষমা জন্মগ্রহণ করিল, তখন দুই জনকেই সমান আদরে পালন করিয়াছিলেন। সুষমা মণিমালার অপেক্ষা চার বৎসরের ছোট। দুই ভগিনী বাল্যবয়সে জানিতেই পারে নাই, তাহারা সহোদরা নহে। পরম-স্নেহাস্পদা ভগিনী ও মাতৃসমা মাসীমাতা আসিতেছেন, জানিয়া মণিমালার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল।

স্বামীর হাতে ভগিনীর পত্র অর্পণ করিয়া মণিমালা পাঠরত

স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল। সুশীলচন্দ্র পত্র পাঠ করিয়া বলিল, "আজই টেলিগ্রাম ক'রে দেই, ওঁরা শীঘ্র আসুন। কি বল?"

মণিমালা ইহাই চাহিতেছিল। সে তখনই সম্মতি জানাইল।

যমুনা ভ্রাতৃবধূর সন্ধানে আসিতেছিল। তাহার ক্রোড় খুকুরাণী শীলা অধিকার করিয়াছিল।

দাদা ও বৌদিদির হাসিমুখ দেখিয়া সে বলিল, "তোমরা এত খুসী যে? কোন সুখবর আছে না কি?"

মণিমালা হাসিয়া বলিল, "সুষমারা আসছে, ভাই।"

"তাই না কি? সে বেশ হবে, বৌদি। মাসীমাও আসছেন?"

"হাঁ ভাই, তিনিও আস্ছেন। দু'বছর তাঁকে দেখি নি।"

সুশীলচন্দ্র টেলিগ্রাম পাঠাইবার জন্য বাহিরে চলিয়া গেল। তখনও আহারের বিলম্ব ছিল।

মণিমালা ও যমুনা কোন্ ঘরে মাসীমা ও সুষমা থাকিবেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে গেল। বাড়ীতে ঘরের অভাব ছিল না।

সুশীল যে ঘরে শয়ন করিত, তাহার পার্শ্বের ঘরে যমুনা সোণার মাকে লইয়া শয়ন করিত। তাহার পার্শ্বে আরও দুইখানি প্রশস্ত ঘর ছিল। একখানিতে মণিমালা ও [illegible]সিয়া পড়াশুনা অথবা গল্পগুজব করিত; তাহার পার্শ্বস্থ ঘরটি অতিথিদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। পশ্চিমের অবাধ বায়ু সে ঘরে প্রবেশ করিত। এই আলোকিত ঘরখানিই সুষমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। ঘরের দুই পার্শ্বে দুইখানি খাট। মা ও মেয়ে স্বচ্ছন্দে আরামে এই ঘরে থাকিতে পারিবেন।

ননদ ও ভাজ তখনই চাকরদিগকে ডাকিয়া পরিচ্ছন্ন ঘরটিকে অতিথিদিগের উপযোগী করিয়া সাজাইল। মাসীমা স্বহস্তে পাক করেন। যমুনার হবিষ্য-গৃহে তাঁহার আহারের অসুবিধা হইবে না।

বেলা বারটার মধ্যে সকল কায সারিয়া দুই জনে স্নান-ঘরে গিয়া শুচিস্নাতা হইয়া আসিল। প্রত্যহ এই সময়েই তাহাদের আহারের আয়োজন হয়।

সুশীল ও ললিত আহারার্থে ভোজন-কক্ষে আহূত হইল। প্রত্যহ মণিমালা আহারাদির সময় উপস্থিত থাকিয়া স্বামী ও ডাক্তারের আহার্য্য পরিবেষণে সহায়তা করিত। যমুনা কখন কখন সেখানে উপস্থিত থাকিত না, এমন নহে।

আজ মধ্যাহ্ন-ভোজনকালে মণিমালা লক্ষ্য করিল, ডাক্তার ললিতের আননে একটা গাম্ভীর্য্য-রেখা পড়িয়াছে। নারীর দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। পুরুষ যাহা সাধারণতঃ লক্ষ্য করে না, নারীর দৃষ্টিপথ হইতে তাহা এড়ায় না। সামান্য হইতে অসামান্য পরিবর্ত্তন, কিছুই নারীর দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে না।

আহারাদির পর বিশ্রাম-কক্ষে মণিমালা স্বামীকে ডাকিয়া বলিল, "ডাক্তার বাবুর মুখ অত গম্ভীর কেন, বল্‌তে পার?"

সুশীল বলিল, "তাই না কি? কৈ, আমি ত কিছু লক্ষ্য করি নি!"

মণিমালা একটা পাণ মুখে ফেলিয়া বলিল, "মুখখানা খুব গম্ভীর দেখলুম।"

সুশীল হাসিয়া বলিল, "ডাক্তার বাবুর সম্বন্ধে তোমার দরদ

প্রশংসনীয়! তাঁর মুখের ভাব কখন প্রসন্ন, কখন্ ম্লান হয়, তাও পর্যন্ত তোমার লক্ষ্য আছে দেখছি।"

স্বামীর মুখের চাপা হাসি মণিমালার দৃষ্টি অতিক্রম করিল না; সে ঈষৎ আরক্ত মুখে বলিল, "তোমার বন্ধু বলেই দৃষ্টি রাখাটা অসঙ্গত মনে করিনি। কিন্তু তোমাদের পুরুষ জাতের মনটা যেমন মনে কর, মেয়েমানুষকে তা ভাবা যে ভুল, এ জ্ঞানটা তোমাদের নেই।"

সুশীলচন্দ্র হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসির শব্দে আকৃষ্ট হইয়া পার্শ্বের ঘর হইতে যমুনা দ্রুতপদে আসিয়া বলিল, "দাদা, অত হাস্‌ছ যে, কি হয়েছে?"

সহোদরাকে দেখিয়া সুশীল হাসি থামাইল।

মণিমালা বলিল, "অত হাসির কি ঘটেছে, শুনি?"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া সুশীল বলিল, "তোর বৌদি ললিত ডাক্তারের গম্ভীর মুখ আজ দেখেছেন। তাই ওঁর দুর্ভাবনা হয়েছে, কেন এমন হ'ল।"

যমুনা হাসিয়া বলিল, "এক জন ভদ্রলোক সব ছেড়ে ছুড়ে আমাদের এখানে আছেন, তাঁর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রাখা ত বাড়ীর গিন্নীর কর্ত্তব্য। তা সে জন্য তোমার এত হাসি পাবার কোন কারণ ত, দেখছি না, দাদা!"

মণিমালা বলিল, "তাই বল্ ত, ঠাকুরঝি। পুরুষমানুষের মন বড় নোংরা। লেখা-পড়াই শিখুন আর বিলেত ঘুরেই আসুন— স্বভাব বদলায় না।"

সুশীল আবার উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

অপরাহ্ণের সূর্য্যালোক ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল।

মণিমালা ও যমুনা সুশীলের হাসি দেখিয়া আর কোন উত্তর করিল না।

যমুনা বলিল, "চল বৌদি, তোমার চুল বেঁধে দি। বেড়াতে যাবার সময় হয়ে আসছে।"

বাহিরের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ দ্বারবান হিন্দপালসিং বলিল, "হুজুর, তার আয়া।"

সুশীল ঘরের বাহিরে গিয়া তার লইয়া ফিরিল।

মণিমালা বলিল, "কে তার পাঠালে?"

পড়িতে পড়িতে সুশীল বলিল, "তোমার দাদা পাঠিয়েছেন। আজই তাঁরা রওনা হবেন। কা'ল সকালে এসে পৌছুবেন।"

যমুনা ও মণিমালার মুখে আনন্দের জ্যোৎস্না-ধারা খেলিয়া গেল। সুষমা আসিতেছে। কালই আসিবে। দুই বৎসর পরে আবার দেখা হইবার শুভক্ষণ আসিয়াছে!

মণিমালা তাড়াতাড়ি ঘর হইতে চলিয়া গেল। যমুনাও ভ্রাতৃজায়ার অনুসরণ করিল।

ষোল

বৈদ্যনাথধাম ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই সুশীল দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার দিকে দ্রুত অগ্রসর হইল। মণিমালা ও যমুনা ষ্টেশনে আসিয়াছিল। তাহারাও সেই দিকে দ্রুতপদে চলিতেছিল। সহসা পশ্চাৎ হইতে ডাক আসিল, "সুশীল বাবু!"

তিন জনই পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল।

একখানি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা হইতে দীর্ঘাকার, সুদর্শন এক জন পুরুষকে নামিতে দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইল। তিনি বিমলচন্দ্র, মণিমালার দাদা। এই ধনি-সন্তান, পাটনার এক জন বিশিষ্ট ব্যবহারাজীব যে, তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী হইতে নামিবেন, ইহা তাহারা কল্পনাও করে নাই।

কিন্তু সে বিষয়ে চিন্তা করিবার অবকাশ ছিল না। মাসীমার সঙ্গে সুষমাকে নামিতে দেখিয়া মণিমালা ও যমুনা তাঁহাদের কাছে সহাস্যমুখে অগ্রসর হইল। প্লাটফরমের উপর মণিমালা ও যমুনা পৌঢ়া মাসীমাতার চরণ-ধূলি গ্রহণ করিল। সুশীলও শ্বশ্রূমাতার চরণ বন্দনা করিল।

সঙ্গের ভৃত্য, কুলীর সাহায্যে জিনিষ-পত্র নামাইয়া লইল।

বিমলচন্দ্র সহাস্য-দৃষ্টিপাতে সুশীলকে বলিলেন, "তৃতীয় শ্রেণীতে আসতে দেখে একটু চমকে গেছ বুঝি, সুশীল বাবু? কি করি,

সুষমা কিছুতেই ছাড়লে না। সে বলে, দেশের কোটি কোটি লোক যাতে ক'রে যেতে পারে, সেই শ্রেণীতে যাওয়া কিসে অসম্মানকর, তা বুঝিনে। তবে গাড়ী রিজার্ভ ক'রে আস্‌তে তার আপত্তি হয়নি।"

জিনিষ-পত্র লইয়া কুলীরা অগ্রসর হইয়াছিল। সকলে ষ্টেশনের বাহিরে আসিলেন। পক্ষিরাজ-ঘোটক-বাহিত গাড়ীগুলি মাল ও যাত্রিবহনের জন্য বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। তাহারই একখানিতে জিনিষ-পত্র তুলিয়া দেওয়া হইল।

সুষমা বলিল, "দেওঘর বেড়াবার যায়গা। এখানে গাড়ী চ'ড়ে যাবার সার্থকতা কি, সুশীল বাবু? আমরা হেঁটেই যাব।"

মণিমালা ও যমুনা হাঁটিয়াই ষ্টেশনে আসিয়াছিল। সুশীলচন্দ্রেরও ইহাতে অমত কিছুমাত্র ছিল না। তখন গাড়ীর মধ্যে ভৃত্যকে বসাইয়া দিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দেওয়া হইল। গল্প করিতে করিতে সকলে পদব্রজে চলিলেন।

ফাঁকা মাঠের ধারে "দেবনিবাস" দেখা গেল। গাড়ী পূর্ব্বেই মালপত্র লইয়া পৌছিয়া গিয়াছিল। পুষ্পিতলতা-শোভিত ফটকের ভিতর প্রবেশ করিয়া কঙ্করাস্তৃত পথের উপর দিয়া সুশীলচন্দ্র সকলকে লইয়া যখন অগ্রসর হইতেছিল, ললিতচন্দ্র তখন বারান্দায় বেড়াইতেছিল। মণিমালা ও যমুনার সহিত নবাগতা মহিলাদিগকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া ডাক্তার বারান্দা ত্যাগ করিয়া বাহিরের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল।

কিছুক্ষণ আগে সে বেড়াইয়া ফিরিয়াছিল। গাড়ী হইতে তখন

মালপত্র নামান হইতেছিল। সে শুনিয়াছিল, মণিমালার ভগিনীর ও মাসী-মাতা আসিতেছেন। অপরিচিত পুরুষের পক্ষে নবাগতাদিগের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকা শোভন ও সঙ্গত হইবে না মনে করিয়া সে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

কিন্তু কৌতূহল মানবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। ঘরের মধ্য হইতে সে দেখিতে পাইল, সুশীলের সহিত এক দীর্ঘাকার, গৌরবর্ণ পুরুষ দীর্ঘপদবিক্ষেপে আসিতেছেন। নবাগত পুরুষটির প্রসন্ন মুখমণ্ডলের ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফযুগল দেখিয়া সহসা ললিত চমকিয়া উঠিল।

এ মূর্ত্তি তাহার সুপরিচিত। সহস্র মানুষের মধ্য হইতেও এই পুরুষটিকে বাছিয়া লইতে এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় না। পুরুষটির আকৃতিতে এমন বৈশিষ্ট্য আছে যে, একবার মাত্র দেখিলেও, বহুদিন পরেও চিনিতে কষ্ট হয় না।

ললিতচন্দ্র একবার চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া লইল। না, চার বৎসর পূর্ব্বে দৃষ্ট হইলেও বিমল বাবুর মূর্ত্তি ভুলিবার নহে। সেই সদানন্দ পুরুষের গম্ভীর কণ্ঠের সরস বাক্যালাপ সে কোন দিন ভুলিবে না। হাঁ, সেই সুপরিচিত কণ্ঠস্বর।

সুশীল বাবুর সহিত বিমল বাবুর কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে? কৈ, ইতিপূর্ব্বে কোনও দিনই ত সে তাহা জানিতে পারে নাই!

ললিতচন্দ্র একখানি কেদারায় বসিয়া পড়িল।

"বাঃ সুশীল! তোমার বাড়ীখানা সত্যি চমৎকার। তোমার বাবার পছন্দ ছিল বটে! চমৎকার বাগান! ভারী সুন্দর লাগ্ছে।"

কণ্ঠস্বর বারান্দা অতিক্রম করিয়া নিকটবর্ত্তী হইল। পদশব্দ ক্রমে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

ললিতচন্দ্র সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিমলচন্দ্র ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "এ কে? ললিত বাবু? আপনি এখানে আছেন?"

ললিত ততক্ষণ প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। স্বরের কুণ্ঠা অনেকটা সংযত করিয়া সে নমস্কার করিয়া বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, দিন পাঁচ ছয় এখানে এসেছি।"

সুশীল বলিল, "উনি আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক। এখানে যখন আসি, ওঁকে নিয়ে এসেছি। খুকীর ধাত উনি ভালই বোঝেন। তা ছাড়া উনি মোহিতের সতীর্থ ছিলেন!"

"বেশ! বেশ। অনেক দিন পরে দেখে খুব খুসী হলুম।"

সুশীল বলিল, "ডাক্তার বাবুকে আপনি চেনেন?"

হা হা করিয়া হাসিতে হাসিতে প্রসন্ন-কণ্ঠে বিমল বলিলেন, "খুব চিনি ওঁকে। পাটনায় উনি বেড়াতে গিয়েছিলেন, সেই সময় আলাপ হয়।"

ললিতচন্দ্র যেন অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

কিন্তু বিমলচন্দ্র সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া বলিলেন, "আপনি বিলেত গিয়েছিলেন ত?"

ললিতচন্দ্র অনুভব করিল, পৌষের প্রচণ্ড শীতেও তাহার ললাট যেন ঘর্ম্মসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে সংক্ষেপে কোন রকমে উত্তর দিল, "না, বিলেত যাওয়া আর ঘ'টে ওঠে নি।"

সুশীল বলিল, "ওঁর এর মধ্যেই কলকাতায় বেশ পসার হয়েছে। বিলেতে গেলে কি আর এমন বেশী হ'ত? ভাল চিকিৎসকের বিলেত যাবার দরকার আছে ব'লে আমার মনে হয় না।"

"তাই না কি? তুমি বিলেত ফেরত হয়ে এ কথা বলছ?"

বিমলচন্দ্রের কণ্ঠে প্রসন্ন হাস্য যেন তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল।

পাছে অন্য প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, এ জন্য যেন ললিতচন্দ্র আপনাকে কিছু বিব্রত বলিয়া মনে করিতেছিল। তাহার মুখমণ্ডলের উদ্বেগচিহ্ন তাহাই প্রকটিত করিয়া তুলিল। কিন্তু বিমলচন্দ্র বা সুশীলের তাহার দিকে তেমন লক্ষ্য ছিল না।

সুশীল বলিল, "বিলাতে গেলে বিদ্যে বেশী হয়, এ ধারণা এখন আমার নেই। বিশেষতঃ উদ্দাম যৌবনকালে ও দেশে উন্নতির তুলনায় অনেকের অনেক বিষয়ে অবনতি ঘটেছে, তার প্রমাণ আছে।"

বিমলচন্দ্র বলিলেন, "তোমার মতের সঙ্গে আমার বিরোধ মোটেই নেই। আমার বহু বন্ধু বিলেত থেকে ফিরে এসেছেন। তাঁদের যে সকল সদ্‌গুণ ছিল, দেখ্‌তে পাচ্ছি, ও দেশের হাওয়ায় তার রূপ-পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। অনেকে এমন বাঁদরাম শিখে এসেছেন, বাইরের জৌলুষেও তা ঢাকা পড়ে না।"

"খুব সত্যি কথা, দাদা। আমি যদি ওখানকার ভদ্র পরিবারে না থেকে অন্যভাবে থাক্‌তাম, তবে আমারও দুর্দ্দশার সীমা থাক্‌ত না। ভগবান্ আমাকে রক্ষা করেছেন।"

বিমলচন্দ্র গায়ের মোটা আলোয়ানখানা আলনায় রাখিয়া, গরম জামা খুলিয়া ফেলিলেন।

সুশীলবলিল, "একটু চা হবে কি, দাদা ?"

বিরাটকায় পুরুষটি হাসিয়া বলিলেন, "ওরে বাপ্ রে, চা খাবার জো আছে না কি ? সুষি আমাকে চা ছাড়িয়ে দিয়েছে। ওর জ্বালায় নিয়মিত চা-র পাঠ বাড়ী থেকে উঠে গেছে।"

ললিত তখন অন্যমনস্কভাবে কি চিন্তা করিতেছিল। সে সহসা চমকিয়া উঠিল।

"সুষমা কি চা ছেড়ে দিয়েছে ?"

"অনেক দিন। প্রেম মহাবিদ্যালয়ে পড়া আরম্ভ করবার পর থেকেই ও নিজে ত চা ছেড়েই দিয়েছে, বাড়ীতেও সব বন্ধ। এখন সকালবেলা তার বদলে গরম দুধের ব্যবস্থা।"

সুষমা !—তবে কি যে নবাগতা তরুণীকে সে মণিমালার পাশে পাশে অন্দরে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছে, সে কি সুষমা ? সুষমা কি মণিমালার ভগিনী ?

তাহার চিন্তায় বাধা পড়িল। সুশীল বলিয়া উঠিল, "দাদা, তা হ'লে এখন স্নানের যোগাড় করা যাক্। আপনার ত প্রাতঃস্নানের স্বভাব। আজ বেলা হয়ে গেছে।"

"হাঁ, ভাই। ভোরবেলা স্নান না করলে আমার মন ও শরীর মোটেই ভাল থাকে না। দুই বেলা স্নান—শীত, গ্রীষ্ম সকল ঋতুতেই আমার চাই।"

"তবে চলুন, আর দেরী ক'রে কায নেই !"

সতের

পঞ্চদশী কিশোরী এখন যৌবন-লাবণ্যে পরিপূর্ণ-দেহা। চারি বৎসরের ব্যবধানে সে কি তাহাকে সত্যই চিনিতে পারে নাই? সুষমা পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়াছিল; কিন্তু পূর্ব্ব-পরিচয়ের কোনও আভাস তাহার আকার ভঙ্গিতে ত প্রকাশ পায় নাই! সে যে ললিত, তাহা ত একাধিকবার বিমলচন্দ্র জানাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু সুষমার স্বভাবগম্ভীর অথচ প্রসন্ন আননে কোনও রেখাপাত করিয়াছিল বলিয়া সে ত বুঝিতে পারে নাই!

দাড়োয়ার বালুকারাশি উত্তীর্ণ হইয়া ললিতচন্দ্র একা মন্দিরের অভিমুখে চলিতেছিল। তখনও সূর্য্যের আলোক-দীপ্তি বৃক্ষশিরে ঝলমল করিতেছিল—পশ্চিম-গগন কুঙ্কুম-রাগে সমুজ্জ্বল। দলে দলে নর-নারী ভ্রমণ করিতেছে, ললিতের কোনও দিকে দৃষ্টি ছিল না।

সত্যই কি সে অপরাধ করিয়াছিল?

চিন্তাটা মনে উদিত হইবামাত্র সে আপনার অন্তরকে বিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করিল।

চারি বৎসর পূর্ব্বে এম, বি পরীক্ষা দিয়া সে পাটনাবাসী বন্ধুর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিল। ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে তাহার দিনগুলি আনন্দেই কাটিতেছিল। কঠোর পরিশ্রম সহকারে পরীক্ষা দিতে শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম, ভ্রমণ ও বন্ধু-সাহচর্য্যে শরীরে পূর্ব্বস্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিতেছিল।

যথাসময়ে সে সংবাদ পাইল, পরীক্ষায় সে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। বন্ধুর অনুরোধে আরও কিছুদিন পাটনায় থাকিয়া যাইতে হইল। সে সুখের দিনগুলির স্মৃতি ললিত এখনও ভুলিতে পারে নাই।

হঠাৎ বন্ধুর কাশীবাসিনী মাতামহীর অসুখের সংবাদ পাইয়া বন্ধু তাহার বিধবা জননীকে লইয়া কাশী চলিয়া গেল। বন্ধুর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে ললিত পাটনায় রহিয়া গেল। কয়দিন পরেই বন্ধু ফিরিয়া আসিবে। বাড়ীতে পুরাতন পাচক ও চাকর রহিল, তাহার পরিচর্য্যার কোনও অসুবিধা হইবে না। সুতরাং ললিত বন্ধুর প্রত্যাবর্ত্তন-প্রতীক্ষায় রহিয়া গেল।

সে দিন সন্ধ্যায় ভ্রমণকালে অকাল-জলদোদয়ে বেহারের আকাশ সমাচ্ছন্ন থাকিলেও ললিত ভবিষ্যজীবনের একটা ছক ভাবিতে ভাবিতে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল। বিলাতে গিয়া চিকিৎসাবিভাগের জ্ঞান আয়ত্ত করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারিলে ভালই হইবে। অর্থের অভাব তাহার নাই। সুতরাং বিলাতের ব্যয়সাধ্য পরীক্ষা দিবার কোনও অসুবিধা তাহার হইবে না। স্বাধীন দেশের আবহাওয়ার পরিচয় লইয়া ফিরিবার আগ্রহ তাহার মনের এক প্রান্তে বহুদিন হইতেই সঞ্চিত ছিল।

অসময়ে শীতের দিনে বারিপাতের আশঙ্কা তাহার মনে একবারও উদিত হয় নাই। চিন্তার সূক্ষ্মতম ঊর্ণনাভ-জালের সূত্র

ধরিয়া মন যখন আবর্ত্তিত হইয়া ফিরিতেছিল, সেই সময় অকস্মাৎ বৃষ্টিধারা নামিয়া আসিল। মুক্তপ্রান্তরের মধ্যে কোনও আশ্রয় মিলিল না—সহর হইতে বহুদূরে সে আসিয়া পড়িয়াছিল। বৃষ্টি পড়িতে দেখিয়া সে দ্রুতপদে ফিরিল।

সারা পথ ভিজিতে ভিজিতে সে যখন বাসায় ফিরিল, তখন ওভারকোট ভিজিয়া সর্ব্বাঙ্গ দিয়া জল গড়াইতেছে। সিক্তবস্ত্র ত্যাগ করিয়া সে শয়নকক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিল। প্রচণ্ড শীতে তাহার দেহের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। ট্রাঙ্কের মধ্যে কুইনিনের বড়ী ও ব্রাণ্ডি ছিল। ঔষধ হিসাবে সে এক ডোজ সেবন করিল। কিন্তু লেপের মধ্যেও যে প্রচণ্ড শীত সে অনুভব করিল, তাহাতে রাত্রিকালে আহারের স্পৃহা রহিল না।

বায়স্কোপের ছবির মত চারি বৎসর পূর্ব্বের দৃশ্যাবলী তাহার মানস-দৃষ্টির সম্মুখে আবির্ভূত—তিরোহিত হইতে লাগিল।

পরদিন সমস্ত শরীরে বেদনা ও সর্দ্দির প্রকোপ সে অনুভব করিল। শরীরে উত্তাপও মন্দ নহে। মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে শয্যায় এ-পাশ ও-পাশ করিতে লাগিল। একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব ক্রমেই তাহার চেতনাকে যেন বিলুপ্ত করিতেছিল।

পরে সে শুনিয়াছিল, দুই দিন এই ভাবে চলিবার পর পার্শ্বের বিমল বাবুর বাড়ীতে বন্ধুর পুরাতন ভৃত্য সংবাদ দিয়াছিল। তখন সে এক প্রকার অচেতন অবস্থায়। বন্ধু তাহার মাতাকে লইয়া ফিরিয়া আসিতে পারে নাই। সেখানেও বৃদ্ধার জীবন ও মৃত্যু লইয়া সংগ্রাম চলিতেছিল।

বিমলবাবু ডাক্তার ডাকিয়া তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নিয়মিত পরিচর্য্যা ও শুশ্রূষার জন্য বিমল বাবুর মাতা, পত্নী ও সহোদরা পালা করিয়া তাহাকে মৃত্যুর মুখ হইতে কাড়িয়া লইয়া-ছিলেন। অনেক দিন এই ভাবে তাহার কাটিয়াছিল। সাংঘাতিক নিউমোনিয়া রোগ হইতে, এমন প্রাণঢালা, অক্লান্ত শুশ্রূষা ব্যতীত, তাহার পরিত্রাণের কোন উপায়ই ছিল না, ইহা সে পরে বিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট অবগত হইয়াছিল।

তখন সুষমার মাত্র পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম। মাতা ও কন্যা অধিকাংশ সময় তাহার রোগশয্যা-পার্শ্বে থাকিতেন। বিমল বাবু সহোদরার সহিত রাত্রিকালে তাহার সেবা করিতেন।

তিন সপ্তাহ পরে যখন রোগমুক্ত হইয়া সে পথ্য পাইয়াছিল, সেই সময় তাহার বন্ধু কাশীধাম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। ভাল করিয়া শরীরে বলাধান হইতে আরও এক মাস সময় লাগিয়াছিল।

এই সময়ে বিমল বাবু ও তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত ললিতের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। বিমল বাবু তাহারই স্বজাতি ও স্বশ্রেণীর লোক। ভগিনীর জন্য তিনি সুপাত্রের সন্ধান করিতেছেন।

ললিত বাঞ্ছনীয় সুপাত্র। বিমল বাবু ললিতের বন্ধুর মারফৎ তাহার কাছে সুষমার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। সুষমা গৌরী না হইলেও তাহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা এবং অঙ্গপ্রত্য-ঙ্গের গঠন-পারিপাট্য তাহাকে সুন্দরী বলিয়া নিশ্চয়ই ঘোষণা করিবে।

কিন্তু ললিতের মন তখন পশ্চিম উপকূলে—সাগরপারে যাইবার জন্য উন্মুখ। সেখান হইতে সে যখন উচ্চতম উপাধি লইয়া ফিরিবে তখন তাহার 'গৃহ-লক্ষ্মীর পদ যিনি অলঙ্কৃত করিবেন, শিক্ষায় ও দীক্ষায় তিনি তাহার উপযুক্ত হইবেন, ইহাই ছিল তাহার কল্পনা।

সুষমা তাহার মাতা ও ভ্রাতার কাছে লেখাপড়া করিতেছিল। সে শিক্ষা বর্ত্তমান যুগের উপযোগী বলিয়া ললিত অনুমান করিতে পারে না। অল্পশিক্ষিতা পত্নী লইয়া তাহার গার্হস্থ্য জীবন সুখকর হয় ত হইবে না। অবশ্য এই তরুণীর প্রাণপাত সেবা তাহাকে মুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ করিয়াছিল। কিন্তু কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধের জন্য সমস্ত জীবনকে আড়ষ্ট ও বিপন্ন করা যে যুক্তিসঙ্গত, ইহা সে কোনমতেই স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই। তাই বন্ধুর কাছে সুষমার সাধারণ শিক্ষার অল্পতার ইঙ্গিত করিয়াছিল। বিশেষতঃ শীঘ্রই সে বিলাতে যাইবে বলিয়া বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহে, তাহাও জানাইয়াছিল। তাহার মনের কথা আভাসে ইঙ্গিতে বিমলবাবুর নিকট প্রকাশ পাইবার পর, সে পক্ষ হইতে আর কোনও উচ্চ-বাচ্য হয় নাই। তবে এইটুকু সে লক্ষ্য করিয়াছিল, ইহার পর হইতে স্বল্পভাষিণী, কিশোরী সুষমা তাহার সান্নিধ্য সম্পূর্ণভাবে এড়াইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। পূর্ব্বে ললিত যখন বিমলবাবু ও তাঁহার জননীর সঙ্গে বসিয়া নানা কথার আলোচনা করিত, তখন মাঝে মাঝে সুষমা সেখানে উপস্থিত হইত; কিন্তু কথাটা প্রকাশ পাইবার পর হইতে একবারও সুষমা তাহার নেত্রপথে পড়ে নাই।

তার পর সে সুস্থশরীরে কলিকাতায় ফিরিয়া যায়। সেই সময়ে মহারাজ ভবতোষের সহিত তাহার পরিচয় ঘটে। তাঁহার পারিবারিক চিকিৎসকের পদলাভও ঘটে। তিনিই ললিতকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, অকারণ বিলাতে গিয়া সময় ও অর্থ ব্যয় করার অপেক্ষা ভাল করিয়া এ দেশেই চিকিৎসা করিলে সেউন্নতি করিতে পারিবে। তাই সে বিলাত-গমনের সংকল্প ত্যাগ করে।

চলচ্চিত্রের দৃশ্যগুলি মানসনেত্রের সম্মুখ হইতে মিলাইয়া গেল। ললিত চাহিয়া দেখিল, মাঠ ও পথ প্রদোষান্ধকারে অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অদূরে যশিদির ষ্টেশন দেখা যাইতেছে। চলিতে চলিতে সে ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল। আর কিছুক্ষণ পরে আকাশে চন্দ্রোদয় হইবে। চন্দ্রালোকিত পথে সে বাসায় ফিরিবে।

কিন্তু চারি বৎসর পূর্ব্বের স্মৃতি আজ তাহার মনকে এমনভাবে বেদনা দিতেছে কেন? সুষমাকে সে সুশিক্ষিতা নহে বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, ইহা কি তাহারই প্রতিক্রিয়া? কিন্তু সত্যই এই তরুণীর জন্য সে কোনও দিন, যৌবনধর্ম্মের উন্মদ আগ্রহ অনুভব করিতে ত পারে নাই! যমুনার জন্য তাহার সমগ্র চিত্ত যেরূপ অধীর আগ্রহের উন্মাদনায় চঞ্চল হইয়া উঠে, কোনও দিন সুষমার জন্য তেমন আবেগ সে মুহূর্ত্তের জন্যও অনুভব করিয়াছে কি?

ষ্টেশনে তখন অনেক নর-নারী প্লাটফরমের উপর পাদ-চারণা করিতেছিল। একখানি কলিকাতাগামী গাড়ী তখনই আসিবে। ওভারব্রিজের উপর সে উঠিয়া গেল। সেখানে দাঁড়াইয়া সে দিগড়িয়া পাহাড়ের মসীকৃষ্ণ স্তূপের দিকে চাহিয়া রহিল। বিমল বাবু,

সুশীলচন্দ্র ও মেয়েদের লইয়া যখন একটু বেলা থাকিতে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন, তখন ললিত আপনার ঘরে একখানি উপন্যাস লইয়া পড়িবার ভাণ করিতেছিল। সুশীল যখন তাহাকে বেড়াইতে বাহির হইবার কথা বলিয়াছিল, সে জানাইয়াছিল, আরও খানিক পরে সে বাহির হইবে, এখন নহে।

সুষমার সঙ্গ এড়াইবার জন্যই কি তাহার মন, যমুনার সঙ্গ-লাভের গোপন প্রলোভনকেও পরাজিত করিয়াছিল? ওভার ব্রিজের উপর দাঁড়াইয়া এই প্রশ্নটি পুনঃ পুনঃ তাহার মনের মধ্যে সমুদিত হইতে লাগিল। কেন? এই তরুণীকে এড়াইবার জন্য এই যে তাহার সঙ্কোচ, ইহার হেতু কি? লজ্জা? দুর্ব্বলতা, না অন্য কিছু?

যাহাকে প্রকারান্তরে সে উপেক্ষাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতে কি সত্যই তাহার মন শঙ্কিত ও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছে না? এই তরুণী তাহাকে অনন্যমনে সেবা-শুশ্রূষা করিয়া কঠিন ব্যাধি হইতে মুক্ত করিয়াছিল। ভদ্র, সম্ভ্রান্ত ঘরের এই তরুণী যে কোনও শিক্ষিত ধনী সুপাত্রের স্পৃহণীয়; কিন্তু তথাপি সে তাহাকে বিবাহ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াও স্বীকার করিতে পারে নাই। এত কাল পরে সেই তরুণীর সহিত আকস্মিকভাবে তাহাকে একই গৃহে অবস্থান করিতে হইতেছে। সুশীলচন্দ্রের কাছে সে আজই জানিতে পারিয়াছে যে, বাড়ীতে পড়িয়া ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, সুষমা বৃন্দাবনের প্রেম মহাবিদ্যালয় হইতে দর্শন শাস্ত্রে উচ্চ উপাধি অর্জ্জন করিয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি,এ, উপাধির অপেক্ষা সে উপাধির মূল্য অল্প নহে। অশিক্ষিতা বলিয়া যাহাকে সে মনে মনে উপেক্ষা করিয়াছিল, বিদ্যায় সে ত তাহার অপেক্ষা হেয় নহে!

শুধু প্রত্যাখ্যানের লজ্জাই কি তাঁহাকে সুষমার সঙ্গ এড়াইয়া চলিবার পথে চালিত করিতেছে? কিন্তু যমুনা? তাহার সঙ্গলাভের অবকাশ মুহূর্ত্তের জন্য পাইলেও যে সে ধন্য হইয়া যায়! যমুনা হয় ত কথাপ্রসঙ্গে জানিতে পারিবে, সুষমার সহিত এক দিন তাহার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল। তখন—তখন—

"ও কে—ললিত বাবু না কি?"

সুশীলের কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া ললিত মুখ ফিরাইল।

পূর্ব্বগগনে তখন চন্দ্রোদয় হইয়াছিল। বিমলচন্দ্র বলিলেন, "এখানে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে, ললিত বাবু?"

"এমনি দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিলাম। আপনারা কোথায় গিয়েছিলেন?"

"চ্যাটার্জ্জির ফুলের বাগানে। ফুলের গাছ বায়না দিয়ে এলাম।"

ললিতচন্দ্র দেখিল, দুই জন তরুণী তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। তাহাদের কেহই একবারও তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিল না। শুধু পশ্চাদ্বর্ত্তিনী মণিমালা একবার ফিরিয়া চাহিয়া যমুনা ও সুষমার অনুবর্ত্তিনী হইল। তাহার মাসীমাতা সকলের পশ্চাতে আসিতেছিলেন।

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ললিত বলিল, "এখন বাসায় ফিরবেন ত?"

সুশীল বলিল, "হাঁ, ট্রেনেই যাব। আপনিও আসুন।"

চলিতে চলিতে ললিত বলিল, "আপনারা গাড়ীতে যান। চার মাইল পথ এই চাঁদের আলোতে আমি হেঁটে যেতে চাই।"

বিমল বলিলেন, "সুশীল, চল না, আমরাও হাঁটা পথে চলি।"

সুশীল বলিল, "আমার আপত্তি নেই। আচ্ছা ওদের মতটা জেনে নেওয়া যাক্।"

সুশীল একটু দ্রুতপদে চলিয়া অগ্রবর্ত্তিনী মহিলা-দিগের সন্নিহিত হইল। তার পর ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "যমুনা ও সুষমা ট্রেণেই যেতে চায়, দাদা। মাসীমাও তাই বল্‌ছেন।"

বিমল হাসিয়া বলিলেন, "তা হ'লে আর উপায় নেই। ললিতবাবু, চলুন না গাড়ীতে!"

ললিতচন্দ্র মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আপনারা পরিশ্রান্ত, গাড়ীতেই যান। আমি হেঁটেই যাব, মুক্ত আকাশ বড় ভাল লাগ্‌ছে।"

আর বাক্যব্যয় না করিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। ললিতচন্দ্র ষ্টেশন হইতে নামিয়া হাঁটা-পথ ধরিল।

আঠার

প্রতিদিনের ন্যায় ললিত একাই বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। সুশীল অবশ্য প্রত্যহই তাহাকে আহ্বান করিত; কিন্তু সে বুঝিয়াছিল যে, যমুনা ও সুষমা, তাহার সঙ্গ এড়াইবার জন্য কি না, তাহা বলা যায় না, তাহার সান্নিধ্যে আসিবার তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে না। সম্ভবতঃ দীর্ঘযুগের সংস্কার, এখনও অনাত্মীয় পুরুষের সহিত মেলামেশা করিবার পথে ব্যবধান রচনা করিয়া রাখিয়াছিল। এক দিন সে তাহাদের সঙ্গে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু যমুনা ও সুষমা দ্রুতপদে দল ছাড়াইয়া অন্যদিকে বেড়াইতে চলিয়া গিয়াছিল, মণিমালার জন্যও অপেক্ষা পর্য্যন্ত করে নাই। এ দৃশ্য অন্যে লক্ষ্য না করিলেও ললিতের দৃষ্টি এড়ায় নাই। তাহার পর হইতে ললিত কোন দিনই মেয়েদের সহিত বেড়াইতে যায় নাই। অবশ্য তাহার মনের মধ্যে এজন্য প্রবল সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই, এমন নহে। কিন্তু ললিত ধৈর্য্য ধারণ করিতে জানিত।

বিমল বাবু দুই দিন পরেই পাটনা চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার কোনও অতিরিক্ত প্রশ্নে ললিত আর আপনাকে বিপন্ন মনে করে নাই। সে বিবাহ করিয়াছে কি না, এ বিষয়ে কোনও প্রশ্ন তাহার কাছে উত্থাপনের অবকাশও বিমল বাবু গ্রহণ করেন নাই।

।

১ পুরণদহের দক্ষিণ সীমায় একটি প্রস্তর-স্তূপের উপর অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর ললিতচন্দ্র সেখান হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। আর দুই দিন পরই খ্রীষ্টমাসের উৎসব আরম্ভ হইবে, এ জন্য প্রচণ্ড শীতও পড়িয়াছিল। আজ দশ দিন সে কলিকাতা ছাড়িয়া আসিয়াছে কিন্তু যে আশা তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া এখানে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছে, সে আশা কি কোনও দিন সার্থক হইবে না?

যমুনাকে গৃহলক্ষ্মীর পদে বরণ করিয়া লইবার জন্য তাহার সমগ্র চিত্ত কত অধীর, তাহা অন্তর্যামীই জানেন। অথচ সে কথাটা প্রকাশ করিয়া বলিবার মত কোনও সুযোগ এ পর্য্যন্ত আসিল না। বলি বলি করিয়াও সুশীলচন্দ্রকে সে তাহার একাগ্র কামনার কথা জানাইতে পারে নাই। ভগিনীকে পুনরায় পরিণীতা হইতে দেখিলে সুশীল আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিবে, তাহার আভাস সে বহুবারই পাইয়াছে, কিন্তু পাত্র সম্বন্ধে কোনও ইঙ্গিতই সুশীলের নিকট হইতে সে পায় নাই।

পথ চলিতে চলিতে সে যতীন বাবুর বাড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহিরের ঘরে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে, বাতায়নের ফাঁক দিয়া তাহার রশ্মি নির্গত হইতেছে। একটি গানের সুর বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। স্বর সুস্পষ্ট এবং সুন্দর। পুরুষের কণ্ঠ?

যতীন বাবু কি গান করিতেছেন? সে মহারাজের নিকট শুনিয়াছিল, যতীন বাবু কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতে বিশেষ নিপুণ। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের গান সে কোনও দিন শুনে নাই।

ফটক খোলাই ছিল। সে বিস্তৃত উদ্যানপথ অতিক্রম করিয়া বাড়ীর কাছে আসিল। লীলায়িত কণ্ঠস্বরে কি মধুই ঝরিয়া পড়িতেছে!—

"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই
চিরদিন কেন পাই না!"

গমক, মীড় ও মূর্চ্ছনায় পরিপূর্ণ কণ্ঠ হইতে সুধাস্রোত নির্গত হইতেছিল। ললিত নিঃশব্দে বাহিরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেই গীতধ্বনি শুনিতে লাগিল। গায়ক যেন গানের সুরে সুরে ভাবরাজ্যের দ্বার মুক্ত করিয়া শ্রোতার চিত্তেও অনুরূপ স্পন্দনানুভূতি জাগাইয়া তুলিতেছিল।

"কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে—
তোমারে দেখিতে দেয় না!"

এ সঙ্গীত সে কতবার পাঠ করিয়াছে, অন্যের কণ্ঠে গীত হইতেও শুনিয়াছে। কিন্তু এমন অনুভূতি ত কোনও দিন তাহার অন্তরে আন্দোলন তুলে নাই! গায়ক যেন তাহারই অন্তরের ভাবকে রূপ ও মূর্ত্তি দিতেছে!

গানের সুরে মুগ্ধ হইয়া সে নিশ্চল মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মানসদৃষ্টির সম্মুখে যেন নূতন জগৎ ভাসিয়া উঠিতেছিল। গান ক্রমে শেষ হইয়া আসিতেছিল, ললিতও এক এক পা করিয়া ঘরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। ঘরের মধ্যে অন্য কেহ আছে, এমন অনুমান ললিতের হইল না। কারণ, সমগ্র কক্ষটি শুধু সঙ্গীত-শব্দ-তরঙ্গ ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার শব্দের সংস্রববর্জ্জিত। শীতের

প্রচণ্ডতায় জানালাগুলি বন্ধ ছিল, দরজার উপর মোটা পর্দ্দা দুলিতেছিল।

ধীরে ধীরে পর্দ্দা তুলিয়া সে যখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন গান থামিয়া গিয়াছিল। কিন্তু গৃহের বাতাস তখনও সঙ্গীতের ছন্দ ও সুরের ঝঙ্কার বহন করিয়া আনন্দে যেন শিহরিয়া উঠিতেছিল।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই সে উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "যতীনবাবু, এত চমৎকার আপনি গাইতে পারেন, সে অভিজ্ঞতা আমার ছিল না।"

বলিতে বলিতে চকিত দৃষ্টিপাতে সে দেখিতে পাইল, অন্তঃপুরে যাইবার দ্বার-সন্নিধানে তিনটি নারী-মূর্ত্তি, তরুণী উপবিষ্ট। তাহাদের আনন্দ-বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে সুরের রূপ যেন মূর্ত্তি ধরিয়া রহিয়াছে।

যতীন্দ্রনাথ ললিতকে আসন গ্রহণ করিতে বলিল। সুশীলের পার্শ্বে উপবেশন করিয়াই সে অপাঙ্গে দ্বার অভিমুখে চাহিয়া দেখিল।

তিনটি তরুণীর মধ্যে মণিমালার প্রস্থানপথবর্ত্তিনী মূর্ত্তি সে দেখিতে পাইল। অপর দুইজন ইতিমধ্যে কখন্ যে উঠিয়া গিয়াছে, তাহা সে লক্ষ্য করিতেও পায় নাই।

একটা অসহ্য বেদনা তাহার সমস্ত ধমনীর শোণিত-ধারাকে ব্যথিত মথিত করিয়া দিল। তাহার অন্তর যেন ব্যথার যন্ত্রণায় ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিল।

এতক্ষণ যাহা সহজসাধ্য ছিল, অনাত্মীয় পুরুষের সান্নিধ্য অবাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয় নাই, তাহার আগমন মাত্রেই সে ব্যবস্থা রূপান্তর গ্রহণ করিল! কিন্তু কেন?

চিন্তার সূত্র ধরিয়া অগ্রসর হইতে তাহার মন যেন তাহাকে নিষেধবাণী শুনাইতেছিল। যতীন বাবু ও সুশীলচন্দ্রের সন্মুখে তাহার শোচনীয় মানসিক ব্যথার কোন ইঙ্গিতই প্রকাশ পাইতে দেওয়া শোভন হইবে না। ব্যবহারিক জগৎ তাহার নিকট যাহা পাইবার প্রত্যাশা করে, সামাজিক মানুষ হিসাবে তাহা তাহাকে দিয়াই চলিতে হইবে। অন্তর ব্যথায় বিদীর্ণ হইতে চাহিলেও মুখে হাসি ফুটাইয়া অবস্থার উপযোগী আলোচনায় যোগ দেওয়া দরকার। সামাজিক মানুষকে অদৃষ্টের এই বিড়ম্বনা সহ্য করিতেই হইবে। উপায় নাই, উপায় নাই!

সুশীল বলিল, "আপনার কণ্ঠ এত মিষ্ট, গানের রাগ-রাগিণীর উপর আপনার এমন অধিকার আছে জানতাম না, যতীন বাবু! সার্থক আপনার সাধনা!"

আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া ললিত মুখে হাসি ফুটাইয়া বলিল, "রাস্তা দিয়ে চলেছিলুম। হঠাৎ গানের মধুর ঝঙ্কার আমাকে টেনে নিয়ে এল। বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলাম। সত্যি তখন এমন শক্তি ছিল না, ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ি।"

হাসিয়া যতীন্দ্রনাথ বলিল, "এক জন সন্ন্যাসীর কাছে কয়েকটা রাগিণী আদায় করবার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমি পেয়েছিলুম, ললিত বাবু। অবশ্য ছেলেবেলা থেকে গান আর ব্যায়াম এই দুটির উপর ঝোঁক ছিল। বাবা যদি হঠাৎ মারা না যেতেন, তা হ'লে গানের চর্চ্চাটা আশ মিটিয়ে করতে পারতুম।"

সুশীল বলিল, "সন্ন্যাসীর কাছে গান শিখেছিলেন বল্‌ছেন, কোথায় তাঁকে পেয়েছিলেন?'

"এইখানে—এই দেওঘরে। তখন আমার বয়স আঠার। অনেক কষ্টে তাঁকে ত্রিকূট পাহাড় হ'তে আমার বাড়ীতে ধ'রে এনেছিলুম। তাঁর কাছে শুনেছিলুম, ইন্দ্রিয়জয়ী না হ'তে পারলে সঙ্গীত-লক্ষ্মীর চরণ-দর্শন মেলে না। কঠোর সংযম না থাকলে দেবীর কৃপাও লাভ করা চলে না।"

সুশীল অবাক্-বিস্ময়ে যতীন্দ্রনাথের দীপ্ত মুখমণ্ডলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

ললিত এতক্ষণ মাথা নত করিয়া কি ভাবিতেছিল। সে বলিল, "আপনি সত্যই সঙ্গীত-লক্ষ্মীর দয়া লাভ করেছেন।"

কিন্তু সে অনুভব করিল, এত দিন যতীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোনও কিছু আলোচনা করিতে হইলে সে যেরূপ আন্তরিক অনুরাগ, উৎসাহ এবং আগ্রহ অনুভব করিত, আজ যেন তাহার একান্ত অভাব ঘটিয়াছে। অত্যন্ত মৌখিক, আন্তরিকতা-বর্জ্জিত লোকাচার রক্ষা করিয়াই সে আজ মন্তব্য প্রকাশ করিতেছে।

কথাটা মনে হইবামাত্র সে অন্তরে শিহরিয়া উঠিল।

এমন সময় সতু ঘরের দ্বারপথে দাঁড়াইয়া বলিল, "মাসীমারা এখন বাড়ী যাবেন বল্‌ছেন।"

সুশীল ঘড়ীর দিকে চাহিয়া বলিল, "তা হ'লে আজ উঠি, যতীন বাবু। ভাল কথা, কা'ল আমাদের ওখানে পায়ের ধূলো দেবেন? আমার বোন যমুনা নিজে রেঁধে আপনাকে খাওয়াতে চায়।"

যতীন্দ্র বলিল, "ওভাবে ব'লে আমাকে অপরাধী করবেন না। কিন্তু আমি নিরামিষাশী।"

"যমুনা তা জানে। সে নিজেও—"

বাধা দিয়া যতীন্দ্রনাথ বলিল, ""জানি। আচ্ছা, আমি নিশ্চয় যাব।"

"খোকাকেও নিয়ে যাবেন।"

"আচ্ছা" বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে যতীন্দ্রনাথও উঠিয়া দাঁড়াইল।

উনিশ

নির্জ্জন দ্বিপ্রহর রজনীতে ললিত তখনও শয্যালীন হইতে পারে নাই।

টেবলের উপর আলো জ্বলিতেছিল। পড়িবার চেষ্টা করিয়াও সে কোনও মতে গ্রন্থের পাতায় মন নিবিষ্ট করিতে পারে নাই। খোলা বই তেমনই ভাবে টেবলের উপর অযত্নে পড়িয়া রহিয়াছে।

ঘরের মধ্যে পাদচারণা করিতে করিতে ললিত থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার ললাটের শিরাগুলি ঈষৎ স্ফীত হইয়া উঠিল। একটা অসহনীয় যন্ত্রণা চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা তাহার ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ পাইতেছিল বৈ কি।

মানুষ শিষ্টাচারে আপনাকে যতই অভ্যস্ত করিয়া তুলুক; শিক্ষা ও জ্ঞানের আলোক তাহার মনকে যতই উদ্ভাসিত করিয়া রাখুক; উদারতা, মহত্ত্ব এবং উচ্চ জীবন-যাপন-প্রণালীর সহিত যতই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হউক; মনুষ্য-জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জন্মগত প্রকৃতির দুর্ব্বলতাকেও মানুষ অন্যত্র রাখিয়া আসিতে পারে কি?

কঠোরতম সংযম—প্রকৃতির বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া, দীর্ঘ তপস্যায় যাহা অর্জ্জন করিতে হয়, সাধারণ ভোগবিলাসের জীবনযাত্রায় তাহা সম্ভবপর নহে। ললিতচন্দ্রও মনুষ্য-প্রকৃতির

সহজাত প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। তজ্জন্য কি সে অপরাধী হইবে ?

যমুনার প্রতি তাহার অন্তরের যে প্রবল আগ্রহ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, প্রথম হইতেই তাহাতে কোনও বাধা উপস্থিত হয় নাই ; বরং সুশীলের কথার আভাসে তাহার মনে আশারই সঞ্চার হইয়াছিল—তাহার আগ্রহ অনুকূল অবস্থার অবলম্বন পাইয়া আরও উদগ্র হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু দেওঘরে আসিবার পর হইতেই সে ঘটনাপরম্পরায় বুঝিতে পারিয়াছে, যমুনা সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাকে এড়াইয়া চলিয়াছে। অথচ যতীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সে আদৌ উদাসীন নহে। অপরিচিত এই যুবকের কাছে আসিতে তাহার যে পরম আগ্রহ আছে, তাহার পরিচয় এই কয় দিনের মধ্যে সে কি বহুবার পায় নাই ?

সে বহু গ্রন্থে পড়িয়াছে, নারী বলিষ্ঠপ্রকৃতি পুরুষের অনুরাগিণী হইয়া থাকে। যতীন্দ্রনাথ অসাধারণ শক্তিশালী, তাহার দৈহিক সৌন্দর্য্যও সমধিক, তাহা ছাড়া সে উচ্চশিক্ষিত, পণ্ডিত, সাহিত্যিক এবং সুকণ্ঠ সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদ। যমুনা তাহাকে সে দিন স্বয়ং রাঁধিয়া সযত্নে নিজের হাতে পরিবেষণ করিয়া খাওয়াইয়াছে। তাহার কাছে বসিয়া গান শুনিতে—আলাপ আলোচনা করিতে যমুনার তীব্র আগ্রহ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার কোনও অবকাশ আছে কি ?

এই সকল দৃষ্টান্ত কি প্রমাণ করে ? যমুনা কি যতীন্দ্রনাথের অনুরাগিণী নহে ?

চিন্তামাত্রেই ললিত অধীরভাবে পদচারণা আরম্ভ করিল।

যতীন্দ্রনাথ কি তাঁর প্রতিযোগী? বিপত্নীক যুবক তাহার পুত্রের জন্য কি মা'র সন্ধান করিতেছে?

অসহ্য! অসহ্য!—

যাহার একবার বিবাহ হইয়াছিল, পুত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, পুনরায় বিবাহ করিবার তাহার কি অধিকার আছে? দ্বিতীয়দার পরিগ্রহ কি বর্ত্তমান যুগের সভ্য মানবের পক্ষে সঙ্গত ব্যবহার? যমুনার মত সুন্দরী তরুণী কেমন করিয়া দোজবরে আত্মসমর্পণ করিতেই বা পারে? সুশীলচন্দ্রই বা ইহাতে কি প্রকারে অনুমোদন করিবে?

অকস্মাৎ ললিত স্তব্ধভাবে দাঁড়াইল। তাহার অন্তরতম প্রদেশ হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল, চমৎকার যুক্তি ত! যমুনা যদি পরলোকগত স্বামীকে বিস্মৃত হইয়া দ্বিতীয়পতি গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকে, তবে যতীন্দ্রনাথের পক্ষেই বা তাহা অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত হইবে কেন?

ঠিক কথা। যুক্তির দিক দিয়া ইহাতে প্রতিবাদ করিবারই বা কি আছে?

নারী যদি দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারে, পুরুষই বা তাহা পারিবে না কেন?

দুই বাহু টেবলের উপর রক্ষা করিয়া ললিত তাহার বেষ্টনের মধ্যে মস্তক রক্ষা করিল। গভীর নৈরাশ্যে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল।

বহুক্ষণ এইভাবে অবস্থান করিবার পর সে সহসা সোজা হইয়া বসিল।

না—এমন ভাবে থাকিলে চলিবে না। যমুনাকে সে অন্যের অঙ্কলক্ষ্মী হইতে কখনই অবকাশ দিবে না। [illegible] শক্তি প্রয়োগ করিয়া সে ইহাতে বাধা দিবে।

আদিম প্রবৃত্তি বহু সহস্র বৎসরের প্রভাবেও সনাতন রূপেই মানব-মনে আত্মপ্রকাশ করে। কি বিরাট ইহার প্রভাব! কি অপরিবর্ত্তনীয় ইহার রূপ!

পৌষের প্রচণ্ড শীত অগ্রাহ্য করিয়া ললিত পশ্চিমদিকের একটা বাতায়ন খুলিয়া দিল। শরীরের উত্তাপ রুদ্ধগৃহের মধ্যে যেন তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল।

বাতায়নপথে তুষারশীতল নৈশবায়ু তাহার ললাটকে স্নিগ্ধ প্রলেপে শীতল করিয়া দিল। অল্পক্ষণ পরেই সে শীত বোধ করিতে লাগিল। জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া সে শয্যার উপর আসিয়া বসিল।

ধীরে ধীরে তাহার বিচারবুদ্ধি ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

দীপ্ত আলোকাধারের দিকে চাহিয়া চাহিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস তাহার নাসারন্ধ্র পথে বাহির হইয়া গেল।

যমুনা যদি যতীন্দ্রনাথের পত্নী হইতে চাহে, যতীন্দ্র যদি যমুনাকে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হয়, সুশীল যদি এ বিবাহে অনুমোদন করে, তবে কি করিয়া সে তাহাতে বাধা দিবে?

দুষ্টবুদ্ধি মানুষ মিথ্যার আশ্রয় লইয়া, মানুষের মনে বিদ্বেষ ও ঘৃণার নরককুণ্ড রচনার জন্য যে প্রণালীতে চেষ্টা করে, ভদ্রসন্তান হইয়া তাহাকে কি সেই পথ অবলম্বন করিতে হইবে?

বাঃ! চমৎকার শিক্ষা এতদিনে সে আয়ত্ত করিয়াছে ত!

শয্যার উপর ললিত দেহ এলাইয়া দিল।

কিন্তু বিনিদ্র রজনীতে সে যে আশঙ্কা করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা যদি তাহার শুধু অনুমানমাত্রই হয়? বৃথা সন্দেহে সে যে অধীর হইয়া উঠে নাই, তাহাই বা কে বলিল?

অতি মৃদু আশার আলোক আবার তাহার অন্তরকে যেন আলোকিত করিয়া তুলিল।

হাঁ, তাহাই যেন সত্য হয়। সে যদি যমুনাকে না-ও পায়, যমুনা যেন যতীন্দ্রকে বিবাহ না করে—যতীন্দ্রও যেন যমুনাকে লাভ করিবার চেষ্টা না করে।

মানুষ যাহাকে কামনা করে, সে যদি তাহার পক্ষে দুর্লভই হয়, তবে যাহাতে সে আর কাহারও না হয়, ইহাই কি সাধারণ মানবাত্মার মনোগত অভিপ্রায়?

পার্শ্বের বৈঠকখানা-ঘরে ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া দুইবার শব্দ হইল।

ললিত সচকিত হইয়া উঠিল। না, আর এমন ভাবে জাগিয়া থাকা সঙ্গত নহে। সকালবেলা তাহার আননে সমস্ত রাত্রি-জাগরণের ক্লান্তি দেখিয়া যদি সুশীল কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে তাহাকে মিথ্যার আশ্রয় লইয়া কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। না, তাহা সে পারিবে না। মিথ্যাভাষণে সে কোনও দিন অভ্যস্ত নহে। সে তাহা পারিবে না।

কুঁজা হইতে এক গ্লাস জল ঢালিয়া ললিত পান করিল। তার পর আলো নিভাইয়া দিয়া সে শয্যায় শয়ন করিল। আর কোনও চিন্তার প্রশ্রয় সে দিবে না, সঙ্কল্প করিয়া সে নয়ন নিমীলিত করিল।

কুড়ি

"বা! আজকের আকাশটা কি চমৎকার, ভাই!"

নন্দন পাহাড়ের উপর তখন রৌদ্র বড় মিঠা লাগিতেছিল। নির্ম্মল আকাশে কোথাও মেঘের চিহ্নমাত্র নাই, শুধু গাঢ় নীলিমা-বিস্তার।

সুষমা বলিল, "কিন্তু ভাই যমুনাধারা, এটাকে পাহাড় বলা, পাহাড়ের অপমান নয় কি?"

যমুনা হাসিয়া বলিল, "ঠিক বলেছ, ভাই।"

আজ সকালে উঠিয়াই দুইটি তরুণী বৃদ্ধ হিন্দপাল সিংকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। মণিমালা স্বামীর চা-র পর্ব্ব শেষ হয় নাই বলিয়া তাহাদের সঙ্গিনী হইতে পারে নাই।

কিছু দূরে উপবিষ্ট বৃদ্ধ দারবানের সুপক্ক গুম্ফ এবং প্রকাণ্ড পাগড়ী-শোভিত মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সুষমা বলিল, "তোমাদের এই দরোয়ানজীর সম্ভ্রমবোধ আছে। পাছে আমাদের আলোচনা কাণে যায়, তাই অনেকটা দূরে গিয়েই বসেছে।"

যমুনা বলিল, "বাবার বড় প্রিয় পাত্র ছিল। দাদাকে আমাকে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছে। আমরা ওকে হিন্দপাল জ্যেঠা বলেই ডাকি। বাবা হিন্দপাল জ্যেঠার চেয়ে দশ বছরের ছোট ছিলেন, মার কাছে শুনেছিলুম।"

হিন্দপাল আপন মনে এক দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। বাতাস তাহার পাগড়ীর খাঁটি প্রান্তটুকু লইয়া খেলা করিতেছিল।

সুষমা ডাকিল, "যমুনাধারা!"

যমুনাকে সে ধারা সংযুক্ত করিয়া সম্বোধন করিত।

তরুণী সুষমার দিকে ফিরিয়া চাহিল। তাহার কণ্ঠস্বরে যেন একটা পরিবর্ত্তনের সুর যমুনা অনুভব করিল।

সুষমা বলিল, "মানুষের জীবনটা যদি ঐ নীল আকাশের মত অনাবিল হ'ত!"

যমুনা হাসিয়া বলিল, "তুমি এত লেখ-পড়া শিখেছ, দর্শনশাস্ত্র পড়েছ; শুনলুম, গীতা উপনিষদ, দুবছর ধ'রে সন্ন্যাসীর কাছে ব্যাখ্যা ক'রে পড়েছ। তবে এরকম অসম্ভব কল্পনা মনে এল কেন?"

সুষমা বলিল, "সে কথা হচ্ছে না, তা হয় না "আমি জানি· কিন্তু যদি হ'ত, তাই বলছিলাম!"

সুষমা একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

যমুনা বলিল, "লেখাপড়া ত শেখা হ'ল, এখন কি করবে বল ত, ভাই?

সুষমা দূরে দিগড়িয়া পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল, "লেখাপড়া শেখবার কি শেষ আছে, যমুনাধারা!"

যমুনা সুষমার একখানি হাত নিজের করপুটে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "মাসীমা বল্‌ছিলেন, এবার তোমাকে সুপাত্রে বিয়ে দিতে পারলে তিনি নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন, ভাই।"

সুষমা সে প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়া নীরবে সম্মুখের দিকে চাহিয়াই রহিল।

নন্দন পাহাড়ে সে দিন সকালে অন্য কোনও নরনারীর সমাগম হয় নাই। কাজেই দুই সখীর নিভৃত আলোচনায় কোনও বাধা পড়ে নাই। সুষমাকে নীরব দেখিয়া যমুনা তাহার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। সুষমা যমুনার ন্যায় সুন্দরী নহে; কিন্তু তাহার দীর্ঘায়ত নয়নে এমন একটা মাধুর্য্য-শ্রী ছিল, মুখমণ্ডলে এমন একটা কমনীয় দীপ্তি ছিল, যাহার প্রভাব অতিক্রম করা সহজ-সাধ্য নহে।

সুষমার অবিন্যস্ত কেশরাজি বাতাসে লুণ্ঠিত হইতেছিল। তাহার নয়নের এমন গভীর দৃষ্টি যমুনা পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। বিবাহের প্রসঙ্গে তরুণী বাঙ্গালী নারীর মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ নহে; কিন্তু এই আত্মস্থা তরুণীর গাম্ভীর্য্য সহসা যমুনার চিত্তে একটা প্রশ্ন জাগাইয়া তুলিল। অবশ্য সুষমা স্বভাবতঃই বহুভাষিণী বা প্রগল্‌ভা নহে; কিন্তু সমবয়স্কা সখীর সহিত আলোচনায় তাহার রসনা অর্গল-মুক্ত হইয়া থাকিত।

যমুনা বলিল, "ভাই, বিয়ের কথায় তুমি এত গম্ভীর হয়ে উঠলে কেন?"

সুষমা দিগন্তে নির্ব্বাসিত দৃষ্টিকে ফিরাইয়া আনিয়া যমুনার প্রতি ন্যস্ত করিল। তার পর ধীর অথচ মধুর কণ্ঠে বলিল, "মার দুশ্চিন্তা দূর করতে পারলে সত্যি আমি খুসী হতুম। কিন্তু মন আমার বর্ত্তমান বেচাকেনার যুগে বিয়ে করতে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

যমুনা কয়েক মুহূর্ত নীরবে চিন্তা করিয়া বলিল, "তুমি ঠিক বলেছ, ভাই। দেশের মানুষ আগের চেয়ে শিক্ষিত হয়ে উঠেছে ব'লে গর্ব্ব প্রকাশ করে; নারীজাতিকে বিশেষ সম্মান ক'রে থাকে ব'লে বড় গলায় চীৎকারও ক'রে থাকে, কিন্তু সত্যি এ যুগে নারীকে তারা যত হেয় দৃষ্টিতে দেখে, আগের যুগে এ দেশে তা ছিল না। মেয়ে যেন মাছ বা তরকারী। যাচাই ক'রে, দর ক'রে তবে বাঙ্গালার মেয়ের পাণিগ্রহণ ব্যবসাটা চলছে।"

কথা বলিতে বলিতে যমুনা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার আরক্ত ওষ্ঠাধর-যুগল কম্পিত হইতেছিল, কালো চোখের দৃষ্টি প্রখর ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, আরক্ত গণ্ডদেশ তাহার মানসিক উত্তেজনার পরিচয় দিতেছিল।

সুষমা বলিল, "ঠিক তাই, ভাই যমুনাধারা। নারী যেখানে এত অনাদৃতা, সেখানে বার বার পরীক্ষা দিয়ে বিয়ে করার ইচ্ছে আমার নেই। পুরুষের বিচারে—পাত্র-পক্ষের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নারীজাতির, পাত্রীপক্ষের বিবাহ নির্ভর করছে। অথচ নারীর ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন মূল্যই নেই! না ভাই, এমন হেয় অবস্থায় নিজেকে নিক্ষেপ করবার কোন অধিকার ভগবান আমাকে দেননি।"

পাহাড়ের পশ্চিমদিক দিয়া ভ্রমণার্থী কেহ পাহাড়ের উপর তখন উঠিয়াছিল। তরুণী-যুগল এমন নিবিষ্টচিত্তে আলোচনায় মগ্ন ছিল যে, অন্যদিকে তাহাদের কোন লক্ষ্যই ছিল না।

একটা আল্‌গা পাথর ভ্রমণকারীর পদস্পর্শে স্থানচ্যুত হইয়া সশব্দে নীচে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। লোকটিও টাল সামলাইতে

না পারিয়া পতনোন্মুখ হইয়াছিল। বৃদ্ধ হিন্দপাল সিং উহা দেখিতে পাইয়া একটা শব্দ করিয়া সেই দিকে ছুটিয়া যাইতেই তরুণীদিগের দৃষ্টি সেই দিকে নিক্ষিপ্ত হইল।

না, লোকটি সামলাইয়া লইয়াছে। কিন্তু মানুষটির প্রতি চাহিতেই উভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। সে ব্যক্তি ললিত ডাক্তার। সকালের দিকে সে-ও নন্দন পাহাড়ের দিকে বেড়াইতে আসিয়াছিল। তরুণীরা এখানে আসিয়াছে জানিলে সে কখনই এদিকে আসিত না। কিন্তু সে ত অন্তর্য্যামী নহে।

টাল সামলাইয়া লইয়া ললিত দেখিল, যমুনা ও সুষমা অপর দিক দিয়া পাহাড় হইতে নামিয়া যাইতেছে। সে আহত হইয়াছে কি না, তাহা জানিবার প্রয়োজন পর্য্যন্তও ইহাদের মনে রেখাপাত করে নাই!

হিন্দপাল সিং জিজ্ঞাসা করিল, ডাক্তারবাবুর কোথাও আঘাত লাগে নাই ত! না, শরীরের কোথাও তাহার আঘাত লাগে নাই। তবে এইরূপ উপেক্ষার আঘাত মনকে আহত করে নাই, একথা সে জোর করিয়া বলিতে পারে না।

যমুনা ও সুষমাকে নামিয়া যাইতে দেখিয়া হিন্দপাল সিং ডাক্তারবাবুকে সেলাম করিয়া দ্রুতপদে সেই দিকে চলিয়া গেল।

ললিত স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল। সে পাহাড়ের উপর হইতে দেখিল, পাহাড় হইতে নামিয়া তরুণী-যুগল "উইলিয়মস্ টাউন" অভিমুখে মৃদুচরণে চলিয়াছে। মুহূর্ত্তের জন্যও কেহ পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল না।

যমুনার সহিত এ পর্যন্ত ললিতের কোনও বাক্যালাপ ঘটে নাই; কিন্তু সুষমা? সে ত বহুদিন তাহার সম্মুখে আসিয়াছে; বহু সপ্তাহ ধরিয়া কঠিন রোগে তাহার শুশ্রূষা করিয়াছে। সে-ও কি একটা মুখের কথা ললিতকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিত না?

ললিত পাহাড়ের উপর ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল।

একুশ

"বাঃ! বেশ যায়গাটি ত!"
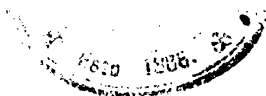
সুষমা মুগ্ধ-দৃষ্টিতে ত্রিকূটনাথের ক্ষুদ্র ঝরণার দিকে চাহিয়া রহিল। এই ঝরণার কোনও বৈশিষ্ট্য নাই। জলধারাও ক্ষীণ; কিন্তু একটি শিবলিঙ্গের উপর ঝরণাধারা নিঃসৃত হইতেছে,—ইহাতেই সে মুগ্ধ হইয়া গেল।

ত্রিকূটনাথের অদূরে একটা প্রকাণ্ড সমতল প্রস্তর-চত্বর। সকলে সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইল। দাস-দাসী, দ্বারবান্ আহার্য্য দ্রব্যাদির মোট, বস্ত্রাদি সেইখানে বিন্যস্ত করিল।

পূর্ব্বেই প্রস্তাব ছিল, ত্রিকূটপাহাড়ে আসিয়া একদিন চড়িভাতি করিতে হইবে। সুশীল, মণিমালা ও যমুনার অনুরোধে যতীন্দ্র তাহার পুত্র ও পিসীমাতাকে এই নির্ম্মল আনন্দসম্মেলনে যোগ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। কথা ছিল, পিসীমা ও মণিমালার মাসীমা সেদিন সকলের জন্য খিচুড়ী রাঁধিবেন, পাহাড়ের উপর উঠিতে পারিবেন না। পিসীমা ও মাসীমা উপযাচিকা হইয়া এই ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অতি প্রত্যুষেই দুইটি পরিবার দেওঘর হইতে এখানে রওনা হইয়াছিলেন। ছেলে-মেয়ের তত্ত্বাবধানের জন্য দাস-দাসী, দ্বারবান্ সঙ্গে আসিয়াছিল। রৌদ্র প্রবল হইবার বহু পূর্ব্বেই বার মাইল

পথ অতিক্রম করিয়া যাত্রিদল ত্রিকূটনাথে পৌঁছিয়াছিল। গাড়ী ছাড়িয়া মাঠ পার হইতে অল্প সময় লাগে নাই। সকলেরই ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল।

ত্রিকূটনাথের ঝরণার জল এক কুণ্ডাকৃতি স্থানে সঞ্চিত হইয়া কূল ছাপাইয়া আবার নিম্নে বহিয়া যাইতেছিল। এই কুণ্ডের স্নিগ্ধ জলে একে একে সকলে স্নান সারিয়া লইয়া ত্রিকূটনাথের পূজা দিল। পূজারী নিত্য এই গ্রাম হইতে আসিত। যাত্রিদল দেখিয়া সে লাভের প্রত্যাশায় হাজির ছিল।

পূজা শেষ হইলে চত্বরে সকলে ফিরিয়া গেল। মাসীমা সকলের জন্য গৃহপ্রস্তুত মিষ্টান্নাদি ভাগ করিয়া দিলেন। নানাবিধ ফলমূলও সঙ্গে ছিল। মণিমালা, যমুনা ও সুষমা একটু অন্তরালে গিয়া জলযোগ শেষ করিল। যতীন্দ্রনাথ, সুশীল ও ললিত পরিতোষ সহকারে আহার শেষ করিয়া পাহাড়ে উঠিবার কল্পনা করিতেছিল। সঙ্গে এক জন গ্রামবাসী আসিয়াছিল ; সে পাহাড়ের বিভিন্ন অংশের সহিত সুপরিচিত। যাত্রিগণকে পাহাড় দেখাইয়া সে যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

সে জানাইল, মাঝের পাহাড়টি সর্ব্বোচ্চ। শীর্ষদেশে প্রকাণ্ড ছাদের মত সমতল স্থান আছে। সেখানে মাঝে মাঝে নানাপ্রকার বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া জনপ্রবাদ।

জলযোগের পর স্থির হইল, সতু ও খুকী শীলাকে ঝি, চাকর ও দ্বারবানের কাছে রাখিয়া সকলে পাহাড়ে উঠিবে। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের পিসীমা তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন যে, আর সকলে

পাহাড়ে উঠুক, তিনি রন্ধনব্যাপার লইয়া থাকিবেন। পাহাড়ে উঠিবার সখ এবং শক্তি তাঁহার নাই। মণিমালার মাসীও থাকিতে চাহিলেন ; কিন্তু যতীনের পিসী জোর করিয়া তাঁহাকে পাহাড়ে উঠিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অগত্যা প্রৌঢ়া উমাশশী সম্মত হইলেন।

'গাইড' বা পথিপ্রদর্শক হাজির ছিল। উৎসাহভরে সুষমা, মণিমালা, যমুনা পাহাড়ে উঠিবার উপযোগী ভাবে বেশবিন্যাস করিয়া লইল। মাসীমাও প্রস্তুত হইলেন। যতীন্দ্র সুশীল এবং ললিত ডাক্তার এক একখানি মোটা লাঠি পাহাড়ের বাঁশ কাটিয়া প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিল।

পথিপ্রদর্শকের নির্দ্দেশমত উৎসাহভরে সকলেই চলিতে লাগিল ; —সর্ব্বাগ্রে ললিত, তাহার পশ্চাতে সুশীল ও মণিমালা। মাসীমার পরেই সুষমা ও যমুনা চলিতেছিল। সর্ব্বপশ্চাতে যতীন্দ্রনাথ।

বনভূমির ভিতর দিয়া পাহাড়ে উঠিবার পথ—প্রস্তর-খণ্ডবন্ধুর পথে চলিতে বেশ উৎসাহের সঞ্চার হইতে লাগিল। মণিমালা ও মাসীমাতা যেমন দ্রুত চলিতেছিলেন, আলাপরতা যমুনা ও সুষমা ততটা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছিল না ; তাহারা আশ-পাশের দৃশ্যগুলি উপভোগ করিতে করিতে চলিতেছিল। কোনও বৃক্ষডালে একটা নূতন পাখী দেখিয়া সুষমা ক্ষণিক দাঁড়াইয়া পড়িতেছিল। যমুনা ও সখীর সহিত তাল রাখিয়া চলিতেছিল। একটু দূরে যতীন্দ্রনাথ সর্ব্বপশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিয়া চলিতেছিল।

আগের দল দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। খানিক পরে উপর হইতে শব্দ আসিল, "যতীন বাবু!"

যতীন্দ্রনাথ তাহার উত্তরে গম্ভীর-কণ্ঠে জানাইল, তাহারা আসিতেছে। পাহাড়ে উঠিবার সময় এইভাবে পরস্পর পরস্পরের সংবাদ লইয়া চলিতে লাগিল।

পাহাড়ের কিছু দূর উপরে উঠিয়াই সুষমা দেখিল, দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া একটা পথ, বাম পার্শ্ব দিয়া আর একটা পথ চলিয়াছে। সম্ভবতঃ দক্ষিণের পথ ধরিয়াই অগ্রগামী দল চলিয়াছে। তাহাদের কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে উপর হইতে ভাসিয়া আসিতেছিল।

যমুনা দক্ষিণের পথ ধরিয়াই চলিল। সে পূর্ব্বে মসৌরী ও দেরাদুন পাহাড়ে দাদার সঙ্গে বেড়াইতে গিয়াছিল। পাহাড়ে চড়ার আনন্দ অভিজ্ঞতা তাহার যথেষ্টই ছিল।

কিছু দূর চলিতে চলিতে দক্ষিণের পথটি উপরে খানিক দূর গিয়া আবার বিপরীত দিকে রেখাপাত করিয়া নামিয়া গিয়াছে। সুষমা বুঝিল, তাহারা পথ ভুল করিয়াছে। এ পথে পাহাড়ের উপরদিকে উঠা যায় না। যমুনা বলিল, "এ দিক দিয়ে যাওয়া যাবে না।"

উভয়ে ফিরিয়া দাঁড়াইতেই যতীন্দ্রনাথ বলিল, "চলুন, বাঁয়ের পথ দিয়ে উঠতে হবে।"

এবার যতীন্দ্র পথ দেখাইয়া চলিল। বহু দূর হইতে চীৎকার আসিল। যতীন্দ্রনাথও তাহার উত্তর দিল।

চলিতে চলিতে সহসা যতীন্দ্র থমকিয়া দাঁড়াইল। বামদিকের পথটি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এখন কোন্ দিকে যাওয়া যায়? দীর্ঘকাল দেওঘরে বাস করিলেও এই পাহাড়টিতে সে কোনও দিন উঠে নাই। ত্রিকূটনাথে অনেকবার সে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু

যমুনাধারা

মাঝের পাহাড়টির উপরে উঠিবার প্রয়োজন সে কোনও দিন অনুভব করে নাই—কৌতূহলও ছিল না।

যাহা হউক, বুদ্ধি করিয়া উহারই মধ্যে একটা পথ ধরিয়া সে চলিতে লাগিল। কিছু দূর গিয়া সে বুঝিতে পারিল, যে পথটি ধরিয়া সে চলিতেছে, তাহা ক্রমেই ঢালুর দিকেই চলিয়াছে। কারণ, সম্মুখে একটা বিশ পঁচিশ হাত উচ্চ প্রস্তরখণ্ড জঙ্গলে আচ্ছন্ন হইয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে যমুনা ও সুষমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, আবার তাহারা ভুল পথে চলিয়াছে। পাহাড়ে একবার পথ হারাইলে আর ঠিক পথ আবিষ্কার করা চলে না। জীবনের পথে চলিতে গিয়া মানুষও বুঝি এমনই ভাবে পথ হারাইয়া বিভ্রান্ত হয়।

হাতের ঘড়ী দেখিয়া যতীন্দ্রনাথ বুঝিল, প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া তাহারা এমনই ভাবে ভুল পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যতীন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া সুশীল ও ললিতের নাম ধরিয়া ডাকিল। পাহাড়ে পাহাড়ে তাহার প্রতিধ্বনি উঠিল, কিন্তু কোনও উত্তর আসিল না।

তখন যমুনা বলিল, "চলুন, আমরা ফিরে যাই। আর উপরে উঠে কাজ নেই।"

যমুনার মুখে শ্রান্তির চিহ্ন, সুষমার ললাটেও শীতের দিনে স্বেদবিন্দু দেখিয়া যতীন্দ্রনাথ বুঝিল, এমন ভাবে পাহাড়ে উঠিবার ব্যর্থ পরিশ্রম তরুণীদিগের উৎসাহ-বহ্নিকে নির্ব্বাপিত করিয়া দিয়াছে সে বলিল, "সেই ভাল।"

তাহারা তখন নামিতে আরম্ভ করিল।

কোন্ পথ ধরিয়া নামিতেছে, সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহারা কিরূপে তাড়াতাড়ি জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড় হইতে বাহিরে আসিতে পারে, তাহারই দিকে লক্ষ্য রাখিল। চলা পথের রেখা ধরিয়া নামিতে নামিতে একটা স্থানে আসিয়া তাহারা অনুমান করিল, প্রায় সমতলভূমির কাছেই তাহারা আসিয়া পড়িয়াছে। বামদিগের চলাপথ ধরিয়াই তাহারা নামিতেছিল। অকস্মাৎ তাহারা দেখিল, তাহারা একটি প্রায় সমতল উপত্যকা-ভূমিতে নামিয়া আসিয়াছে; তাহার চারিদিকেই উচ্চ পাহাড়ের প্রাচীর। দক্ষিণদিক্ ধরিয়া তাহারা সেই উপত্যকাভূমি পার হইতে লাগিল। বৃক্ষলতাবহুল দক্ষিণের পাহাড়ের পার্শ্ব দিয়া নির্গমনের পথ রহিয়াছে।

যতীন্দ্রনাথ বুঝিল, তাহারা যে পথে এখানে নামিয়া আসিয়াছে, পাহাড় হইতে নামিবার সোজাপথ তাহা নহে। কিন্তু এখন আর ফিরিয়া যাওয়া সঙ্গত নহে। এই পথ ধরিয়া নিশ্চয়ই বাহিরে যাওয়া যায়। কাঠুরিয়ারা কাঠ সংগ্রহের জন্য এ দিকেও আসিয়া থাকে, যতীন্দ্রনাথ তাহা অনুমান করিল।

কিন্তু একটা উৎকট গন্ধ যেন বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। দক্ষ শিকারী যতীন্দ্রনাথ সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া সন্নিহিত গুহার অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিল। তার পর অতি সতর্ক, অতি মৃদুস্বরে যমুনা ও সুষমাকে বলিল, "আমার বিনীত অনুরোধ, এখন কোন কথা আপনারা বলবেন না। আমার পেছনে পেছনে কোন শব্দ না ক'রে আসুন।"

সুষমা ও যমুনা বুঝিল, যতীন্দ্রনাথের মনে কোনও কারণে বিশেষ উদ্বেগ জন্মিয়াছে। তাহারা দেখিল, যতীন্দ্রনাথ তাহার মোটা বাঁশের লাঠিটা দক্ষিণ হস্তে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়াছে। উভয়কে তাহার বামদিকে যাইতে ইঙ্গিত করিয়া যতীন্দ্রনাথ অগ্রসর হইল।

দক্ষিণদিকে আরও একটা গুহা রহিয়াছে। তাহাকে অতিক্রম করিয়া আরও একটু দক্ষিণদিকে একটা নির্গমনের পথ দেখা যাইতেছিল। যতীন্দ্রনাথ সেই দিকে যমুনা ও সুষমাকে দ্রুত অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিল।

অজ্ঞাত আশঙ্কায় উভয় তরুণী অনেকটা বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের নীরব আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য তাহারা কম্পিত-চরণে নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইল। যতীন্দ্রনাথ তাহাদের পাশে পাশে চলিতে চলিতে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

তরুণীযুগলের স্খলিত, কম্পিত চরণক্ষেপ একটা অজ্ঞাত আশঙ্কার চিহ্ন প্রকাশ করিতেছিল। যতীন্দ্রনাথ রুদ্ধনিশ্বাসে পুনঃ পুনঃ পশ্চাদ্ভাগ ও আশে-পাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। তাহার ললাটের শিরা স্ফীত এবং ওষ্ঠযুগল দৃঢ়বদ্ধ। সমস্ত অঙ্গ যেন কোনও অভাবনীয় ব্যাপারের প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।

সুষমা ও যমুনা কোনও দিকে না চাহিয়া সোজা সম্মুখের দিকে চলিতে লাগিল। সমগ্র পার্ব্বত্যভূমি স্থির, অচঞ্চল—মাঝে মাঝে মনুষ্যপদতাড়িত উপলখণ্ডের শব্দ হইতেছিল মাত্র।

বাতাসে যে উৎকট গন্ধ অনুভূত হইতেছিল, তাহা ক্রমে অন্তর্হিত হইল। উৎকর্ণ যতীন্দ্রনাথ সঙ্কীর্ণ পথে চলিতে চলিতে তখনও পশ্চাতে সতর্ক দৃষ্টিপাত করিতেছিল।

সহসা বনভূমির শেষে শূন্য প্রান্তর ও তাহার অপর প্রান্তে রাজপথের রেখা তাহাদের দৃষ্টিপথে পড়িল।

"আর ভয় নেই, চলুন!"

যতীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরে যুগল তরুণীই যেন চমকিয়া উঠিল। কিসের ভয়? এতক্ষণ কেহ সে বিষয়ে প্রশ্ন করিতেও সাহসী হয় নাই। শুধু যতীন্দ্রনাথের ভাবভঙ্গীতে তাহারা বুঝিয়াছিল, নিশ্চয়ই কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা রহিয়াছে। পাহাড়ে ভল্লুক, ব্যাঘ্র, সর্প প্রভৃতি ভীষণ হিংস্রজন্তু থাকে, ইহা তাহারা জানিত। কিন্তু ত্রিকূট পর্ব্বতে সেরূপ কোন আশঙ্কা আছে, এমন সংবাদ তাহারা কাহারও কাছে শুনে নাই।

মাঠের উপর দিয়া ক্ষীণ জলস্রোতোধারা বহিয়া যাইতেছিল। তাহা পার হইয়া চলিতে চলিতে যমুনা বলিল, "কি দেখেছিলেন আপনি বলুন ত?"

তখনও তাহার জিহ্বায় পূর্ণভাবে রসসঞ্চার হয় নাই। দেহের কম্পন-বেগ তখনও প্রশান্ত হয় নাই।

যতীন্দ্র বলিল, "দেখেছিলুম খুব ভাল জিনিষ। গুহার মধ্যে দুটি বাচ্চা নিয়ে ব্যাঘ্র-গৃহিণী নিদ্রা যাচ্ছিলেন। তাঁর ঘুম ভাঙ্গেনি, তাই রক্ষে।"

সুষমা শিহরিয়া উঠিয়া পাংশু-মুখে বলিল, "এখানে বাঘ আছে না কি?"

যতীন্দ্রনাথ আর একবার পশ্চাতের দিকে চাহিয়া বলিল, "থাকে না বলেই ত জানতুম। এখন ত চোখে দেখলুম। বোধ হয়, নতুন এসেছে।"

যমুনা উৎকণ্ঠা-ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল, "দাদারা যদি—"

তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়া যতীন্দ্র বলিল, "তাঁরা যে পথে গিয়েছেন, সে দিকে উনি ত নেই। আমরা পথ ভুলে বিপথে গিয়ে পড়েছিলুম। দেখছেন না, আমরা কত ঘুরে আসছি। তবে আমাকে আর এক দিন আস্‌তে হবে। বাঘিনী যখন আছেন, তাঁর কর্ত্তাটিও হয় ত এসে থাকবেন। আমাকে ওঁদের সঙ্গে প্রস্তুত হয়ে মুলাকাত করতে হবে দেখছি।"

যমুনা বলিল, "আপনি বাঘ মারতে আসবেন না কি?"

"হ্যাঁ, ঐ একটা মস্ত নেশা আমার আছে। আজ বন্দুকটা সঙ্গে থাকলে—"

সুষমা বলিয়া উঠিল, "গুলী চালাতেন বুঝি?"

হাসিয়া যতীন্দ্র বলিল, "আপনাদের নিরাপদ স্থানে না রেখে এসে অবশ্য সেটা করতাম না। আপশোষ রয়ে গেল।"

তখন তাহারা ত্রিকূটনাথের প্রথম পাহাড়টির কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বপরিচিত পথ ধরিয়া তাহারা ঝরণার দিকে চলিল।

বাইশ

"কৈ, ওঁরা ত আসছেন না ?"

ললিতের প্রশ্নের উত্তরে এক স্থানে দাঁড়াইয়া নিশ্বাস গ্রহণ করিতে করিতে সুশীল বলিল, "বোধ হয়, হাঁপিয়ে পড়েছে। অভ্যেস ত নেই। যতীন বাবু সঙ্গে আছে, ভাবনার কোন কারণ নেই।"

ললিত বলিল, "মাসীমা বুড়ো মানুষ, তিনি ত বেশ উঠে যাচ্ছেন, বৌদিও ত বেশ স্ফূর্ত্তির সঙ্গে চলেছেন। একটু দাঁড়িয়ে ওঁদের জন্য অপেক্ষা করা ভাল নয় কি ?"

সুশীল তখন যতীন্দ্রনাথের নাম ধরিয়া চীৎকার করিল। কিন্তু প্রতিধ্বনি পাহাড়ে পাহাড়ে শব্দ-তরঙ্গ তুলিয়া মিলাইয়া গেল—কোন প্রত্যুত্তর এবার আসিল না।

এক মিনিট অপেক্ষা করিবার পর গাইড বলিল, "এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। আর দু' মিনিটের মধ্যেই আমরা চূড়ার উপর উঠবো। তাঁরা ঠিক আসবেন। এর পর শীতের দিনেও রৌদ্র বড় চড়া লাগবে, হুজুর।"

মাসীমা একটু উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন, "তারা আসছে না কেন ? কোন বিপদ ত হয় নি ?"

সুশীল হাসিয়া বলিল, "তাদের সঙ্গে যিনি আছেন, তিনি আমাদের চেয়েও ওদের রক্ষা করবার অনেক বেশী শক্তি রাখেন,

মাসীমা। আমার মনে হচ্ছে, যমুনা হয় ত বলেছে, আর ওপরে উঠে কাজ নেই। তাই হয় ত ওরা নেমেই গেছে।"

মণিমালা বলিল, "তাই সম্ভব। চল, আমরা তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে দেখে-শুনে নেমে যাই। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই।"

সকলে সেই প্রস্তাবেই সম্মত হইল। ললিতের মনের উৎসাহ যেন অনেকখানি কমিয়া গেল।

অল্পদূরে উঠিয়া একটা বাঁক ফিরিতেই তাহারা পাহাড়ের শীর্ষদেশে প্রশস্ত চত্বরাকার স্থানে পৌছিল। রৌদ্র-দীপ্তি প্রবল হইলেও সঞ্চরণমান বায়ুপ্রবাহে সমস্ত ক্লান্তি যেন মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

কিন্তু যে বিচিত্র কাহিনীর কথা পল্লবিত আকারে তাহারা শুনিয়াছিল, তাহার কিছুই কাহারও কৌতূহলী দৃষ্টিকে চরিতার্থ করিল না। উপলখণ্ড ব্যতীত একটি তৃণও পর্ব্বত-শীর্ষকে অলঙ্কৃত করে নাই। কোনও বিচিত্রদর্শন পক্ষীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সেখানে ছিল না। অত উর্দ্ধে সাধারণ কোনও পক্ষী পর্য্যন্ত আসিয়া থাকে, এমন নিদর্শনের পর্য্যাপ্ত অভাব দেখা গেল।

"সব ফাঁকি" বলিয়া সুশীল একবার গাইডের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সে তখন একটা বিড়ি ধরাইয়া পরম নিশ্চিন্তভাবে ধুমপান করিতেছিল।

দেখিবার বিশেষ কিছু নাই দেখিয়া অল্পক্ষণ পরে সকলেই অবতরণ করিতে লাগিল।

চলিতে চলিতে মাসীমা গাইডকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাহাড়ে কোন হিংস্র জানোয়ার আছে না কি ?

গাইড বাঙ্গালী না হইলেও বাঙ্গালা বলিতে পারিত। সে মিশ্রিত বাঙ্গালায় বলিল, "না, মায়িজি, এখানে ও সব ডর কুচ নেই।"

ললিত বলিল, "বাঘ-ভালুক নেই ?"

গাইড হাসিতে হাসিতে বলিল, "না, বাবুজি ! ভালুক নেই। তবে গরম কালে কভি কভি সের আসে।"

সুশীল বলিল, "বাঘ মাঝে মাঝে আসে না কি ?"

গাইড বলিল যে, পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে একবার এইখানে বাঘ আসিয়াছিল, তবে বেশী দিন থাকিতে পারে নাই।

মণিমালা ও মাসীমার মুখে উদ্বেগের চিহ্ন প্রকটিত হইল। যমুনা ও সুষমার সংবাদ এতক্ষণের মধ্যে জানিতে না পারিয়া উভয়েরই চিত্ত অজ্ঞাত আশঙ্কায় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

মাসীমা বলিলেন, "এ বছর এসেছে কি না, জান বাছা ?"

সকলেই দ্রুতপদে অবতরণ করিতেছিল। গাইড বলিয়া উঠিল, "মায়িজী, কুছ ডর নেই। শীতকালে সের আসে না। এ বরষমে সেরের কথা শুনি নি। রোজ বখত পাহাড় চড়ি, সের কুথা ?"

কিন্তু তথাপি সকলেরই অন্তরে একটা অজ্ঞাত আশঙ্কার ছায়া যেন ভারী হইয়া দুলিতে লাগিল।

সুশীল এতক্ষণ নির্ব্বাক্‌ভাবে দ্রুত চলিতেছিল। সে বলিল, "আর কতক্ষণে নীচে নাম্‌ব ?"

"বেশী দেরি নেই, বাবুজী।"

ললিত বলিল, "আচ্ছা, আমরা যে পথে এসেছি, এ দিকে বাঘ কখনও এসে থাকে বলে শুনেছ ?"

তরুণবয়স্ক গাইড ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "না বাবুজী। সের যখন আসে, উত্তরদিকের জঙ্গলেই থাকে। সে দিকে অনেক গুহাভি আছে। এ দিকে মানুষজন হামেসা চলে, সের এ দিকে আস্‌বেই না।"

ললিত অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্তভাবে নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

পাহাড়ের তিন-চতুর্থাংশ ততক্ষণ অতিক্রান্ত হইয়াছিল। গাইড দক্ষিণের একটা চলাপথ দেখাইয়া বলিল যে, এই পথে পাহাড়ের উত্তরদিকে যাওয়া যায়। কাঠুরিয়ারা কাঠ ভাঙ্গিবার জন্য ঐ দিক দিয়া বেশী চলাফেরা করে। জঙ্গল সে দিকে আরও ঘন, অনেক কাঠ সে দিকে পাওয়া যায়। শত শত কাঠুরিয়া মাথায় বা বাঁকে করিয়া যত কাঠ একবারে লইতে পারে, তাহার জন্য জমীদারকে প্রতিবার এক পয়সা মূল্য দিতে হয়। সর্ব্বদা মানুষ যাতায়াত করে বলিয়া এই পাহাড়ে কদাচিৎ হিংস্র জন্তু আশ্রয় লইয়া থাকে।

মণিমালা ও মাসীমাতা কোন কথা কহিতেছিলেন না। নারীহৃদয় সত্যই উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হইয়াছিল। পাহাড়ের পাদদেশে নামিয়া যখন সকলে মাঠে পড়িল, তখন সুশীল প্রাণপণে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "সতীন বাবু!"

প্রতিধ্বনি পাহাড়ে তরঙ্গায়িত হইয়া মিলাইবার পূর্ব্বেই উত্তর আসিল, "হাঁ, আপনারা আসুন।"

সে কণ্ঠস্বর যে যতীন্দ্রনাথের, তাহাতে কাহারও সন্দেহ হইল না। মণিমালা ও মাসীমাতার মুখ হইতে দুশ্চিন্তার ছায়া মিলাইয়া গেল।

সুশীল বলিল, "আমি ঠিক বলেছি। যতীন্দ্র বাবু যখন সঙ্গে আছেন, আমি ওদের জন্য ভাবিনে। যতীন বাবুর গলা শুনলেন ত, ললিত বাবু?"

ললিত তরুণীদিগের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেও, বোধ হয় নিজের সম্বন্ধে আরও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল। না, সে ক্রমেই বুঝিতে পারিতেছে, যমুনা যতীন্দ্রনাথের পক্ষপাতিনী হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু সে কি করিবে? মানুষের মনের উপর জোর করিবার অধিকার কাহার আছে? আর যদিও বা কেহ তাহা করে, তাহাতে ফল কি হইতে পারে?

মুখ তুলিয়া যখন সে চাহিল, তখন ত্রিকূটনাথের ঝরণার পাশে তাহারা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যতীন্দ্রনাথের মিষ্ট কণ্ঠস্বর তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিতেছে, "কি দেখে এলেন, ডাক্তার বাবু?"

মণিমালা ও মাসীমাতা তখন চত্বরের দিকে চলিয়া গিয়াছেন।

কুণ্ড হইতে অঞ্জলি ভরিয়া জল-পানোন্মত সুশীলকে নিরস্ত করিয়া ডাক্তার বলিল, "ও কি করছেন, সুশীল বাবু?"

"বড় পিপাসা!—"

"একটু থামুন। এখন এই কমলাগুলি খান ত" বলিয়া যতীন্দ্রনাথ কয়েকটি কোয়া কমলালেবু সুশীলের মুখবিবরে নিক্ষেপ করিল।

পিপাসার তীব্রতা হ্রাস পাইলে সুশীল সেইখানে বসিয়া পড়িল।

পৌষের প্রচণ্ড শীতেও এমন পিপাসা সে পূর্ব্বে কখনও অনুভব করে নাই।

ললিতচন্দ্র যতীন্দ্রনাথের দিকে দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া বলিল, "আপনারা পাহাড়ে উঠলেন না যে?"

যতীন্দ্র বলিল, "পথ হারিয়ে ফেলেছিলুম। আপনারা কোন্ দিক দিয়ে উঠে গেলেন, শেষে আর বাহির হ'ল না। আমাদের অবশ্য খুবই দেরী হয়ে গিয়েছিল। কারণ, ওঁরা পথের মাঝে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এটা ওটা দেখছিলেন। শেষে অনেক ডাকাডাকিতেও আপনাদের জবাব পেলাম না।"

সুশীল বলিল, "তাই শেষে নেমে এলেন বুঝি?"

"হাঁ, আপনার ভগিনী আর উঠতে চাইলেন না। ফিরবার পথে—পথ ত আমরা হারিয়েই ছিলুম—একটু বিপদের সম্ভাবনাও ঘটেছিল।"

সুশীল ও ললিত উভয়েই ব্যগ্র হইয়া উঠিল। যতীন্দ্রনাথ সংক্ষেপে কথাটা বিবৃত করিল।

সুশীল শিহরিয়া উঠিল। বিপদ অবশ্যই সাংঘাতিক আকারে দেখা দিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে যতীন্দ্রনাথের প্রতি তাহার সম্ভ্রমবোধ ও কৃতজ্ঞতা সহস্রগুণ, বৃদ্ধি পাইল। কল্পনাবলে সে অনুমান করিয়া লইল, সে এরূপ অবস্থায় কখনই এমন ধীরতা ও সতর্কতার পরিচয় দিতে পারিত না।

বাস্তবিক নিদ্রিতা বাঘিনী যদি জাগিয়া উঠিত।—

কিন্তু তাহার কল্পনার সূত্র অকস্মাৎ ছিন্ন হইয়া গেল।

যতীন্দ্র তখন সহাস্য-মুখে বলিতেছিল, "কালই আবার আসতে হবে।"

"কেন?"

বিস্মিত সুশীলের দিকে চাহিয়া যতীন্দ্রনাথ বলিল, "এমন শিকারের সম্ভাবনাটা কি ছাড়া যায়, সুশীল বাবু?"

ললিত বলিল, "আপনি এ পর্য্যন্ত কতগুলি বাঘ মেরেছেন?"

তখনও খিচুড়ী নামে নাই। যতীন্দ্র বলিল "সাতটা। তবে বছর দশেক আগে বাঘ মারতে গিয়ে প্রাণ যাবার যো হয়েছিল।"

সুশীল বলিল, "কি রকম?"

যতীন্দ্রনাথ গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিয়া দেখাইল, তাহার পৃষ্ঠদেশের বাম ভাগে ব্যাঘ্রনখরাঘাতের চিহ্ন বিলুপ্ত হয় নাই।

সুশীল ও ললিতের অনুরোধে যতীন্দ্রনাথ তাহার ব্যাঘ্র-শিকার-কাহিনী যখন বলিতে আরম্ভ করিল, তখন মণিমালা, যমুনা, সুষমাকে সঙ্গে লইয়া মাসীমাতা ঝরণার সন্নিহিত কুণ্ডের অপর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

দুইটি কলিকাতার বন্ধুর অনুরোধে যতীন্দ্রনাথ দেওঘর হইতে দশ মাইল দূরবর্ত্তী একটি পাহাড়ে বাঘ শিকারের জন্য গিয়াছিল। বন্ধুযুগল শিকারে অভ্যস্ত এবং বাঘ মারিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল, ইহাই প্রকাশ করিয়াছিল। দেশীয় কয় জন শিকারী সন্ধান দিয়াছিল পূবের ঐ পাহাড়টায় একটা বাঘ আসিয়াছে। সদলবলে সেখানে গিয়া যতীন্দ্রনাথ শিকারীদিগকে পাহাড়ের সন্নিহিত জঙ্গলের অপর দিকে পাঠাইয়া দিয়াছিল। তিন বন্ধুতে একটা খোলা

যায়গায় দাঁড়াইয়াছিল। একপ্রান্তে মাত্র একটি বড় গাছ। তাহার নিম্নে গভীর খাদ। অপর দিকেজঙ্গল।

সে ফাঁকা উচ্চ যায়গায় দাঁড়াইয়া অনেকবার বাঘ মারিয়াছিল। তাহার লক্ষ্য অভ্রান্ত, শরীরেও অসুরের ন্যায় শক্তি। হাতে বন্দুক থাকিতে সে যমকেও ডরাইত না।

জঙ্গলের অবস্থা দেখিয়া তাহার মনে হইয়াছিল, সেখানে বাঘ থাকা সম্ভবপর নহে। কাজেই অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজনীয়তা সে অনুভব করে নাই। বিশেষতঃ তিন জন শিকারী উপস্থিত থাকিতে বিস্তৃত খাদের অপর পারে যদি বাঘ দেখাও দেয়, তাহা হইলে অনায়াসে সে শার্দ্দুলের পরপারযাত্রার ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

কিন্তু ঘটনাস্থলে আসিয়া কলিকাতার বন্ধুযুগলের দেহ যেরূপভাবে আন্দোলিত হইতেছিল, তাহাতে যতীন্দ্র বুঝিল, ইহারা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বাক্যবীরই বটে—জীবনে কখনও বন্দুক ধরিয়া বড় জন্তু মারিয়াছে কি না সন্দেহ। বাঙ্গালী বীরযুগল বৃক্ষটিতে আরোহণ করিবার জন্য অসীম ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু শেষে দেখা গেল, গাছে চড়িবার অভ্যাসও তাহাদের নাই। তাহাদের কাতর মুখ, কম্পিত দেহ দেখিয়া অবশেষে দয়ার্দ্র-চিত্তে যতীন্দ্রনাথ তাহাদিগকে কোনও মতে গাছে চড়াইয়া দিল। বন্দুক সহ গাছে চড়িবার পর, দুইবার তাহাদের হস্ত হইতে বন্দুক স্খলিত হইয়া নীচে পড়িয়া গেল।

অবশেষে যতীন্দ্রনাথের উপদেশে তাহারা বৃক্ষদেহের সঙ্গে

গাত্রবস্ত্র দ্বারা আপনাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। যতীন্দ্র তাহার পর একটু উদ্বিগ্নভাবে চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। বেলা তখন অপরাহ্ণের দিকে গড়াইয়া পড়িতেছিল। দূরে দলবদ্ধ গ্রামবাসী ও সঙ্গী শিকারীদিগের চীৎকারধ্বনি শুনা যাইতেছিল।

বাঘ মারা বন্দুকে গুলী ভরিয়া যতীন্দ্র ইতস্ততঃ চাহিতেছে, এমন সময় তাহার মনে হইল, খাদের ওপারের জঙ্গল ঈষৎ নড়িয়া উঠিল। পর-মুহূর্ত্তে বিড়ালাকৃতি দীর্ঘকায় একটি জানোয়ার একলম্ফে বিস্তৃত খাদটি অতিক্রম করিয়া এপারের ক্ষুদ্র জঙ্গলে প্রবেশ করিল।

যতীন্দ্র বুঝিল, সঙ্কটকাল আসন্ন। সে বৃক্ষারোহী বন্ধু-যুগলকে সতর্ক হইতে বলিল। তাহারা ব্যাঘ্রটিকে দেখিয়াছিল—একটা অস্ফুট শঙ্কিত আর্ত্তনাদ তাহাদের কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া গেল। যতীন্দ্র দেখিল, বাঘটি তাহার ঠিক সম্মুখভাগে প্রায় ৬০।৭০ হাতদূরে জঙ্গলের মধ্যে একটি বড় পাথরের অন্তরালে থাবা পাতিয়া বসিয়াছে। শুধু তাহার প্রকাণ্ড মুখমণ্ডল দেখা যাইতেছিল।

কোনও দিকে পলায়নের পথ নাই। সম্মুখে স্বয়ং কাল ঝম্প-প্রদানের জন্য উন্মুখ। সে যে খুবই বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিয়াছে—বন্ধুযুগলের বাক্যচ্ছটায় মুগ্ধ হইয়া, তাহাদিগকে শিকারী ভাবিয়া, তাহাদিগের সাহায্যের আশায় ফাঁকা যায়গায় দাঁড়াইয়াছে, ইহা মনে করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মনে অনুতাপ জাগিল। কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতির বলে সে কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া ফেলিল। অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানেই সে আছে। এখনই লক্ষ্য করিয়া গুলী

নিক্ষেপ না করিলে রক্ষার উপায় নাই। সে ব্যাঘ্রের মুখমণ্ডলের দুর্ব্বল অংশটি লক্ষ্য করিয়া বন্দুকের ঘোড়া টিপিল।

এ পর্য্যন্ত কখনও তাহার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় নাই। এবারও হইবে না, ইহাই তাহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। পরমুহূর্ত্তেই একটা ভীষণ ধাক্কায় তাহার দেহ টলিয়া উঠিল। কিন্তু এইরূপ একটা আশঙ্কা করিয়া সে প্রস্তুত হইয়াই ছিল। কাজেই প্রচণ্ড শক্তিবলে সে দাঁড়াইয়াই রহিল। কিন্তু তখনই দেখিল, একটা ব্যাদিত, দংষ্ট্রাবহুল ভীষণ বদন তাহার মস্তকের উপর নামিয়া আসিতেছে। তাহার পৃষ্ঠদেশে যে চাপ পড়িয়াছিল, তাহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।

নিমেষমধ্যে যতীন্দ্র বন্দুকের কুঁদা দুই হস্তে ধারণ করিয়া প্রভূত শক্তি-প্রয়োগ সহকারে ব্যাঘ্রের উদরে আঘাত করিল। সে আঘাত-বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ব্যাঘ্র বিপরীত দিকে পড়িয়া গেল। বন্দুক হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া, খাদে গড়াইয়া গেল। সে-ও টাল সামলাইতে না পারিয়া খাদের মধ্যে গড়াইতে গড়াইতে নামিয়া গেল।

একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া সে বন্দুকটি তুলিয়া লইল। তার পর হামা দিয়া ধীরে ধীরে খাদ বাহিয়া উপরে উঠিল। ব্যাঘ্রের কোনও চিহ্ন নাই। বৃক্ষের উপরে বন্ধুযুগল মৃতকল্প হইয়া রহিয়াছে। সহসা সে দেখিল, রক্তধারা তাহার পৃষ্ঠদেশ প্লাবিত করিয়া ভূমিতল সিক্ত করিতেছে। পুরু সোয়েটার ও ওভারকোট ছিন্ন-ভিন্ন—পৃষ্ঠদেশের মাংসও ব্যাঘ্রনখরে বিদীর্ণ।

মাথায় সে একটা দীর্ঘ শালের উড়ানি পাগড়ী করিয়া বাঁধিয়া-

ছিল। উহা সংঘর্ষের সময় খুলিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। তাহা খুলিয়া সে বন্ধুদিগকে তাড়াতাড়ি গাছ হইতে নামিতে অনুরোধ করিল। তাহারা প্রথমে নামিতে চাহে নাই। শেষে কঠোর তিরস্কারবাক্য শুনিয়া তাহারা নামিয়া আসিল। যতীনের নির্দ্দেশমত সেই শালের উড়ানির দ্বারা তাহার ক্ষতস্থান খুব জোরে বাঁধিয়া দিল।

এ দিকে শিকারীরা দলবল সহ তখন ঘটনাস্থলে আসিয়া পৌছিয়াছে। বাঘটার কোন চিহ্ন না দেখিয়া একটু অগ্রসর হইতেই রক্তের দাগ দেখা গেল। উহার অনুসরণ করিয়া সকলে কিছু দূর গিয়া দেখিল, পাহাড়ের একটা স্বল্পবিস্তৃত গুহাদ্বারে বাঘটি মরিয়া পড়িয়া আছে। একই গুলিতে তাহার ইহলীলা সাঙ্গ হইয়াছিল।

সকলে রুদ্ধশ্বাসে এই বিচিত্র কাহিনী শুনিতেছিল। সুশীল রুদ্ধনিশ্বাসে বলিল, "তার পর?"

যতীন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিল, "তার পর, বাঘে ছুঁলে আঠারো মাস। প্রায় দের বছর ঘা শুকুতে লেগেছিল। আমার বাইরের ঘরে বাঘের ছালটা হয় ত দেখে থাক্‌বেন।"

"ও! সে ত মস্ত বড় বাঘ! ওটাকেই আপনি মেরে ছিলেন?"

ললিত একবার চাহিয়া দেখিল, তিনটি তরুণীর নয়ন বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছে।

এমন সময় পিসীমার ডাক আসিল, "ওরে তোরা সব আয়, খিচুড়ি নেমেছে।"

সকলে তাড়াতাড়ি চত্বরের দিকে অগ্রসর হইল।

তেইশ

"মাসীমা !"

মাসীমা উমাশশী তখন পাটীসাপটা ভাজা শেষ করিয়া ক্ষীরের পুলির, পায়স চড়াইয়া দিয়াছিলেন। হাত দিয়া কড়াইয়ের দুধ নাড়িতে নাড়িতে তিনি বলিলেন, "কিছু কথা আছে, মণি মা ?"

মণিমালা বলিল, "হাঁ, ক'দিন ধ'রে নিরিবিলিতে তোমার সঙ্গে কথা কইতে পারি নি। ঠাকুরঝি ও সুষি পাশের বাড়ীতে বেড়াতে গেছে। এখন তাই ছুটে এলাম।"

ত্রিকূট পাহাড় হইতে বেড়াইয়া আসিবার দুই দিন পরে, মাসীমাতা পুলি-পিঠার আয়োজন লইয়া আজ ব্যস্ত ছিলেন। সপুত্র যতীন্দ্রনাথ ও তাহার পিসীমাকে জল-যোগের জন্য আজ তিনি রাত্রিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। যমুনা, সুষমা, মণিমালা তাঁহাকে সাহায্য করিতে চাহিলেও তিনি কাহারও সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। একাই তিনি নিরামিষ ঘরে কাজে বসিয়াছিলেন।

মণিমালা বলিল, "সুষির বিয়ে দেবার কি করছেন, বয়স ত অনেক হয়ে গেল, মাসীমা।"

উমাশশী বলিলেন, "তা ত বুঝি। তোর দাদা চেষ্টাও কচ্ছে কিন্তু সুষি বিয়েতে মত দিতে চায় না।"

"কেন, মাসীমা ?"

মণিমালা সুষমার ধীর প্রকৃতির কথা অবগত ছিল। লেখাপড়া যথেষ্ট শিখিলেও, সে যে কোন দিক দিয়াই আধুনিক যুগের প্রতীচ্য মনোবৃত্তির পক্ষপাতিনী নহে, তাহা মণিমালা খুব ভাল করিয়াই জানিত। প্রাচ্য ভাবধারার বিশেষ অনুরাগিণী, মনে প্রাণে হিন্দু নারী বলিয়া সুষমা অনেক সময় প্রতীচ্য শিক্ষা-দীক্ষার দোষ কীর্ত্তন করিত। কাজেই প্রতীচ্য ভাবের মোহে সে যে বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে, ইহা মণিমালার বিশ্বাস হইল না।

মাসীমা বলিলেন, "তা ঠিক বল্‌তে পারি না। বিয়ে করা দরকার, তা সে জানে, কিন্তু তবু তার অনিচ্ছা যে কেন, তা আমি অনেক চেষ্টা করেও জান্‌তে পারি নি। তবে মনে হয়—"

মাসীমাকে থামিতে দেখিয়া মণিমালা বলিল, "কি বল্‌ছিলেন, থেমে গেলেন কেন, মাসীমা ?"

"না, সেটা আমার অনুমানমাত্র। বল্‌ছিলাম কি, তোমার বোনটি ভয়ানক অভিমানিনী। উপেক্ষা, অনাদর, বেচা-কেনার ব্যবস্থা—এ সব ও সইতে পারে না। পুরুষের তরফ থেকে খালি পরীক্ষা চল্‌বে, মেয়েছেলে যেন কেনা-বেচার জিনিষ, এই উপেক্ষা বা অনাদর সুষি সহ্য করতে পারে না। তাই বোধ হয়, কনে দেখা দেবার ব্যবস্থা যদি না হয়, বিয়ে করতে সুষির অমত হবে না কিন্তু আমাদের দেশে সে ব্যবস্থা ত হ'তে পারে না, তাই ও বিয়ের কথা কাণে তুল্‌তে চায় না।"

মণিমালা নীরবে কয়েক মুহূর্ত্ত বসিয়া রহিল। তার পর বলিল, "কিন্তু সুষি কি ক'রে জান্‌লে, সব যায়গাতেই কেনা-বেচার ব্যবস্থা

হবে? ও লেখাপড়া শিখেছে, দেখতে চমৎকার, তাতে ওর ভাল বিয়ে হবে না, কে বল্‌লে?"

মাসীমা পুলিপিঠের কড়াইটা নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, "ওরে মণি, ওর একবার বিয়ের কথা হয়েছিল—চার বছর আগে।"

"কার সঙ্গে, মাসীমা?"

কণ্ঠস্বর নামাইয়া তিনি বলিলেন, "পাটনায় তখন বেড়াতে গিয়েছিল, তোমাদের এই ললিত ডাক্তার—"

মণিমালা চমকিয়া উঠিল। বাধা দিয়া বলিল, "ডাক্তার বাবুর সঙ্গে ওর বিয়ের কথা হয়েছিল না কি?"

"শোন্ না বলি। বন্ধুর বাড়ীতে থাক্‌ত। বন্ধু কাশী চ'লে গেলে ললিত ওখানেই রইল। তখন ডাক্তারি পরীক্ষা—শেষ পরীক্ষা দিয়েছিল, পাশও হয়েছিল। সেই সময় ডবল নিউমোনিয়া হয়। খবর পেয়ে আমরা দেখা-শুনা করতে লাগলাম। আহা, বিদেশে এসেছে, আপনার জন কেউ নেই। সুষি সেবার ওকে যে রকম ক'রে শুশ্রূষা করেছিল, আমি ত দেখে অবাক্!"

মণিমালা সবিস্ময়ে বলিল, "এ কথা ত শুনিনি, মাসীমা!"

উমশশী বলিলেন, "শোনবার সময় পেলাম কোথায়, মা! কিছুদিন বাদে খবর নিয়ে জানা গেল, ললিত আমাদের স্বঘর, বিয়েও হয় নি। তোর দাদা, ললিতের বন্ধুকে দিয়ে প্রস্তাব করালে—ছেলেটিকে সত্যি আমার পছন্দ হয়েছিল। বিন্দুও ওর খুব সুখ্যাতি করত। কিন্তু ললিত তখন বিলেতে যাবে ব'লে স্থির ক'রে রেখেছিল। তাই রাজি হ'ল না। আসল কথা, সুষি পাশ-টাশ

করে নি ব'লে ললিতের বোধ হয় পছন্দ হয় নি। ঐ রকম একটা কথাও যেন বলেছিল।"

মণিমালা বলিল, "এতদূর গড়িয়েছিল, মাসীমা! সুষি কি এ সব কথা শুনেছিল?"

একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি বলিলেন, "শুনেছিল বৈ কি। তার পরই সে আমাকে বলেছিল, তোমরা উপযাচক হয়ে কেন অপমান হ'তে গেলে, মা? আর কখনও আমার বিয়ের নাম করতে পাবে না বলছি। ও কত বড় অভিমানিনী, তা ত তোমার অজানা নেই, মা। তার পরই ম্যাট্রিক পাশ ক'রে ও প্রেম-মহাবিদ্যালয়ে পড়তে গিয়েছিল। সে ক'বছর আমি বৃন্দাবনেই ছিলাম।"

"তা জানি, কিন্তু ললিত ডাক্তারের কথা জানতাম না।"

মণিমালা নীরবে কি ভাবিতে লাগিল।

এমন সময় সুষমা ও যমুনা রান্নাঘরের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের প্রসন্ন আননে শান্তির বিমল দীপ্তি দেখিয়া মণিমালা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল। তার পর বলিল, "বেড়ান হ'ল ভাই!"

সুষমা বলিল, "দিদি, ওদের বাড়ীতে অনেক বই আছে। নতুন বই, বেশ পড়া যাবে।"

মণিমালা হাসিয়া বলিল, "এতক্ষণ কি বই পড়া হচ্ছিল?"

"না দিদি, খানিক তাস খেলা হ'ল। তার পর—"

আরক্তমুখে ভগিনীকে থামিতে দেখিয়া মণি বলিল, "থাম্‌লি যে?"

যমুনা হাসিতে হাসিতে বলিল, "তার পর জিজ্ঞাসা করলে,

আমরা ব্রাহ্ম কি না। মাথায় সিঁদুর নেই, শাঁখা-লোহা নেই, অথচ ছোটটি আমরা নইত! আমি তখন বল্লাম, আমরা রীতিমতই হিন্দু, তবে সুষমার কুমারীব্রত এখনও শেষ হয়নি ব'লে—সিঁদুর, শাঁখা লোহার খাড়ুর সঙ্গে অসহযোগ চলছে।"

সকলেই যমুনার কথার ভঙ্গীতে হাসিয়া উঠিল। যমুনা বলিল, আমার কথা শুনে ওরা আমার সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই তুললে না, আমিও বেঁচে গেলুম।"

এবার কিন্তু কাহারও মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল না। মণিমালা গম্ভীরমুখে বসিয়া রহিল। মাসীমা খুব মনোযোগ দিয়া মুগের পুলি ভাজিতে লাগিলেন।

সুষমা একবার সখীর মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিল। মণিমালাও ননন্দার দিকে না চাহিয়া পারিল না। কিন্তু যমুনার মুখে অন্য কোনও ভাবের অভিব্যক্তি দেখা গেল না। সাধারণ নিস্পৃহতার রেখা তাহার আননে মুদ্রিত থাকিত, তাহার অতিরিক্ত—অন্য কোনও ভাব-রেখা তাহার সমগ্র মুখমণ্ডলে দেখা গেল না।

"ও মণি—তোরা দেখ না, পুলিগুলো ঠিক ভাজা হ'লো কি না। যমুনা মা,—তুইও দুটো পুলি চেখে দেখ না, মা!"

যমুনা হাসিয়া বলিল, "মাসীমা যেন কি? আমি কি এখন খাই? হাঁ বৌদি, তুমিই বল?"

কথাটা চাপা দিয়া মণিমালা বলিল, "সুষি খুব ভাল চাখে মাসীমা। ওরে সুষি, তুই চেখে দেখ, ভাই!"

চব্বিশ

বেলাবাগান হইতে সুষমা একা বাড়ী ফিরিতেছিল।

পাটনায় কলিকাতাবাসী একটি পরিবারের সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছিল। তাহারই প্রায় সমবয়স্কা একটি তরুণীর সহিত পাটনায় তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়—প্রায় বন্ধুত্ব দাঁড়াইয়াছিল। তিন বৎসর পরে সেই তরুণী এবার স্বামিপুত্রসহ দেওঘরে—বেলাবাগানে বায়ু-পরিবর্ত্তনে আসিয়াছিল। আজ পরিচিতা তরুণীর বাড়ীতে মধ্যাহ্ন আহারের পর বেড়াইতে গিয়াছিল। যমুনা তাহার সঙ্গিনী হইতে পারে নাই।

তখনও আকাশে দিনের আলো ছিল। বেলাবাগানের পর পুরণদহের পার্শ্ববর্ত্তী পথ দিয়া সে উইলিয়ম্ টাউনের দিকে চলিতেছিল। পথটি অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন এবং বৃক্ষচ্ছায়ায় মনোরম। কিছু দূরে বাম পার্শ্বে নন্দন পহাড় দেখা যাইতেছিল। সুষমার মনটি আজ বেশ প্রফুল্ল ছিল। শীতের আর্দ্রতাশূন্য অপরাহ্নের বাতাস তাহার গরমবস্ত্রাচ্ছন্ন দেহে ঈষৎ কম্পন তুলিলেও, বেশ স্বচ্ছ বোধ হইতেছিল।

সখীস্থানীয়া তরুণীর সহিত রহস্যালাপে আজ সে অত্যন্ত লঘুচিত্তে পথ চলিতেছিল। দেওঘরে মহিলারা অসঙ্কোচে এবং নিরাপদে, সঙ্গী বা সঙ্গিনীশূন্য হইয়া ভ্রমণ করিয়া থাকেন। দুষ্ট লোকের লুব্ধ দৃষ্টি কাহারও সম্ভ্রমহানি ঘটায় না।

সুষমার মনে একটা গানের সুর জাগিতেছিল। সে ভালই গাইতে পারিত; কিন্তু পথে ঘাটে গান করা সঙ্গত নহে মনে করিয়া সে মনে মনেই সুরটিকে উপভোগ করিয়া চলিতে লাগিল।

তাহার মনে এক একবার যমুনার কথা জাগিয়া উঠিতেছিল। যে তরুণী সখীর গৃহ হইতে সে ফিরিতেছিল, সে যমুনারই সমবয়স্কা। তাহার গৃহপ্রাঙ্গণ বালকবালিকার কলহাস্যে কেমন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। স্বামী-প্রেমের অনাবিল আনন্দরসে তরুণীর জীবন কি মধুর ও পবিত্র হইয়াই উঠিয়াছে! কিন্তু যমুনা এই বয়সে যোগিনী, ব্রহ্মচারিণী। যমুনার মনের গতির সহিত এই কয় দিনে সে আরও পরিচিত হইয়াছে। নিদারুণ দুঃখকে সে স্বীকার করিয়া লইয়াছে সত্য; কিন্তু ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী এই তরুণীর ভাবী জীবন কি নৈরাশ্যপূর্ণ নহে?

চিন্তা করিতে করিতে সহসা সুষমা আপন মনে একটু হাসিল। তাহার জীবনও কি প্রায় যমুনার অনুরূপ নহে?

"আজ আপনি একলা বেরিয়েছেন যে?"

ঈষৎ চমকিত হইয়া সুষমা সম্মুখে চাহিয়া দেখিল। তাহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল।

ললিত ডাক্তারের সহিত এখানে আসিয়া অবধি এক দিনও তাহার কথা কহিবার সুযোগ অথবা প্রয়োজন হয় নাই। প্রত্যহই দেখা হইবার সুযোগ ঘটিলেও সুষমা যে তাহাকে এড়াইয়া চলিত, ইহা কি ললিতচন্দ্র বুঝিতে পারিত না?

পথের মাঝে প্রায় জনবিরল স্থানে অকস্মাৎ ললিতচন্দ্রের এই

প্রকার প্রশ্নের উত্তর সে দিবে কি না, মুহূর্ত্ত চিন্তায় তাহা স্থির করিয়া লইয়া সুষমা বলিল, "একটু দরকার ছিল।"

সে বাসার দিকে চলিতে আরম্ভ করিতেই ললিত বলিয়া উঠিল, "আপনাকে একটা কথা বলব?"

তাহার দিকে না চাহিয়াই চলিতে চলিতে সুষমা বলিল, "বলতে পারেন।"

"চার বছর আগে আপনি আমাকে চিনতেন। কিন্তু এখানে দেখা হবার পর থেকে আপনি আমাকে চিনতেই পারেন নি! সত্যিই কি আপনি চিনতে পারেন নি, না আমার কোন দোষের জন্য—"

সুষমা গম্ভীরভাবে বলিল, "আপনাকে নিশ্চয় চিনতে পেরেছি। কিন্তু আমি হিন্দু বাঙ্গালীর মেয়ে, সেটা আপনি ভুলে গেলেন কেন?"

ললিত সহসা যেন কশাহত হইল। বাস্তবিক এ কথাটা তাহার বিস্মৃত হওয়া সঙ্গত হয় নাই। বালিকার পক্ষে যে অসঙ্কোচ ব্যবহার চলিতে পারে, হিন্দু বাঙ্গালী তরুণীর পক্ষে তাহা সঙ্গত নহে, প্রচলিত রীতিরও বিরোধী। সত্য, অতি সত্য। কিন্তু—

ললিতের তখনই মনে পড়িল, তাহার সম্বন্ধে সুষমা যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে, যতীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাহা ত করে নাই। সে এই কয় দিনেই অনেকবার লক্ষ্য করিয়াছে, যতীন্দ্রনাথের সহিত আলাপ ব্যবহারে সুষমার বিশেষ কোন সঙ্কোচ দেখা যায় নাই। অথচ দেওঘরে আসিবার পূর্ব্বে এই ব্যক্তি তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল।

এই পার্থক্যের অনুভূতি তীব্রভাবে ললিতচন্দ্রের হৃদয়কে আহত

করিল। সে ঈষৎ উত্তেজিতভাবে বলিল, "আপনি সেবার অসুখের সময় আমার জীবন রক্ষা করেছিলেন। সে জন্য আমি কৃতজ্ঞ।"

দ্রুত চলিতে চলিতে সুষমা বলিল, "কিন্তু পথটা এখন নির্জ্জন। আমাকে একা যেতে দিন। এমনভাবে আপনার সঙ্গে পথ চলায় মানুষের সমালোচনার—"

বাধা দিয়া লজ্জিতভাবে ললিত বলিল, "মাপ করুন। অতটা আমি বুঝ্‌তে পারি নি। আমি চ'লে যাচ্ছি।"

ললিত মুহূর্ত্তে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বিপরীত দিকে চলিল। একটু গিয়াই সে একটা আম্রবৃক্ষতলে দাঁড়াইল।

সুষমা দ্রুত, দৃঢ় চরণে ঐ ত বাড়ীর দিকে চলিয়াছে! তাহার শাড়ীর চওড়া লালপাড় তখনও দেখা যাইতেছিল। স্বচ্ছন্দ গতিভঙ্গীতে মাধুর্য্য নাই কি? আলুলায়িত দীর্ঘ কেশরাজি শাদা শালের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছিল

ললিতচন্দ্র স্থাণুর ন্যায় দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল।

এই তরুণী যখন কিশোরী ছিল, তখন ইহার সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল। নিতান্ত উপেক্ষার সহিতই সে তখন সুষমার দিক হইতে আপনাকে ফিরাইয়া লইয়াছিল। কিন্তু এই তরুণীর সুস্থ সবল দেহের ন্যায় মনটিও যে সুস্থ এবং সবল, তাহার জন্য গবেষণার প্রয়োজন আছে কি? প্রগল্‌ভা সে নহে অথচ দ্বিধাহীন, কুণ্ঠাহীন কণ্ঠে, সে সত্যকে প্রকাশ করিতে বিলম্ব করে না।

স্তিমিত আলোকে তরুণীর সঞ্চরণমান দেহ ক্রমেই দূরে সরিয়া যাইতেছিল। একবারও সে পশ্চাতের দিকে ফিরিয়া চাহিল না। সামান্য কৌতূহলও পর্য্যন্ত তাহার নাই! আশ্চর্য্য!

মোড়ের বাঁকে যখন তাহার দেহ অদৃশ্য হইল, তখন একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ললিতের নাসাপথে নির্গত হইল। সে শব্দে ললিত নিজেই চমকিয়া উঠিল।

কেন, কেন এই দীর্ঘশ্বাস?—

তরুণীর শূন্য গতিপথের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অবশেষে সে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। তারপর ধীরে ধীরে সে পথ চলিতে লাগিল।

ট্রাঙ্করোডের উপর তখন বায়ুসেবনের জন্য নর-নারী বালক-বালিকা হাস্য প্রফুল্লমুখে চলিতেছিল।

কি সুখী এই সকল পথচারী নর-নারী! তাহাদের আননে স্বচ্ছন্দ ও আনন্দপূর্ণ গৃহস্থালী—দাম্পত্য-জীবনের আভাস যেন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ললিতের মনে হইল, তাহার এই আটাশ বৎসরের জীবনে এমন পূর্ণতার কোনও ইঙ্গিত কখনও রেখাপাত করে নাই! বাল্যকালের স্মৃতি হইতে যৌবনের উপকূলে কোনও শান্তির বার্ত্তা পৌঁছে নাই। নিঃসঙ্গ জীবনে সতীর্থ বা পরিচিত ব্যক্তিগণের নিয়মিত বা অনিয়মিত আগমন, বা সাময়িক আলোচনার ভিড় ছাড়া, অন্যবিধ স্মরণযোগ্য অথবা নির্ভরযোগ্য কোনও অবস্থার পরিচয় কি সে পাইয়াছে?

অর্থ তাহার আছে; জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের প্রধান সুযোগ তাহার করায়ত্ত; কিন্তু যাহাদের জন্য

সে সংগ্রামের প্রয়োজন ঘটিয়া থাকে, ললিতের তেমন কেহ ত নাই। তাহার জীবন বন্ধনহীন। সন্ন্যাসী হইতে পারিলে, তাহার পক্ষে হয় ত এরূপ অবস্থা বাঞ্ছনীয় হইতে পারিত। কিন্তু তেমন কোন স্পৃহা ললিতের নাই। সে গৃহী হইতে চাহে—দাম্পত্য-জীবনের রসাস্বাদ করিয়া সে-জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য সম্পূর্ণ আগ্রহান্বিত। সে শুনিয়াছে, দাম্পত্য-জীবনে অবিশ্রান্ত সুখ ও আনন্দ নাই। মান-অভিমান, বিরহ-মিলন, আঘাত-প্রতিঘাত সে জীবনকে উত্তাল তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্রের ন্যায় উদ্বেল চঞ্চল করিয়া তুলে। কিন্তু তথাপি জীবনের বৈচিত্র্য তাহাতে অনুভব করা ত চলে। আলোক ও অন্ধকার—সুখ ও দুঃখ মানব-জীবনের সহিত অনুস্যূত হইয়া থাকে। তাহাকে এড়াইয়া যাহারা চলিতে চাহে, তাহারা সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী; গৃহীর তাহা কাম্য নহে।

ললিত গৃহীর জীবন যাপন করিতে চাহে। দুঃখ বা অশান্তিকে ভয় করিয়া চলিতে সে রাজী নহে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এই আকাঙ্ক্ষিত গৃহস্থ-জীবন যাপনের সুযোগ তাহার ঘটিল না।

চলিতে চলিতে সে সোজা অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গেল। পুরণদহের শেষাংশে উপস্থিত হইয়া সে দেখিল, প্রত্যহ সে যেখানে আসিয়া খানিকক্ষণ পশ্চিম-দিগন্তের দিকে চাহিয়া থাকে, সেইখানেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দীর্ঘ প্রান্তর অতিক্রম করিলে, পশ্চিমের দিকে রোহিণীতে যাওয়া যায়।

তখনও আকাশে সূর্য্যাস্ত-দীপ্তি ম্লান হইয়া পড়ে নাই। সে মিনিট পনের স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফিরিয়া চলিল। অতি

মৃদুচরণে সে চলিতে লাগিল। এই পথের ধারেই যতীন্দ্রনাথের বাড়ী। ত্রিকুট পাহাড় হইতে বেড়াইয়া আসিবার পর আজ পাঁচ দিনের মধ্যে সে একবারও যতীন্দ্রনাথের বাড়ী যায় নাই। সে ইচ্ছা করিয়াই এই কয় দিন সাধ্যমত যতীন্দ্রনাথকে এড়াইয়া চলিয়া আসিতেছে। এই রূপবান, অসীম-বলশালী এবং বহু গুণে গুণবান্ যুবককে সে যেন সহ্য করিতে পারিতেছিল না। সে মনে মনে দৃঢ়-সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, যতীন্দ্রনাথ তাহার প্রতীযোগী, তাহার ভাগ্যাকাশে শনিগ্রহস্বরূপ এই যুবক সমুদিত হইয়াছে।

হাঁ, এবিষয়ে তাহার মনে সংশয় নাই। যমুনা সুনিশ্চিত ভাবে যতীন্দ্রনাথের প্রতি অনুরক্তা, ইহা তাহার দৃঢ় ধারণা। সেই জন্যই যমুনা তাহাকে এড়াইয়া চলে; তাহার সম্মুখে পর্য্যন্ত আসিতে চাহে না।

গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া সম্মুখের দিকে চাহিতেই সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

সে দেখিল, যতীন্দ্রনাথের বাড়ীর সম্মুখেই সে আসিয়া পড়িয়াছে বাহিরে ফটক খোলা। ভিতরে চারিটি নারী-মূর্ত্তি। মণিমালা, যমুনা, সুষমা এবং মাসীমাতাকে চিনিতে তাহার মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইল না। যমুনার ক্রোড়ে যতীন্দ্রনাথের পুত্র সতু। যমুনা পরম স্নেহভরে পুনঃ পুনঃ সতুর মুখে চুমা দিতেছে। অদূরে যতীন্দ্রনাথ দাঁড়াইয়া।

যেন অকস্মাৎ কেহ ললিতের পৃষ্ঠে কশাঘাত করিল। সে আর দাঁড়াইল না; দ্রুতবেগে সম্মুখের দিকে চলিতে লাগিল।

পঁচিশ

"মাসীমা, তুমি বড় সুন্দর!"

সতুকে বুকের উপর তুলিয়া লইয়া তাহার সুন্দর কচি মুখে অজস্র চুমা দিয়া যমুনা বলিল, "তুমি আমায় ভালবাস, সতু?"

"খু-উ-ব ভালবাসি তোমায়।"

ঘরের মধ্যে তখন কেহ ছিল না। যমুনা সতুর দীর্ঘায়ত, উজ্জ্বল হাস্যপ্রফুল্ল চোখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। আঃ, কি সুন্দর, কি মধুর, কি পবিত্র ও হৃদ্য এই স্পর্শ! এ সন্তান তাহার নহে; তথাপি সমগ্র অন্তর, সমগ্র দেহ যেন মাতৃত্বের রসে পরিপূর্ণ, উজ্জ্বল হইয়া শিশুকে বেড়িয়া বেড়িয়া স্বপ্নস্বর্গ রচনা করিতে থাকে। দাদার খুকুরাণীকে বুকে ধরিলে যেমন আনন্দ-শিহরণ জাগে, পরের সন্তান সতুকে কোলে লইয়া ঠিক সমান অনুভূতি প্রবল হইয়া উঠে।

যমুনার দিকে চাহিয়া সতু বলিল, "মাসীমা, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? এত দিন তোমায় দেখিনি কেন?"

তাহাকে কোলে চাপিয়া পশ্চিমের একটা খোলা জানালার ধারে সরিয়া গিয়া যমুনা বলিল, "এতদিন কলকাতায় ছিলাম কি না, তাই তুমি দেখনি।"

"আচ্ছা মাসীমা, মাকে আমি ছবিতে দেখেছি। বাবার ঘরে

মা'র খুব বড় ছবি আছে দেখেছ? তোমাকে কিন্তু মা'র মতই দেখতে।"

মাতৃহীন বালকের কণ্ঠে যে সুর বাজিয়া উঠিল, তাহাতে তাহার প্রাণের তন্ত্রীতেও যেন ঝঙ্কার তুলিল। যমুনা বলিল, "তা ত হবেই, বাবা! তিনি যে আমার দিদি ছিলেন।

আজ সকালবেলা সে সতুকে আনাইয়া লইয়াছিল। ইহাকে দেখিলেই ভালবাসিতে আগ্রহ হয়। সতুও কয় দিনে যমুনার এমন অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, মাসীমার কাছে থাকিতে পাইলে তাহার আনন্দের সীমা থাকিত না। যমুনা সতুকে স্নান করাইয়া খাওয়াইয়া দিয়া জনহীন দ্বিপ্রহরে তাহাকে লইয়া সোহাগ করিতেছিল। তখন সকলেই যে যাহার ঘরে বিশ্রাম করিতেছিল, কাযেই যমুনার বিশ্রম্ভালাপে সে বাধা পাইল না।

"মাসীমা!"

বালকের আহ্বানে যমুনা বলিল, "কি, সতু?"

"আচ্ছা, তুমি মা'র মত চওড়া লালপাড় শাড়ী পর না কেন? তোমার সীঁথেয় সিঁদূরও নেই দেখ্‌ছি। ছবিতে দেখেছি, মা আমার চওড়া লালপাড় শাড়ী প'রে রয়েছেন। তাঁর সীঁথেয় সিঁদূর! তোমার নেই কেন, মাসীমা?"

মুহূর্তের জন্য যমুনার সমগ্র অন্তর দুলিয়া উঠিল। সাত বৎসরের শিশুর মনে যে সংশয় জাগিয়াছে, যুক্তি দিয়া তাহার নিরসন করিবার মত মনের ভাব যমুনার নাই। শিশুটিরও কৌতূহল-নিবৃত্তির যুক্তি কি?

যমুনা হাসিমুখে বলিল, "কেন সতু, তোমার মাসীমাকে এমনি ভাল লাগে না?"

"না, তুমি ভাল। তুমি আমার ভাল মাসীমা।"

সতু তাহার দুই ক্ষুদ্র বাহুর দ্বারা যমুনার কণ্ঠদেশ জড়াইয়া ধরিল।

এমন সময় মণিমালা হাস্য-মুখে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে ননন্দার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "ঠাকুরঝি, তোমার কোলে ছেলে-মেয়ে কি সুন্দর মানায়। ঠিক যেন মা যশোদা!"

যমুনা ভ্রাতৃবধূর দিকে চাহিল, তার পর হাসিমুখেই বলিল, "আর তোমাকে যে গণেশ-জননীর মত দেখায়, সেটা ত দেখতে পাও না, বৌদি!"

তখন মণিমালা ও যমুনা উভয়েই হাসিতে লাগিল।

সতু মণিমালার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "বড় মাসী, শীলা কি করছে?"

সুশীল তাহার নামের মধ্য অক্ষর এবং পত্নীর নামের শেষ অক্ষর মিলাইয়া কন্যার নাম রাখিয়াছিল শীলা।

"সে এখনও ঘুমুচ্ছে বাবা।"

"দিনের বেলা শীলু ঘুমোয়? আমি ঘুমুই না, বড় মাসী। বাবা বলেন, দিনের বেলা ঘুমুনো ভাল নয়।"

"তুমি বাবার সব কথা শোন, সতু?

মণিমালার প্রশ্নে সতু বলিল, "বাবা আমায় বড্ড ভালবাসেন। তাঁর কথা আমি নিশ্চয় শুনি। তিনি আমায় বলেছিলেন, ছ'মাসের

মধ্যে ফাষ্টবুক আর শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ আমাকে শেষ করতে হবে। আমি তাঁর কথামত শেষ করেছি, মাসীমা। জানুয়ারী মাস থেকে আবার বড় বড় নতুন বই পড়ব। বাবার কথা না শুনে আমি পারি ?”

সাত বৎসরের বালকের পিতৃভক্তির প্রবৃত্তির পরিচয় পাইয়া যমুনা ও মণিমালার অন্তর ভাবাবেগে পূর্ণ হইয়া উঠিল। এখন হইতেই পিতার প্রতি সতুর এত ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা! সে যে পুত্ররত্ন, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে কি ?

মণিমালা বলিল, “তুমি খুব ভাল ক'রে লেখাপড়া শিখো, সতু। তোমার বাবা খুব পণ্ডিত ব'লে শুনেছি।”

যমুনা বলিল, “আর তোমার বাবার মত গায়ে জোর করতে পারবে ত ?”

সতু বলিল, “হ্যাঁ, মাসীমা। আমি এখন থেকেই ডাম্বেল ভাঁজতে যাই; কিন্তু বাবা বলেন, না, আরও একটু বড় না হলে, তিনি আমাকে ওসব করতে দেবেন না। আচ্ছা মাসীমা, কেন বাবা আমায় এখন বারণ করেন, জানেন ?”

“না বাবা, ঠিক জানিনে। তবে তুমি এখন ছোট বলেই ব্যায়াম করতে দেন না।”

“ঠিক, মাসীমা! আপনি জানেন দেখ্ছি। বাবা বলেন, আমার হাড় আর একটু শক্ত হলেই তিনি নিজে আমাকে শেখাবেন।”

“মা!”

সকলে চাহিয়া দেখিল, শীলারাণী দরজার কবাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া। তাহার নয়নে তখনও দিবানিদ্রার ঘোর কাটে নাই।

সতু যমুনার কোল হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া শীলার কাছে দৌড়িয়া গেল। তাহার দুই হাত ধরিয়া সে তাহাকে ঘরের মধ্যে ধীরে ধীরে টানিয়া আনিল।

"খাট থেকে তোকে কে নামিয়ে দিলে রে, শীলু?"

মাতার প্রশ্নে শীলা বলিল, "বাবা।"

সতু তখন শীলার হাত ধরিয়া খোলা জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের নিষ্কলঙ্ক শুভ্রললাটে, আনন ও নয়নে শিশুসুলভ সারল্য। সতু তাহার জামার পকেট হইতে খেলানা বাহির করিয়া শীলার হাতে দিল। কিছু আগে যমুনা এই খেলানাগুলি সতুকে দিয়াছিল।

উভয়ে আলোক-প্লাবিত ঘরের মেঝেয় বসিয়া পড়িয়া খেলা করিতে আরম্ভ করিল। আর সকলের উপস্থিতির কথা তাহারা ভুলিয়া গেল।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে মাতা ও পিসী শীলার সহিত সতুর খেলা দেখিতে লাগিল। যমুনার মুখ ক্রমেই যেন গভীর পরিতৃপ্তির আনন্দে হাস্য-প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। মণিমালা নিবিষ্টদৃষ্টিতে ননন্দার দিকে চাহিয়া রহিল।

ছাব্বিশ

স্বামী ও স্ত্রীতে কথা হইতেছিল।

শীতের রাত্রি, চারিদিক সুষুপ্ত, শান্ত, স্থির। মধ্যরাত্রি—তখনও মণিমালা ও সুশীল জাগিয়াছিল। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। কিছু আগে উভয়েই একখানি উপন্যাস পড়িতেছিল। সুশীল স্ত্রীকে পড়িয়া শুনাইতেছিল। নূতন উপন্যাসখানিতে মানব-জীবনের একটা কঠিন সমস্যা লইয়া আলোচনা ছিল।

পড়া শেষ করিয়া উভয়ে কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়াই ছিল। সম্ভবতঃ নিপুণ লেখকের রচনার প্রভাব, গভীর মনস্তত্ত্বের ঘাত প্রতিঘাত তাহাদিগের অন্তরেও আলোড়ন তুলিয়াছিল।

একপাশে শীলা লেপ গায় দিয়া ঘুমে অচেতন। তাহার শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত শব্দ নিস্তব্ধ কক্ষমধ্যে একটা ছন্দোবদ্ধ সুর তুলিতেছিল।

সহসা সুশীল পত্নীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "কিছু দিন থেকে একটা কথা বল্‌ব ব'লে ভাবছি।"

মণিমালা বলিল, "কি কথা ?

"দেখ আমি লক্ষ্য করেছি, যমুনা যতীন বাবুর কাছে অসঙ্কোচে যায়, কথাও বলে। কিন্তু ডাক্তার বাবুর সঙ্গে কথা বলা দূরে থাকুক, সাম্‌নে থাক্‌তেও রাজি নয়! তুমি লক্ষ্য করেছ কি ?"

স্বামীর দিকে চাহিয়া মণিমালা বলিল, "শুধু ঠাকুরঝি কেন, সুষমাও ত ঠিক্ তাই করে।"

সুশীল বলিল, "আমি যমুনার ব্যবহারেই লক্ষ্য ক'রে চলেছি।

সুষমার কথাটা তেমন ক'রে ভেবে দেখিনি। কিন্তু একটা কথা মনে হয়, যমুনা যতীন বাবুকে খুব শ্রদ্ধা করে।"

মণিমালা হাসিয়া বলিল, "তা করে।"

সুশীল বলিল, "মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিতরা বলেন, শ্রদ্ধা থেকে প্রেম বা ভালবাসার জন্ম হয়।"

মণিমালা বলিল, "তোমার মনস্তত্ত্ববিদের কথা জানি নে। তা না হয় মেনে নিলাম যে, ওটা সম্ভবপর। কিন্তু তাতে কি?"

সুশীল কণ্ঠস্বর পূর্ব্বাপেক্ষা মৃদু করিয়া বলিল, "আমার বলবার উদ্দেশ্য, যতীন বাবুর প্রতি এই শ্রদ্ধা থেকে যমুনার মনে ভালবাসার সঞ্চার হয় ত হয়েছে।"

মণিমালা এবার প্রাণ ভরিয়া হাসিতে লাগিল। তবে সে হাস্য স-রব নহে। পত্নীকে এমন ভাবে হাসিতে দেখিয়া সুশীল বলিল, "এত হাস্‌ছ কেন, মণি?"

অতি কষ্টে হাস্যবেগ সংবরণ করিয়া মণিমালা বলিল, "তোমার যুক্তির বহর দেখলে আপনিই হাসি আসে।"

গম্ভীরভাবে সুশীল বলিল, "কিন্তু যুক্তির মধ্যে ত্রুটি কোথায়?"

স্বামীর ন্যায়ই গম্ভীর হইতে চেষ্টা করিয়া মণিমালা বলিল, "ভক্তি বা শ্রদ্ধা হ'তে যদি প্রেম বা ভালবাসার জন্ম হয়, ধ'রে নেওয়া যায়, তা হ'লে আমিও ত যতীন বাবুকে খুব শ্রদ্ধা করি। সুষমাও যে সে বিষয়ে কারুর চাইতে কম, এও ত মনে হয় না। তা হ'লে তোমার যুক্তি যে, আমি ও সুষমা ও যতীন বাবুর প্রেমে প'ড়ে গিয়েছি?"

সুশীল শয্যায় নড়িয়া চড়িয়া লেপখানা ভাল করিয়া গায়ের

উপর টানিয়া দিল, তার পর বলিল, "আরে, তোমার কথা হচ্ছে না। তোমার ত ভালবাসার পাত্র রয়েছে। যাদের তা নেই, তাদের মনে একটা আকর্ষণ হয় না?"

মণিমালা বলিল, "তা তোমার যুক্তিই যদি মান্‌তে হয়, তা হ'লে সুষমারও ত ঐ এক অবস্থা। তা হ'লে সেও যতীন বাবুর প্রেমানুরাগিণী হয়েছে, এই কথাই কি তুমি বল্‌তে চাও।"

সুশীলচন্দ্র কয়েক মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করিয়া বলিল, "নারী-চরিত্র যখন দুজ্ঞেয় ব'লে সকল দেশের পণ্ডিতগণই বলেছেন, তখন সেটা আশ্চর্য্য নাও হ'তে পারে। শক্তিমান বা বীরকে নারীমাত্রেই ভালবাসে। সুষমা যে বাসে না, তাই বা কে বল্‌তে পারে?"

মণিমালা হাসিয়া বলিল, "নারী-চরিত্র যখন বুঝতেই পার না, তখন সে বিষয়ে কথা কইতে যাও কেন? অনধিকারচর্চ্চা ত ভাল নয়।"

সুশীলচন্দ্র বলিল, "ও কথা ছেড়ে দাও। আমি সত্যি বল্‌ছি, ভারী দুর্ভাবনায় পড়ে গেছি। যমুনা যদি যতীন বাবুকেই পছন্দ ক'রে থাকে, আর যদি যতীন বাবুর অমত না থাকে, তবে তাঁর সঙ্গেই আমি আবার ওর বিয়ে দিই। সত্যি, এমন ভাবে ওর জীবনটা ব্যর্থ হবে, এ আমি দেখতে পারছি না।"

মণিমালা স্বামীর দক্ষিণ হস্তের করাঙ্গুলি তাহার কোমল করপল্লবের মধ্যে গ্রহণ করিয়া বলিল, "তোমার ধারণা কিন্তু আমি সত্যি ব'লে মেনে নিতে পারছি না। ললিত বাবুকে দেখে স'রে যাওয়া এবং তাঁকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা, আবার যতীন বাবুর সঙ্গে

ঠিক বিপরীত আচরণ লক্ষ্য করেই যে তুমি ঠিক করেছ, যমুনার মনে ভালবাসা জন্মেছে, তা ঠিক নয়।"

কৌতূহল বৃদ্ধি পাইবারই কথা। সুশীলচন্দ্র আগ্রহভরে বলিল, "তোমার মনে কি হয়?"

একটু থামিয়া মণিমালা বলিল, "দেখ, মেয়েমানুষ অল্পেই অনেক কথা বুঝতে পারে; তোমরা সে দিকটা বোধ হয় ভাবতেই পার না। পুরুষমানুষের মনে কোন নারীর সম্বন্ধে ভাবান্তর যদি জন্মে, মেয়েরা তা বুঝতে পারে। কেমন ক'রে পারে, তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। তবে পারে, এটা খুব সত্যি কথা। ললিত বাবু যে যমুনার জন্য পাগল, যমুনাকে লাভ করবার যে প্রবল ইচ্ছা তাঁর আছে, মুখ ফুটে তার আভাস না জানালেও, সেটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর মনের এই ভাবান্তর স্পষ্টভাবে বুঝতে না পারলেও যমুনার প্রকৃতি সেটা তার অজ্ঞাতসারেও অনুমান ক'রে নিয়েছে। যে পুরুষের মনে এমন ভাব আসে, মেয়েরা প্রকৃতির সহজ জ্ঞানের সাহায্যে, সে রকম পুরুষকে এড়িয়ে চলে।"

সুশীল এবার হাসিতে লাগিল। তার পর বলিল, "তুমি দেখছি ললিত বাবুর ওপর গোয়েন্দাগিরি আরম্ভ ক'রে দিয়েছ।"

মণিমালা মধুর হাস্য করিয়া বলিল, "এটা মেয়ে জাতের স্বভাব যে! এ সকল ব্যাপারে তাদের দৃষ্টি ভারী তীক্ষ্ণ। মনে ভেব না, যদি তোমার কোন দিন সে রকম ভাবান্তর ঘটে, আমাদের দৃষ্টি থেকে তা এড়িয়ে যাবে!"

"আচ্ছা গো আচ্ছা সে তখন দেখা যাবে। কিন্তু ললিত

বাবুর ব্যাপারটা না হয় বুঝলুম। তুমি বলতে চাও, যতীন বাবুতে সে রকম কিছু নেই?"

দৃঢ়স্বরে মণিমালা বলিল, "না, নিশ্চয় নয়। যে পুরুষ নারী সম্বন্ধে নির্ব্বিকার, তাঁর কাছে বয়েসের মেয়েরা অসঙ্কোচে যেতে পারে, যায়ও। যতীন বাবুর মন স্বচ্ছ নির্ম্মল। তাঁর কাছে যেতে, তাঁর সঙ্গে গল্প করতে আমাদের মোটেই বাধে না।"

সুশীল অনেক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া রহিল। নারীজাতির সহজাত বুদ্ধির এই দিকটা এত দিন তাহার জ্ঞানের অতীত ছিল। সত্যই পুরুষজাতিকে নারী যত সহজে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়া তাহার স্বরূপ জানিতে পারে, পুরুষ নারীজাতি সম্বন্ধে তাহার কতটুকু জানে? পত্নীর কথায় তাহার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। নারীর সম্বন্ধে পুরুষের ধারণা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভ্রমাত্মক, ইহা তাহার মাঝে মাঝে মনে হইত বটে; কিন্তু পুরুষজাতি যে সত্যই নারী সম্বন্ধে এমন অজ্ঞ, তাহা সে কোন দিনই কল্পনা করিতে পারে নাই। এত দিন পুরুষ লেখক, পুরুষ গবেষক নারী সম্বন্ধে যে সকল অভিমত গঠন করিয়া গিয়াছেন, তাহা একদেশদর্শিতা-দোষে দুষ্ট। সকল পুরুষের পক্ষে নারীজাতি সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানসঞ্চয় করা সম্ভবপর নহে। পুরুষ, তাহার নিজের মনের গতিপ্রকৃতির অনুসরণ করিয়া অনেক সময় নারীর মানসিক অবস্থা এবং কার্য্যকলাপের বিশ্লেষণ করিয়া থাকে; কিন্তু মণিমালার কথা মত তাহা কত ভ্রান্ত!

স্বামীকে নীরব দেখিয়া মণিমালা বলিল, "কি ভাব্‌ছ?"

সুশীল বলিল, "তোমার কথা ভেবে দেখ্‌ছিলাম। সত্যি, মণি,

তোমার কথার দাম আছে। আমরা অনেক সময় নিজেদের মনের দিক দিয়ে নারীর বিচার করি; কিন্তু তাতে সত্যকে জানা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষরা নারীকে ভুল বুঝে আসছে।"

"সে কথা মিথ্যে নয়। পুরুষের লেখা এমন অনেক বই আছে, যা প'ড়ে মনে হয়, তাঁরা মেয়েমানুষের সম্বন্ধে যা লেখেন, তা কত মিথ্যে। অবশ্য সকলের সম্বন্ধে নয়। যাঁরা অনেক দেখেছেন এবং শক্তিশালী, তাঁরা প্রায় অভ্রান্ত। মনে হয়, তাঁরা নারী-চরিত্রকে বিশ্লেষণ করবার জন্য অনেক সাধনা করেছেন। মেয়েদের মন সঠিকভাবে জানবার জন্য খুব বেশীরকম চেষ্টা না করলে ভুল হবারই কথা। অল্পবয়সের পুরুষরা সে অবকাশ পান না ব'লে তাঁরা যা তা লিখে থাকেন।"

সুশীল হাসিয়া বলিল, "তুমি যে দেখছি শেষকালে সাহিত্যের আলোচনা এনে হাজির করলে!"

মণিমালা যে অনেক দিন ধরিয়া সাহিত্য-চর্চ্চা করিতেছে, সুশীল তাহা জানিত। এ জন্য তাহার বাড়ীর পাঠাগারে অসংখ্য গ্রন্থের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তবে মণিমালা সাহিত্যযশঃপ্রার্থিনী ছিল না। সে শুধু পাঠিকাই ছিল।

মণিমালা বলিল, "কথাটা উঠ্‌লো বলেই বল্‌লাম। তুমিও ত বই পড়তে খুব ভালবাস। অনেক লোকের ন্যাকামি—মেয়েদের সম্বন্ধে যা ইচ্ছে তাই লিখে তাঁদের অজ্ঞতার প্রকাশ কি তুমি লক্ষ্য করনি? আমি ত তোমাকে জানি।"

সুশীল বলিল, "খুব সত্যি কথাই তুমি বলেছ। আমি স্বীকার

করছি, স্ত্রীজাতির মনস্তত্ত্ব আমাদের কাছে সম্পূর্ণ না হোক্, বেশীর ভাগ রহস্যময়। আমরা সত্যি তোমাদের বুঝতে পারি না।"

প্রাচীর-বিলম্বিত ঘটিকাযন্ত্রে একটা বাজিয়া গেল।

মণিমালা বলিল "অনেক রাত হয়েছে। ঘুমোও।"

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সুশীল বলিল, "কিন্তু যমুনার একটা গতি করতে না পারলে আমার মনে শান্তি আস্‌বে না।"

"আচ্ছা, আরও কিছুদিন যেতে দেও। ললিত বাবু বিয়ে করতে রাজি, তা বুঝতেই পারছি। এখন ঠাকুরঝির মন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে কি না, সেটা দিনকতক পরে বোঝা যাবে। কিন্তু ললিত বাবু কি তাঁর প্রাকটিস্ ছেড়ে বেশী দিন এখানে থাক্‌বেন?"

সুশীল বলিল, "তাঁর কাছ থেকে সে রকম কোন কথা শুনিনি। আমরা আরও মাসখানেক এখানে থাক্‌ব বলেছি। তাতে তিনি যেন খুসীই হলেন। যদি ডাক্তার বাবুর সঙ্গে না হয়, যতীন বাবুর সঙ্গে বিয়ে দিতে পারি, তাতেও আমি খুব খুসী হব। তুমি খুব বুদ্ধিমতী। যমুনা ও যতীন বাবুর দিকে একটু বেশী ক'রে লক্ষ্য রেখ। সহজেই তুমি সব বুঝতে পারবে।"

মণিমালা হাই তুলিয়া বলিল, "সে তোমার বলতে হবে না। যতীন্ বাবুর ছেলের দিকে ঠাকুরঝির স্নেহ দিন দিন বাড়ছে। এটা শুভ লক্ষণ। আজ আমি সতু ও ঠাকুরঝির কথাবার্ত্তা আড়াল থেকে শুনেছি। তাতে আশা হচ্ছে, উভয়ের মধ্যে অনুরাগসঞ্চার হবার সুযোগ যেন এগিয়ে আস্‌ছে। দেখি কি হয়!"

"ভগবান্ তাই করুন" বলিয়া সুশীল পাশ ফিরিল।

সাভাশ

দুই সপ্তাহের অধিককাল সে এখানে রহিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনও আশার লক্ষণই সে দেখিতে পাইল না ত! আজ পর্য্যন্ত যমুনার সহিত সামান্য আলোচনা করিবার সুযোগ পাওয়া দূরে থাকুক, যমুনা তাহার সাক্ষাতেই বাহির হয় না। অথচ ঘোর অবরোধবাসিনী সে নহে। সুশীল বাবুর বাড়ীতে পুরুষমানুষের সহিত নারীর অবাধ মেলা-মেশার ব্যবস্থা কোনও দিনই নাই সত্য; কিন্তু সে ত দুই বৎসরের অধিককাল ধরিয়া দেখিতেছে যে, এ বাড়ীর মেয়েরা মুক্ত বায়ু, অবাধ আলোক, খোলা মাঠ ভালবাসেন। পথে ঘাটে বাহির হইতে অবগুণ্ঠনের অনাবশ্যক আড়ম্বরের ভক্ত কেহই নহেন। যতীন্দ্রনাথ অনাত্মীয় হইলেও তাঁহার সহিত এ বাড়ীর মেয়েরা যেমন অসঙ্কোচে কথা বলেন, ব্যবহার করেন, সে তাহা হইতে বঞ্চিত কেন?

শুধু যমুনা কেন, সুষমাও তাহাকে এড়াইয়া চলে। মণিমালা অবশ্য সম্মুখে আসেন, তাহার সহিত দুই একটা কথা বলিয়া গৃহিণীর কর্ত্তব্য-পালন করেন; কিন্তু সে বেশ লক্ষ্য করিয়াছে, প্রবাসে— দেওঘরের মত স্থানে, আরও মেলা-মেশার যে সহজ সম্ভাবনা আছে, তাহার সম্বন্ধে যেন কিছু কৃপণতা চলিতেছে। কিন্তু কেন?

ললিতচন্দ্রের ললাটে চিন্তার রেখা সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল।

তাহার ব্যবহার কি ভদ্রজনোচিত শিষ্ট আচারের সীমা অতিক্রম করিয়াছে? নারী-জাতির প্রতি সহজ সম্ভ্রমবোধ—যাহা প্রত্যেক ভদ্রসন্তানের সহজাত সংস্কার, সে কি তাহার বিপরীত কোনও আচরণ করিয়াছে?

বেড়াইতে বাহির হইয়া সে চলিতে চলিতে বৈদ্যনাথজীর মন্দির সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল। এ-দিকে সে বড় একটা আসে না। দেবদর্শনের আগ্রহ বিশেষভাবে কোনও দিনই তাহার ছিল না। কি মনে করিয়া সে মন্দির-চত্বরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল? জুতা পায় দিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার নিয়ম নাই। সে নিকটবর্ত্তী একটি দোকানে জুতা রাখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

চিন্তা তখনও তাহার সমগ্র মানসরাজ্য আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। দেবতার প্রাঙ্গণে বহু দর্শনার্থী নর-নারীর ভিড়। কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে সে সেই ভিড় দেখিতে লাগিল। ভক্তকণ্ঠোত্থিত জয়ধ্বনি মন্দির-প্রাঙ্গণ অনুরণিত করিতেছিল। প্রত্যেকের আননে আগ্রহ ও ভক্তির একটা মধুর শ্রী সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

বেলা বাড়িতেছিল, সে দিকে ললিতচন্দ্রের কোন খেয়ালই ছিল না। সে প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া মন্দিরে প্রবেশোদ্যত এবং মন্দিরনির্গত নর-নারীগণকে দেখিতে লাগিল। তাহাদের মুখে ক্ষোভ, দুঃখ বা বিষাদের চিহ্ন নাই ত! দেবতা-দর্শনে সত্যই এমন শান্তি পাওয়া যায়?

হিন্দুর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও এ পর্য্যন্ত ললিত কখনও দেবতা-প্রীতি বা ঈশ্বর-ভক্তি সম্বন্ধে কোনওরূপ প্রেরণা তেমন ভাবে পায় নাই। বাল্যকালে দেব-দর্শন বা প্রতিমার নিকট সে প্রণাম করিয়া থাকিবে; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে পরিচয় আরম্ভের পর, সে কোনও দিন এমন ভাবের প্রেরণা অনুভব করে নাই। বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি কি সাধারণতঃ মানুষকে ঈশ্বর-বিশ্বাস-হীন করিয়া তুলে না? এমন ভাবের প্রশ্ন সতীর্থদিগের মধ্যে আলোচনার সূত্রে অনেকবার উঠিয়াছে, তাহা সে শুনিয়াছে। কিন্তু প্রতীচ্য শিক্ষাপদ্ধতির ছাপ, পিতামাতা, আত্মীয়-বান্ধবহীন জীবনে এমন অসঙ্কোচে গভীর হইয়া উঠিয়াছিল যে, এ সকল ব্যাপারে যাহারা অনুরাগী, তাহাদিগকে সে স্নায়বিক বিকারগ্রস্ত মানুষ বলিয়াই এত দিন উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

চিন্তা ভারাক্রান্ত মনে, বৈদ্যনাথজীর প্রাঙ্গণতলে সে যখন দাঁড়াইয়াছিল, তখন চারিদিগের আবেষ্টন তাহার চিত্তকে পীড়িত করিতে লাগিল। সত্যই কি ইহাতে মানুষ শান্তি পায়? যদি তাহা সম্ভবপর না হইত, তাহা হইলে সহস্র-সহস্র নর-নারী প্রত্যহ কেন দেবদর্শনে আসে? কে জানে?

"ডাক্তার বাবু মশাই, আপুনি?"

চমকিত হইয়া ললিত চাহিয়া দেখিল, নগ্নগাত্র, বলিষ্ঠদেহ ব্রাহ্মণ তাহার সম্মুখে হাস্যবদনে দাঁড়াইয়া। সে চিনিল, ইনি সুনীলের পাণ্ডা। ব্রাহ্মণের ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক। বলস্ফীত বাহুযুগল স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের দ্যোতক।

ললিতকে নিরুত্তর দেখিয়া পাণ্ডাজী বলিলেন, "বৈজনাথজীউর দর্শন হোবে ?"

ডাক্তার কি ভাবিয়া মন্দির-প্রবেশের ইচ্ছা প্রকাশ করিল। সে প্রত্যহ অভ্যাসমত ভোরবেলা স্নান সারিয়া লয়। এই প্রচণ্ড শীতেও প্রাতঃস্নান সে শেষ করিয়া লইয়াছিল। শীতের বস্ত্রগুলি সে খুলিয়া ফেলিল। পাণ্ডাজী তাহার পরিচিত ব্যক্তির নিকট বস্ত্রাদি জিম্বা করিয়া দিলেন।

ললিত তখন পাণ্ডাজীর হাতে একটা টাকা দিয়া পূজা দিবার অনুরোধ জানাইল। মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশের পর আজ তাহার মনের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে সে নিজেই এক একবার বিস্ময়বোধ করিতেছিল। পাণ্ডাজী পেঁড়া কিনিয়া আনিয়া ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিতে চলিলেন।

ললিত বলিল, "মন্দিরের মধ্যে কি খুব ভিড় আছ, পাণ্ডাজী ?"

"না ডাক্তার বাবু, মায়ীজীরা এক পাশে দাঁড়িয়ে পূজা-অর্চ্চনা করছেন। আপনার কুছু অসুবিধা হোবে না।"

পাণ্ডাজী ললিতকে পথ দেখাইয়া গর্ভগৃহের দিকে চলিল। মন্দিরদ্বারে জনতা অল্প নহে। কিন্তু দরজার কাছে যে পাণ্ডা দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি তখন কাহাকেও ভিতরে প্রবেশ করিতে দিতেছিলেন না।

ললিতকে সঙ্গে লইয়া পাণ্ডাজী উত্তরের ক্ষুদ্র দ্বারপথে গর্ভগৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রথমতঃ অন্ধকারে ললিত কিছুই দেখিতে পাইল না। বাতায়নবিহীন গর্ভগৃহের এক পাশে একটা প্রকাণ্ড প্রদীপের

আলো ঘনান্ধকারে যে ক্ষীণ দীপ্তি বিকীর্ণ করিতেছিল, তাহাতে মন্দিরমধ্যস্থ মানুষগুলিকে ছায়ামূর্ত্তি বলিয়া মনে হইতেছিল।

পুরোহিত-কণ্ঠে উদাত্ত ধ্বনিতে সুরে লয়ে ঝঙ্কৃত হইতেছিল—

"ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং—"

পূজার্থিগণ অনাদিলিঙ্গের উদ্দেশ্যে পুষ্প ও বিল্বপত্র অঞ্জলি দিতেছিল। অনেকের কণ্ঠে স্তবমন্ত্র উচ্চারিত হইতেছিল।

ললিতের মন সত্যই তখন এক বিচিত্র ভাবাবেশে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। পাণ্ডাজীর নির্দ্দেশমত সে মন্ত্রপাঠ করিয়া পুষ্পাঞ্জলি বৈদ্যনাথজীর উপর বর্ষণ করিতে লাগিল। অন্য কোনও দিকে তখন তাহার লক্ষ্য ছিল না। সে শুধু ধ্যানমগ্নচিত্তে আশুতোষের দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিল, পৃথিবীতে সে বড় অভাগা। তাহার ঐশ্বর্য্য, যশঃ, মান থাকিতেও সে অসুখী। হে অন্তর্য্যামি শঙ্কর, তাহার কামনা যেন সার্থক হয়—সে যেন এমন ভবঘুরে জীবনের দুঃখ-ভোগ হইতে পরিত্রাণ লাভ করে।

পাণ্ডাজী তাহাকে লিঙ্গমূর্ত্তির চারিপার্শ্বে পরিক্রমণের জন্য আহ্বান করিলেন। কিন্তু মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়া চলিবার প্রবৃত্তি তাহার ছিল না। সে আবিষ্ট চিত্ত লইয়া প্রধান দ্বারপথে পাণ্ডাজীর সহিত গর্ভগৃহ হইতে বাহিরে আসিল। তাহার অগ্রে ও পশ্চাতে বহু যাত্রী বাহির হইতেছিল।

সূর্য্যালোকিত প্রাঙ্গনে আসিয়া তাহায় শীতবোধ হইতে লাগিল। বাতাস জোরে বহিতেছিল। পাণ্ডাজীর নির্দ্দিষ্ট লোকটির নিকট হইতে সে গাত্রবস্ত্রাদি ফিরাইয়া লইয়া পরিধান করিল।

পাণ্ডাজী বলিলেন, "ডাক্তার বাবুর কুছ্ তক্‌লিফ ত হয় নি?"

না, সে ভালভাবেই দেবতা-দর্শন ও তাঁহার অর্চ্চনা করিয়াছে। সত্যই তাহার মনে একটা অহেতুক আনন্দ অনুভূত হইতেছিল। এতদিন সে কেন এখানে আসে নাই?

অস্ফুট স্বরে তাহার নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া ললিত পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল।

এ কি! বাড়ীর মেয়েরা সকলেই যে অদূরে দাঁড়াইয়া! পাণ্ডাজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাদের সঙ্গে। ললিত দেখিল, যমুনা পট্টবাস-পরিহিতা। সকলেই গরদ বা তসরের শাড়ী পরিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু আলুলায়িতকুন্তলা যমুনার সমগ্র মূর্ত্তিতে এমন একটা তন্ময়তা সে দেখিল যে, তাহাতে সত্যই ললিত বিস্ময় অনুভব করিল। কোনও দিকে তাহার দৃষ্টি নাই। বাহিরের কোলাহল অথবা বৈচিত্র্য সমস্তই যেন তাহার অন্তরের ধ্যান-মূর্ত্তিকে জাগ্রত করিবার চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

সুষমার দীর্ঘায়ত নয়নের দৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্য ললিতের উপর নিপতিত হইল। মণিমালাও তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল। সম্মুখেই মাসীমাতা ছিলেন। তিনি বলিলেন, "তুমিও বাবাকে দেখ্‌তে এসেছ না কি?"

ললিত একটু অপ্রতিভ হইল। সে এ পর্য্যন্ত কোন দিনই বৈদ্যনাথজীর মন্দিরে আসে নাই; তাহা বাসার সকলেই জানে। এসকল ব্যাপারে তাহার বিশেষ শ্রদ্ধা নাই, ত্রিকূটনাথের পূজার সময় সকলেই লক্ষ্য করিয়াছিল। মাঝে মাঝে সুশীলের সহিত

আলোচনা-প্রসঙ্গে তাহার মনের ভাবও প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল।

মণিমালা বলিল, "ডাক্তার বাবু এখানে আজ এসেছেন, এর চেয়ে অসম্ভব ব্যাপার আর কিছু নেই।"

অবশ্য সে সরাসরি ললিতকে লক্ষ্য করিয়া কথাটা বলে নাই। যেন সঙ্গিনীদিগকে উদ্দেশ করিয়াই বলিতেছিল। সুষমা শুধু একটু মৃদু হাসিল। যমুনা যে কথাটা শুনিতে পাইয়াছে, এমন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। সে শুধু মণিমালাকে বলিল, "বৌদি, এখন বাড়ী গেলে হয় না?"

"চল ভাই, যাই।"

সঙ্গে বৃদ্ধ দ্বারবান্ হিন্দপাল সিং ও সোনার মা ছিল। শীলা সঙ্গে আসে নাই। দল পশ্চিমের দ্বার দিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিল।

বড় পাণ্ডাজী বলিলেন, "ডাক্তার বাবু, আইয়ে।"

ললিত বলিল যে, সে আরও একটু ঘুরিয়া বাসায় ফিরিবে।

আসল কথা, সে উহাদের খুব প্রার্থনীয় সঙ্গী নহে, এমন একটা সন্দেহ বহুদিন হইতে ললিতের মনে ছায়াপাত করিয়াছিল। তাহার আত্ম-সম্মান কি সে ত্যাগ করিতে পারে?

মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশের পূর্ব্বে যে চিন্তাসূত্র অর্দ্ধপথে ছিন্ন হইয়াছিল, শিব-গঙ্গার দিকে চলিতে চলিতে আবার তাহার সূক্ষ্মতম তন্তু ধরিয়া তাহার মনে কল্পনার লীলা চলিতে লাগিল।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যমুনা, সুষমা আজই, এমন সময়ে দেব-

মন্দিরে আসিবে, ইহা ত সে ঘুণাক্ষরেও পূর্ব্বে জানিত না! সেও যে বৈদ্যনাথজীর মন্দিরে আসিবে, এমন কল্পনা পূর্ব্বমুহূর্ত্তেও তাহার মনে সমুদিত হয় নাই! অথচ কি অভাবনীয়রূপে সাক্ষাৎ! সেযখন দেবতার অর্চ্চনা করিতেছিল, সেই সময়ে যমুনা, সুষমা, মণিমালা, মাসীমাও অঞ্জলি দিতেছিলেন। অথচ সে কাহাকেও লক্ষ্য করিতে পারে নাই!

এমন হইল কেন? সে ত ভগবান্‌কে কোনও দিন ডাকে নাই—অবশ্য তাহা বলিয়া তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সে নিশ্চিন্তভাবে কোনও সন্দেহ কখনও প্রকাশ করে নাই—অথচ আজ তাঁহাকে হৃদয়মধ্যে অনুভব করিবার জন্য এমন ব্যাকুলতা আসিল কোথা হইতে? ইহা কি দুর্ব্বলতার লক্ষণ? সত্যই কি সে ক্রমেই অন্তরে দুর্ব্বল ও দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে?

বাস্তবিক অনেক দিন বৃথা আশায় সে এখানে কাটাইয়া দিল। ইহা হয় ত অন্যের আলোচ্য বিষয়ও হইয়া থাকিবে। সে কে? সুশীলের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ? সে চিকিৎসক এবং সুশীলের বাড়ীর কোন কোন ব্যক্তি তাহার রোগী। ইহা ছাড়া অন্য কোন সম্বন্ধই ত নাই! তবে, তবে কোন্ অধিকারে সে আর দেওঘরে থাকিতে পারে?

তাহার মনের কাঙ্গালপনা সত্যই কথা ও কাজে প্রকাশ পাইতেছে কি? যমুনার প্রতি তাহার তীব্র আকর্ষণ আছে, ইহা ধ্রুব সত্য। কিন্তু সে পক্ষ হইতে এ পর্য্যন্ত যখন কোনও অনুকূল ইঙ্গিতই প্রকাশ পাইল না, তখন আর এখানে থাকা শোভন হইবে কি?

শিবগঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়া সে দেখিল, অসংখ্য লোক স্নান করিতেছে, স্তোত্রপাঠ করিতেছে, তার পর দেবদর্শনে চলিয়াছে। এত দিন সে মানুষের এই ভক্তিকে মানসিক দুর্ব্বলতা বলিয়া মনে করিত। মানুষ তাহার মনের দুর্ব্বলতা গোপন করিবার অন্য পথ না দেখিয়া ভগবানের প্রতি, দেবতার প্রতি ভক্তি আখ্যা দিয়া চলিয়া আসিতেছে। মানুষ আপনার বুদ্ধি, বিবেচনা, জ্ঞান ও শক্তির প্রতি যখন বিশ্বাস হারায়, তখনই ভগবান্ বা ধর্ম্মের শরণাগত হইয়া পড়ে। প্রকৃত শক্তিমান কখনই তাহা করিবে না। ইহাই ছিল ললিতচন্দ্রের শিক্ষা। কিন্তু আজ অন্তরতম প্রদেশ হইতে সে যেন আর একটা নূতন বাণী শুনিতেছে—মানুষ অতি দুর্ব্বল, অতি অসহায়, তাহার কোন ক্ষমতাই নাই। ভগবান্ আছেন, তাঁহার উপর নির্ভর করিলে, একান্ত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রাখিলে, মানুষ কষ্ট পায় না, অসাধ্যসাধন করিতে পারে, গতকল্য একখানি পুস্তকে সে এই ভাবের কথা পড়িয়াছিল—আজ যেন অন্তর হইতে সেই বাণীই কে তাহাকে শুনাইতেছিল।

কাহার বাণী? কে সে? বিবেক? যদি তাহাই হয়, এত দিন এ বাণী সে শুনিতে পায় নাই কেন? আজই বা অকস্মাৎ অন্তরের রুদ্ধদ্বার মুক্ত করিয়া বিবেকের বাণী তাহাকে নূতন কথা শুনাইতেছে কেন?

সহসা মন্দিরের দৃশ্য তাহার মনে পড়িল। চেলাম্বরা তরুণীদের প্রত্যেকেরই মুখে অপূর্ব্ব দীপ্তি সে দেখিয়াছে, এমনও ত সহসা দেখিতে পাওয়া যায় না। হিন্দু-গৃহের শিক্ষিতা তরুণীরাও যে ধর্ম্মকে

আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকে, ঈশ্বরনির্ভরতা প্রতীচ্য শিক্ষার প্রভাবেও বিলুপ্ত হয় নাই, এই তিন জন আধুনিকাকে দেখিয়া তাহা সর্ব্বান্তঃকরণেই বিশ্বাস করিতে হয়। ধারাবাহিকভাবে যে বিশ্বাস, যে নির্ভরতা তাহাদের শোণিত-মজ্জায় ওতপ্রোত হইয়া আছে, ঈশ্বর-বিশ্বাস-হীন প্রতীচ্যশিক্ষা এখনও হিন্দুনারীকে সে প্রভাব হইতে হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই।

যমুনা, সুষমা, মণিমালা তিন জনেরই মুর্ত্তিতে কি অনির্বচনীয় শোভা সে দেখিয়াছে! বিশেষতঃ যমুনার কি বিচিত্র রূপই সে দেখিয়াছে। সুষমা? তাহারও আননে কি অপূর্ব্ব শোভাই না ফুটিয়া উঠিয়াছিল! না—কেহই কম নহে।

চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। সে দেখিল, বাসার ফটকের কাছেই সে আসিয়া পড়িয়াছে। বারান্দায় ও কে দাঁড়াইয়া? সুশীল বাবু? হাঁ, তিনিই ত! কাহার সঙ্গে কথা বলিতেছেন?

ললিত দ্রুত ফটক উত্তীর্ণ হইল।

আটাশ

"এ কি! মহারাজ, আপনি কবে এলেন? এই যে যতীন বাবুও এসেছেন!"

বাস্তবিক ললিত কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, মহারাজ ভবতোষ দেওঘরে আসিবেন এবং সুশীলের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিবেন।

প্রসন্নহাস্যে ভবতোষ বলিলেন, "কেন, আমার কি এখানে আসতে নেই নাকি, ডাক্তার?"

কুণ্ঠিতভাবে ললিত বলিল, "আজ্ঞে না, সে কথা বল্‌ছি না।"

যতীন্দ্রনাথ বলিল, "মহারাজের যে দেওঘরে বাড়ী আছে, তা দেখেন নি বুঝি, ডাক্তার বাবু? বাড়ী আছে, তবে দশ বছরের মধ্যে এখানে আসেন নি।"

ভবতোষ গড়গড়ার নল তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, "এবার তুমিই আমাকে এখানে টেনে এনেছ, যতীন ভাই!"

মহারাজ ভবতোষ অত্যন্ত তামাকু-ভক্ত। সুশীলচন্দ্রের দেওঘরের বাড়ীতে রৌপ্য-নির্ম্মিত গড়গড়া পিতার আমল হইতেই ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর উহা কদাচিৎ ব্যবহৃত হইত। তবে কোনও অতিথির সেবার জন্য ব্যবহারের প্রয়োজন হইতে পারে বলিয়া উহা ব্যবহারোপযোগী করিয়া রাখা হইত।

ভবতোষ বলিলেন, "সুশীল বাবুর সঙ্গে আগে আলাপ ছিল না, ডাক্তার। যতীনের বাড়ী ব'সে শুনলাম, সে এই দিকেই আস্‌ছে। তাই ভাবলাম, ওঁর সঙ্গে আলাপটা ক'রে যাওয়া যাক্।"

সুশীল বলিল, "এ আপনার মহানুভবতা, মহারাজ। আপনার পায়ের ধূলো—"

বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি ভবতোষ বলিলেন, "ঐটে বাদ দিন, সুশীল বাবু। মানুষের বাড়ী মানুষই যায়, মানুষের সঙ্গেই মানুষ আলাপ ক'রে থাকে। আমি যদি না আস্‌তাম, তবে সেটা আমারই অপরাধ হ'ত। যতীন আমার বাল্যবন্ধু, ভাই। তার সঙ্গে যাঁদের বন্ধুত্ব, তাঁরা ত আমার আপনজন।"

বেলা তখন এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। সুশীলচন্দ্র এত বেলায় মহারাজকে শুধু মুখে ফিরাইয়া দিতে নারাজ ছিল; কিন্তু আহারের কথা মুখ ফুটিয়া বলিবার সঙ্কোচ সে এড়াইতে পারিতেছিল না। ভবতোষ বোধ হয়, সে কথা অনুমানে বুঝিলেন। তিনি বলিলেন, "সুশীল বাবু, আজ বেলা হয়েছে এখন ওঠা যাক্।"

সুশীল তখন বলিয়া ফেলিল, "কিন্তু এত বেলায় হিন্দুর বাড়ী থেকে—"

উচ্চহাস্য করিয়া মহারাজ বলিলেন, "বুঝেছি। কিন্তু আমি ত বেশী দূরে নেই। পাঁচ মিনিটেই বাড়ী ফিরব। বেশ ত, এর পর এক দিন সুবিধামত, আমি এখানেই খাব। ও ব্যাপারে আমার লজ্জা বা সঙ্কোচ নেই, সুশীল বাবু! তবে যতীন ত নিরামিষাশী, ওকে নিয়ে একসঙ্গে আহার আর চল্‌লো না।"

মহারাজ তখনও প্রাণখোলা হাসি হাসিতেছিলেন।

সুশীল বলিল, "যতীন বাবুর সঙ্গে আমাদের আলাপ হ'ল কি ক'রে, সে খবর কি মহারাজ জানেন!"

"না। আমি ত ভাই তাই ভাবছিলাম, যে লোক মানুষের সঙ্গ এড়িয়ে চলতেই চায়, তার সঙ্গে আপনাদের এত মাখামাখি অল্পদিনের মধ্যেই কি ক'রে ঘটলো, তাই ভাবছি।"

সুশীল তখন সংক্ষেপে কিন্তু উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগে মেলার রাত্রির ঘটনা বিবৃত করিল। সে দিন এই বীর বাঙ্গালীর সাহায্য না পাইলে তাহার পত্নী ও সহোদরার ইজ্জৎ রক্ষা হইত না। সে জন্য সপরিবারে সুশীল যতীন বাবুর নিকট অনন্তকালের জন্য কৃতজ্ঞ হইয়া আছে।

ভবতোষ বলিলেন, "যতীন ভাই, এ কথা ত তোমার কাছে শুনিনি। কি একটা ব্যাপারে গোরা নাবিকদের সঙ্গে তোমার মারামারি হয়েছিল, এই কথাই বলেছিলে। ডাক্তার, তুমিও ত সেখানে ছিলে, তুমিও এত বড় ঘটনার কথা আমার কাছে চেপে গিয়েছিলে!"

ললিত আরক্ত-মুখে বলিল, "যতীন বাবু আমাকে বিশেষ ক'রে বারণ ক'রে দিয়েছিলেন। আমার অপরাধ নেবেন না, মহারাজ।"

যতীন্দ্রনাথ প্রশান্ত-মুখে বলিল, "ভদ্র ঘরের এ সকল কথা কি আলোচনার যোগ্য, মহারাজ? নানারকম কথা কি উঠতো না?"

"আবার মহারাজ! তুই কিছুতেই আমাকে তোর কাছে—তোর প্রাণের দ্বারে পৌঁছুতে দিবিনি, ভাই! আমাদের কাছে বাইরের খেতাব, জৌলুষ যেন না আসতে পারে। আমরা দুই বন্ধু ছেলেবেলা থেকে যে ভাবে বেড়ে উঠেছি, তার মাঝে আভিজাত্যের এই খোলস ভারী বে-মানান, যতীন! না, এবার যদি শুনি, সত্যি আমি রাগ করবো।"

মহারাজ ভবতোষের সমগ্র আননে একটা কোমল মধুর ভাবের ব্যঞ্জনা দেখিয়া সকলের মনে হইল, তিনি কেতাদুরস্তভাবে মামুলী বিনয় প্রকাশ করিতেছেন না। সমগ্র অন্তর দিয়া তিনি যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার কণ্ঠে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ অভিজাত সম্প্রদায়ের এক জন পুরোবর্ত্তী, মহাশয় ব্যক্তির এমন উদার, সরল এবং সঙ্কোচহীন মধুর ব্যবহারের সহিত সুশীলচন্দ্র পরিচিত ছিল না। কাজেই সে অত্যন্ত চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইল। এমন একজন মহানুভব ব্যক্তির সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্যলাভে সে আপনাকে ধন্য মনে করিল।

এমন সময় পরিচারক আসিয়া সুশীলচন্দ্রকে জনান্তিকে কি বলিয়া গেল। সে তখনই আসিতেছে বলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল পরমুহূর্ত্তে সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "মহারাজ, আপনার পরিচিত এক জন এখানে আছেন। তিনি আমার স্ত্রীর মাসীমা।"

ভবতোষ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সুশীলের পানে চাহিলেন। সুশীল বলিল, "পাটনার উকীল বিমল-দাকে আপনি চেনেন কি? তাঁরই মা।"

"ওঃ, বিমল-দার মা ? তিনি ত আমারও মা ! তিনি এখানে আছেন না কি ? বটে !"

ভবতোষের আনন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

"আর আমার ছোট বোনটি, সুষমা ? সেও আছে না কি এখানে ?"

"হাঁ, সবাই আছেন।"

"সুশীল বাবু, তবে ত আপনি আমার পরমাত্মীয়। আপনি জানেন না, বিমল-দা কত প্রিয়জন। যার কাছে আমি পাটনায় অনেকবার গিয়ে থেকে এসেছি। চলুন, মাকে দেখে আসি।"

শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ অভিজাত বংশের পুরুষরত্নটি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সুশীলচন্দ্র তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

মহারাজ ডাকিলেন, "এস যতু, তোমরাও এস।"

যতীন্দ্রনাথ তাঁহাদের অনুগামী হইল ; কিন্তু ললিতচন্দ্র প্রথমে পা বাড়াইয়াছিল। তার পর কি ভাবিয়া সে নিজের শয়নকক্ষের দিকে চলিয়া গেল।

ভবতোষ প্রবেশ করিয়াই উমাশশীকে দেখিতে পাইলেন।

"মা গো, আমি এসেছি।"

"এস বাবা, সব ভাল ত ? বৌমাকে সঙ্গে এনেছ ?"

"হ্যাঁ মা, সবাই এসেছেন। সুশীল বাবু আপনার জামাই, তা আগে জানতুম না, মা। আজ বড় আনন্দ বোধ হচ্ছে। হ্যাঁ, আমার বোনটি কোথায় ?"

"সে আসছে, বাবা। ঐ যে !"

আনন্দ-প্রফুল্ল আননে সুষমা ভবতোষের সম্মুখে নত হইয়া প্রণাম করিল। আশীর্ব্বচন দ্বারা সুষমাকে অভিষিক্ত করিয়া ভবতোষ বলিল, "দিদি আমার পণ্ডিত হয়ে ফিরেছ, বিমলদার পত্রে জেনেছি। বড় ভাল। হ্যাঁ রে, কত দিন তোকে দেখিনি বল ত, সুষি ?"

"দু'বছর আগে আপনি পাটনায় গিয়েছিলেন। তার পর আর দেখা হয়নি, দাদা।"

"ঠিক বলেছিস্। কিন্তু দু'বছর আমি পাটনায় যাইনি, সে কথাটা সত্যি নয়। তুই তখন সেখানে ছিলি না। প্রেম মহাবিদ্যালয়ে পড়ছিলি।"

এমন সময় মণিমালা ও তাহার পশ্চাতে যমুনা ধীরে ধীরে সেখানে আসিল। সম্ভবতঃ সুশীল ইতিমধ্যে তাহাদিগকে কোনও উপদেশ দিয়া আসিয়াছিল।

মণিমালা ও যমুনা প্রণাম করিতেই ভবতোষ যেন একটু তটস্থ হইয়া উঠিলেন।

সুষমা বলিল, "আমার দিদি, মণিমালা, সুশীল বাবুর স্ত্রী।"

"আর ইনি ?" বলিয়া যমুনার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিতেই, সুশীলচন্দ্র বলিল, "ওটি আমারই ছোট বোন, যমুনা।"

"দিদিমণীরা, তোমাদের সুস্থ দেহ, সুস্থ মন থাকুক। হিন্দুর মেয়ের সুস্থ মন নিয়ে সকলের কল্যাণ কর।"

যমুনা সত্যই বিস্মিত হইল। মণিমালারও মুখে বিস্ময়রেখা দেখা দিল। এমন ভাবের আশীর্ব্বচন তাহারা পূর্ব্বে শুনে নাই। সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন !. চমৎকার ! চমৎকার !

"মা, আমার সুষি দিদির বিয়ে দেওয়া দরকার।"

সুষমা অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। উমাশশী বলিলেন, "তোমরা একটা ভাল পাত্র দেখে দাও না, বাবা!"

কন্যার বিবাহের অনিচ্ছার কথা তিনি এ ক্ষেত্রে প্রকাশ করা সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না।

যমুনা তখন অন্য দ্বার দিয়া গৃহান্তরে চলিয়া যাইতেছিল। ভবতোষ একবার সে দিকে চাহিয়া দেখিলেন। সুষমা তখনও নতনেত্রে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ভবতোষ বলিলেন, "সুশীল বাবু, আপনার বোনের বিয়ে দেন নি এখনও?"

এ প্রসঙ্গে সকলেরই একটা অনির্ব্বচনীয় অস্বস্তি অনুভূত হইল।

সুষমা মৃদুস্বরে বলিল, "দাদাবাবু, যমুনার বিয়ে ত হয়েছিল!"

বুদ্ধিমান্ ভবতোষ আর প্রশ্ন করিলেন না। ভাগ্যহতা যমুনার সূক্ষ্ম সরুপাড় বস্ত্র, সিন্দূরবর্জ্জিত ললাট ও সীমন্তদেশ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল, এই বয়সেই যমুনার দাম্পত্য-জীবনের অবসান ঘটিয়াছে। তাঁহার সহৃদয় মন ইহাতে বিশেষভাবে বিচলিত এবং বেদনা-হত হইল। এই অপূর্ব্বদর্শনা তরুণী নারী কঠোর বৈধব্যব্রত পালন করিয়া চলিয়াছে। সে জন্য স্বভাবতই মানুষের মন আর্দ্র হইয়া উঠে।

উমাশশী বলিলেন, "বাবা, এত বেলায় গেরস্থর বাড়ী থেকে যেতে নেই।"

সুশীল বলিল, "আমিও সেই কথা বলেছি, মাসীমা!"

ভবতোষ বলিলেন, "আমরা ত পাশাপাশিই রয়েছি। এতে অতিথি ব'লে আমায় বোঝায় কি, মা? এর পর এক দিন খুব ভাল ক'রে খেয়ে যাব। আপনার হাতের সন্দেশ বড় চমৎকার! সে দিন তার ব্যবস্থা রাখবেন। আচ্ছা, আজ আসি।"

ভবতোষ বাহিরে চলিলেন। যতীন্দ্রনাথ ও সুশীল সঙ্গে সঙ্গে আসিল। বাহিরে আসিয়া ভবতোষ বলিলেন, "ডাক্তারটা কোথায় গেল? সে বড় লাজুক দেখ্‌ছি। মেয়েদের কাছে আস্‌তে তার লজ্জা এখনও বেশ আছে, না সুশীল বাবু?"

সুশীল মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

সম্ভবতঃ এ আলোচনা ললিতের কর্ণগোচর হইয়া থাকিবে। সে তাড়াতাড়ি শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইল।

"কি হে, ডাক্তার! তুমি সুশীল বাবু বাড়ী এত দিন রয়েছ, তবু তোমার দেখ্‌ছি স্বভাব বদলায় নি।"

ভবতোষ ফটকের দিকে অগ্রসর হইলেন। ললিতের মুখে সহসা কেহ যেন আবীর মাখাইয়া দিয়াছিল। কোনও উত্তর না দিয়া সে সকলের সঙ্গে ভবতোষের অনুসরণ করিল।

উনত্রিশ

সংক্ষিপ্ত পত্র, কিন্তু পড়িতে আরম্ভ করিয়াই তরুণী সুষমার মুখমণ্ডল ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। সে পত্রখানার বাকিঅংশ পড়িবে না বলিয়াই কোমল করপল্লবে উহা পিষ্ট করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই কি ভাবিয়া সে আবার পড়িতে আরম্ভ করিল,—

"মাননীয়াসু—

জানি, আপনাকে পত্র লিখিবার কোন অধিকার আমার নাই—উচিত নহে ; কিন্তু কিছু দিন হইতে অন্তরের মধ্যে কাঁটা খচ্-খচ্ করিয়া বিঁধিতেছে। সে দিন আমার অসভ্য ব্যবহারে আপনি হয় ত আরও বিরক্ত হইয়াছেন, তাই ক্ষমার অবসর খুঁজিতেছিলাম। কয়দিনের মধ্যে পাই নাই। সব কথা বিমলদাকে খুলিয়া লিখিয়াছিলাম। তিনি উত্তর দিয়াছেন, আমি সরাসরি সে ব্যবস্থা করিতে পারি। তাঁহার অনুমতি লইয়া আমি আপনার কাছে আমার কৃত ব্যবহারের জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। আশা করি, আপনার ন্যায় শিক্ষিতা এবং উচ্চহৃদয়া মহিলার নিকট হইতে ক্ষমা মিলিবে।

বিনয়াবনত

শ্রীললিত।"

সুষমার আনন হইতে বিরক্তি ও ক্রোধের রেখা ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতেছিল। পত্রপাঠ শেষ করিয়া সে কয়েক মুহূর্ত্ত কি ভাবিল।

ক্ষমা? কিসের ক্ষমা? সে হিন্দু শুদ্ধান্তঃপুরচারিণী নারী। পথের মাঝে তাহার সহিত আলাপ করিতে যাওয়া অপরাধ?

সুষমা ভাবিতে লাগিল।

হাঁা, অপরাধ বৈ কি। কোনও অপরিচিতা তরুণীর সহিত নির্জ্জন রাজপথে কোনও যুবকের—হিন্দু যুবকের আলাপ করিবার অধিকার থাকা উচিত নহে, তাহা সে জানে। কিন্তু ললিত বাবু কি সত্যই তাহার অপরিচিত?

কে বলিল? চারি বৎসর পূর্ব্বে—তখন সে উদ্ভিন্ন-যৌবনা, শরীরে ও মনে তখন যৌবনের জোয়ার লাগিয়াছে, সে সময় ত ললিত বাবুর সহিত তাহার অপরিচয় ছিল না! সত্য বটে, ঘনিষ্ঠভাবে বেশী আলোচনা করিবার অবকাশ কখনও ঘটে নাই। তবে রোগশয্যার পার্শ্বে তাহাকে অনুক্ষণ থাকিতে হইত, রোগীর পরিচর্য্যার অবকাশে মিষ্ট সান্ত্বনা-বাক্যও প্রয়োগ করিতে হইত। সুতরাং ললিত বাবুর সম্বন্ধে অপরিচয়ের অভিযোগ মোটেই খাটে না।

কিন্তু ললিত বাবু লিখিয়াছেন,—"আপনি হয় ত আরও বিরক্ত হইয়াছেন।" ইহার অর্থ কি? "আরও বিরক্তি" তাহার কবে হইয়াছিল? কৈ, সে কথা ত তাহার মনে পড়ে না!

সুষমা নিবিষ্টমনে ভাবিতে লাগিল।

ওঃ! তাহার সহিত ডাক্তার বাবুর বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল; কিন্তু তাহা ঘটে নাই। এমন প্রস্তাব ত অবিবাহিত নরনারী থাকিলেই হইয়া থাকে! যত সম্বন্ধ আসে, তাহার অনেকগুলিই ত পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। তাহার জন্য কোনও পক্ষের ক্ষোভের সম্ভাবনা কোথায়? তবে?

হাঁ, একটা কথা। সে যে অশিক্ষিতা। পাশ করা বিলাতযাত্রা প্রয়াসী ডাক্তার তাহার মত অশিক্ষিতা কন্যাকে বিবাহ করিতে পারেন না, এমনই ভাবের একটা কথা ডাক্তার বলিয়াছিলেন।

সত্য কথাই তিনি বলিয়াছিলেন। সে জন্য সুষমা ডাক্তারের উপর বিরক্ত হইবে কেন? কি অধিকারে সে এক জন বাহিরের ব্যক্তি, অনাত্মীয়ের উক্তি শুনিয়া অভিমান, দুঃখ বা ক্ষোভ প্রকাশ করিবে?

সুষমা ভাবিতে লাগিল।

না, সে কথা কি সত্য? সে অশিক্ষিতা. ভাবী বিলাত-প্রত্যাগত ডাক্তারের পত্নী হইবার যোগ্যতা তাহার ছিল না বলিয়া যে উপেক্ষা, তাহা কি সত্যই তাহার মনকে আহত করে নাই? সত্য যাহা, তাহাকে অস্বীকার করিয়া কোন লাভ নাই। সত্যই সে মনে মনে অপমানিত হইয়াছিল। সেই অভিমান, অপমানের আঘাত-ফলেই না সে প্রাণপণ যত্নে পরীক্ষায় পাশ করিয়াছিল—প্রেম মহাবিদ্যালয় হইতে দর্শনশাস্ত্রে উচ্চ উপাধি অর্জ্জন করিয়াছিল!

ললিত বাবু উচ্চশিক্ষিত, চিকিৎসক। তিনি বিবাহ করিবেন না, শুধু এই কথাটাই জানাইলে পারিতেন, তাহাতে কাহারও

কোনও কথা বলিবার থাকিত না। কিন্তু সে অশিক্ষিতা, তাঁহার গৃহিণী হইবার উপযুক্ত নহে বলিয়া সকলের মনে আঘাত দিবার কি প্রয়োজন ছিল?

যাক্, সে যাহা হইবার অনেক দিন চুকিয়া গিয়াছে। সুষমা সে কথা ত ভুলিয়াই গিয়াছিল।

সুষমার ওষ্ঠ-প্রান্তে মৃদু-হাস্য-রেখা উদ্ভাসিত হইল।

সত্যই কি এত বড় আঘাতের বেদনা সে বিস্মৃত হইতে পারিয়াছিল?

সে যে সকল উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান-সম্মত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছে, দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিয়াছে, তাহা হইতে কি এই সার সত্যটুকু সে অর্জ্জন করে নাই যে, যে বাক্য একবার উচ্চারিত হয়, যে চিন্তা একবার মনোরাজ্যে উদ্ভাসিত হয়, যে কার্য্য একবার অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কখনও মরে না? অনন্তকাল ধরিয়া নিখিল বিশ্বে তাহা অনাহত গতিতে চলিতে থাকে—চির-জাগ্রত থাকে? বাক্য অমোঘ, চিন্তা শাশ্বত, কর্ম্ম চিরন্তন?

দীর্ঘ চারি বৎসর ধরিয়া ললিত বাবু কি তাঁহার উচ্চারিত বাক্যকে তাই ভুলিতে পারেন নাই—তাই সেই অপমানের স্মৃতি তাঁহার মগ্ন চৈতন্যে জাগ্রত হইয়াছিল? তাই কি অবকাশ পাইয়া তাহা নূতন ভাবে, নূতন শক্তি সঞ্চয় করিয়া, নবরূপে প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে?

পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়া রৌদ্রালোকিত আকাশ দেখা যাইতেছে। দ্বিপ্রহরে সকলেই বিশ্রামতৎপর। পাশের ঘরে যমুনাও

হয় ত বই পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার জননী দিবা-নিদ্রার শান্তিটুকু প্রতিদিনই উপভোগ করেন। আজও তিনি নিশ্চিন্ত-মনে ঘুমাইতেছেন।

অবান্তর চিন্তাগুলি সুত্রের ধারা ধরিয়া এলোমেলোভাবে আনাগোনা করিতে লাগিল।

ললিত বাবু তাহাকে পত্র লিখিয়া সঙ্গত কার্য্য করিয়াছেন কি? দাদা না হয় অনুমতিই দিয়াছেন; কিন্তু নিঃসম্পর্কীয়া, কুমারী যুবতীর নিকট এক জন অপরিচিত যুবকের এমনভাবে লেখাও যে অনেকে সমর্থনযোগ্য বিবেচনা করেন না, বিশেষতঃ হিন্দু পরিবারে এরূপ ব্যাপার সত্যই অশোভন, ইহা ললিত বাবুর কি জানা নাই?

সুষমার আননে আবার বিরক্তির রেখা ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল।

না,—সে ললিত বাবুর বর্ত্তমান আচরণ কোনমতেই সমর্থন করিতে প্রস্তুত নহে। এরূপ ভাবে পত্র আদান-প্রদানের প্রশ্রয় সে কখনই দিবে না। অবশ্য সে দিন পথের উপর ললিত বাবু তাহার সহিত কথা বলিয়া যে বিশেষ কিছু অপরাধ করিয়াছিলেন, ইহা তাহার মনে হয় নাই। সে জন্য তাহার চিত্তবিক্ষোভও ঘটে নাই। কিন্তু আজ তিনি ভৃত্যের মারফতে অন্যের অগোচরে তাহাকে পত্র লিখিয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। এই ভাবে গোপনতার আশ্রয় গ্রহণের কি প্রয়োজন ছিল? তিনি যদি সোজা পথেই চলিতেন, কোন প্রকার সঙ্কোচবোধ যদি তাঁহার মনে উদিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভৃত্যের মারফতে পত্র না দিয়া,

সুশীল বাবু অথবা তাহার মার মারফতেও কথাটা জানাইতে পারিতেন।

পত্রের ভিতরের তাৎপর্য্য না জানিয়া যদি কেহ এই ভাবে পত্র প্রদানের কথা জানিতে পারিত, যদি তাহার মাতা, সুশীল বাবু বা মণিদিদি ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মনে সন্দেহ সঞ্চারিত হয় নাই কি?

না, এই পন্থা অতি কদর্য্য, অতি কুৎসিত। উদ্দেশ্য যতই সাধু হউক, প্রণালীটি অত্যন্ত অসঙ্গত ও অশোভন।

কিন্তু সে কি করিবে? এ ব্যবস্থার উপর তাহার ত কোন হাতই ছিল না। সে পূর্ব্বাহ্নে যদি জানিতে পারিত, তাহা হইলে প্রতীকারের হয় ত সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু—

নিদারুণ বিরক্তিতে সুষমার চিত্ত ভরিয়া উঠিল।

"জানালার ধারে ব'সে কি হচ্ছে, সুষি?"

চমকিতভাবে সুষমা ফিরিয়া চাহিল। মণিমালা দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়াছিল।

মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া সুষমা ডাকিল, "দিদি!"

ভগিনীর স্বভাবসিদ্ধ শান্ত কণ্ঠস্বরে উত্তেজনার আভাস পাইয়া বিস্মিতা মণিমালা ঘরের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

"এই চিঠিখানা প'ড়ে দেখ।"

মণিমালার হাতে সুষমা ললিতের পত্রখানা প্রদান করিল।

চিঠিখানা দুইবার আদ্যোপান্ত পড়িয়া মণিমালা ভগিনীর দিকে চাহিল।

সুষমা তখন জানালার দিকে মুখ করিয়া বাহিরের দিকে নিস্তব্ধভাবে চাহিয়াছিল।

মণিমালা কি ভাবিতেছিল, সে দিন ডাক্তার বাবু সুষমার সহিত কোথায় কি এমন ব্যবহার করিয়াছেন, যাহার জন্য অনুতপ্ত হইয়া তিনি সুষমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন?

"কি হয়েছিল রে, সুষি?"

দিদির প্রশ্নে সুষমা ফিরিয়া চাহিল।

মণিমালা ভগিনীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আবার সেই প্রশ্ন করিল।

সুষমা ধীরে ধীরে নির্জ্জন রাজপথের ঘটনাটি যথাযথভাবে বিবৃত করিল। কোনও কথা বাদ দিল না।

মণিমালা স্থিরভাবে সকল কথা শুনিয়া খানিক গুম্ হইয়া রহিল।

ললিত বাবু যমুনার প্রতি অনুরাগী, সে বিষয়ে তাহার মনে অণুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু ডাক্তার বাবুর আচরণে, সুষমার সম্বন্ধে ব্যবহারে তাহার মনে খটকা বাধিয়া গেল। সে চারি বৎসর পূর্ব্বের ঘটনার কথা মাসীমার নিকট শুনিয়াছে। পথের ধারে নিরালায়, তরুণ যুবক তরুণী নারীর নিকট—যুবতীর বিরক্তির কারণ জিজ্ঞাসা যে ঠিক অসঙ্গত, তাহা মনে করা যায় না, সত্য; কিন্তু তথাপি মণিমালা ব্যাপারটির স্বাভাবিকতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিল না। মনস্তত্ত্বঘটিত বিবিধপ্রকার উপন্যাস পাঠে মানুষের মনে মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঘাত-প্রতিঘাতের রহস্য মানুষকে একটু তত্ত্বান্বেষী করিয়া তুলে। তাই কি মণিমালা এই

ব্যাপারের অন্তরালে মগ্ন চৈতন্যের কোনও প্রেরণা আছে কিনা, তাহাই ভাবিতেছিল ?

"মা! মা !—"

শীলার কচি কণ্ঠের আহ্বান মণিমালাকে বাস্তবজগতে ফিরাইয়া আনিল। "সে বলিল, "তুই কি এ পত্রের জবাব দিবি ?"

দৃঢ়কণ্ঠে সুষমা বলিল, "নিশ্চয় না। ডাক্তার বাবু হিন্দু অন্তঃপুরের স্বাভাবিক অবস্থার প্রতি উদাসীন হ'তে পারেন ; কিন্তু আমরা তা কি পারি ?"

হাসিয়া মণিমালা বলিল, "ঠিক কথা। আচ্ছা, এখন চুপ-চাপ থাকা যাক। চিঠিখানা আমার কাছেই রইল।"

শীলা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "মা, ক্ষিদে পেয়েছে।"

"চল মা।"

মণিমালা কন্যার হাত ধরিয়া ঘরের বাহির হইল। যাইবার সময় সে আর একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, সুষমা বাতায়ন-পথে বাহিরের দিকেই চাহিয়া রহিয়াছে।

ধীরে ধীরে সে একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাঁড়ার ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

ত্রিশ

ভবতোষ রৌপ্য-নির্ম্মিত আলবোলার নল মুখ হইতে নামাইয়া স্মিতহাস্যে বলিলেন, "সুশীল বাবুটি চমৎকার লোক কিন্তু, যতীন। পরিবারটি বেশ সুখী এবং সাত্ত্বিকভাবাপন্ন, না, ভাই?"

যতীন্দ্রনাথ বলিল, "বাস্তবিক, সে কথা খুবই সত্য।"

একটু আন্‌মনা হইয়া ভবতোষ বলিলেন, "তবে বিধবা বোন্‌টির জন্য ভদ্রলোকের মনে একটু দুর্ভাবনা আছে ব'লে বোধ হ'ল!"

যতীন্দ্রনাথ বন্ধুর প্রতি সপ্রশ্ন দৃষ্টি সন্নদ্ধ করিয়া বলিল, "কেন, বল ত?"

ভবতোষ বিস্মিত বন্ধুর দিকে স্থির-দৃষ্টিতে চাহিলেন। তার পর বলিলেন, "যুবতী বিধবা বোনের জন্য দুর্ভাবনা হয় না?"

"কিসের দুর্ভাবনা! চিরদিন ভরণপোষণের ব্যবস্থা চালাতে হবে ব'লে? কিন্তু শুনেছি, যমুনার স্বামীর প্রচুর বিষয়সম্পত্তি আছে। পৈতৃক টাকাও যমুনা অনেক পেয়েছেন। তবে সে জন্য সুশীল বাবুর চিন্তার ত কারণ নেই!"

ভবতোষের আলবোলার নল ধূম উদ্গিরণ করিতেছিল। ধূমজালে তাঁহার মুখের সকল অংশ সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। কাযেই যতীন্দ্রনাথ বন্ধুর মুখমণ্ডলের ভাব-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারিল না।

মহারাজ অর্দ্ধ-নিমীলিতনেত্রে বাল্যবন্ধুর দিকে চাহিয়া বলিলেন,

"কিন্তু মেয়েটির অদৃষ্ট ভেবে দুঃখ হয় না? এত রূপ, এত গুণ, এই ভরা যৌবন; অভাগী দুই বছরের বেশী স্বামিসুখ ভোগ করতে পেলে না!"

যতীন্দ্রনাথ বলিল, "অবশ্যই দুঃখ হয়। কিন্তু স্বামীর সৌভাগ্য হ'তে বঞ্চিত মেয়ের সংখ্যা এ দেশে অল্প নয়। তাঁরাও দুঃখভোগ করছেন ত!"

ভবতোষ ঈষৎ উত্তেজিতস্বরে বলিলেন, "এ অবস্থা দেখে সত্যি মনে হয়—বালবিধবা বা অল্পবয়সে যারা বিধবা হয়, তাদের বিয়ে দেওয়া উচিত।"

যতীন্দ্রনাথ বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। তার পর মৃদুস্বরে বলিল, "মহারাজ, তুমি অদৃষ্ট বা কর্ম্মফল স্বীকার কর?"

ভবতোষ বলিলেন, "আমি হিন্দু, সুতরাং ওটা বেশী করেই মানি।"

ঈষৎ হাসিয়া যতীন্দ্রনাথ বলিল, "যার ভাগ্যে যেটা না থাকে, তাকে সে সৌভাগ্য ভোগ কেউ করাতে পারে?"

মহারাজ বলিলেন, "তোমার এ যুক্তি বিধবাদের বেলা যদি খাটাতে চাও, বিপত্নীকদের বেলা সার্থক ক'রে তুলতে পার?"

দৃঢ়স্বরে যতীন বলিল, "না, তা পারি নে। কিন্তু তাই ব'লে বিপত্নীকদের পুনরায় বিয়ে করাও মোটেই সমর্থন করতে পারি না। আমার বিশ্বাস, যারা দ্বিতীয়বার বিয়ে করে—পুরুষই হোক আর মেয়েই হোক—মনে প্রাণে তারা সুখী হ'তে পারে না।"

মহারাজ হাসিয়া বলিলেন, "না, ভাই, তোমার এ যুক্তি কিন্তু পৃথিবীতে খাটবে না। এই আমাদেরই দেশে ঢের পুরুষ, যখন

প্রাণসমা প্রিয়ার বিয়োগে, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার বিয়ে ক'রে পরম সুখে কালযাপন করছে, দেখা যাচ্ছে—যাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ আছে, তাদের বিধবারাও পত্যন্তর গ্রহণ ক'রে বেশ আনন্দে পুত্র-কন্যা নিয়ে ঘরসংসার করছে, তখন তোমার ও যুক্তি কেউ শুনবে না।"

যতীন হাসিয়া বলিল, "আমার যুক্তি ত আমি প্রচার করতে যাচ্ছি না। যা আমার মনের দৃঢ় বিশ্বাস, তাই বলেছি মাত্র। এখনও বলব; যাদের মধ্যে ভালবাসা হয়েছে, এমন দম্পতির এক জন ম'রে গেলে, অন্য জন দ্বিতীয় পত্নী বা দ্বিতীয় পতি গ্রহণ ক'রে কখনও অন্তরে সুখী হ'তে পারে না। দেহের সুখ মনের আনন্দ নয়, মহারাজ!"

"মানি ভাই! তোমার এ কথা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি। কিন্তু যে জন্য কথাটা পেড়েছি, তা তোমায় বলতে পারি কি?"

যতীন্দ্রনাথ সবিস্ময়ে বলিল, "আজ বাল্যবন্ধুর সঙ্গে তুমি এমন ক'রে কথা বলছ কেন, মহারাজ!"

ভবতোষ বলিলেন, "তুমি কিছু মনে করো না, ভাই। ওটা কথার মাত্রা হিসাবে বলেছি।"

মহারাজ ভবতোষ নিমীলিত-নেত্রে এক মিনিট ধূমপান করিলেন। তার পর সহসা সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, "আমি সুশীল বাবুর কাছে শুনেছি, তাঁর বোন্‌টিকে তিনি আবার বিয়ে দিতে চান। যমুনাকে তিনি যে রকম স্নেহ করেন, তাতে তাঁর পক্ষে এ রকম সিদ্ধান্ত করা অস্বাভাবিক নয়? হিন্দুশাস্ত্রে বিধবা-

বিবাহ আছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রমাণ ক'রে গেছেন। প্রচলিত সংস্কার বা প্রথার বাধা সুশীল বাবু লঙ্ঘন করতে চান। তাই আমার পরামর্শ তিনি জানতে চেয়েছিলেন।"

ভবতোষ থামিয়া গেলেন। বন্ধুর দিকে স্থিরদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি চাহিয়া রহিলেন।

যতীন্দ্রনাথ অন্য দিকে চাহিয়া কথাটা শুনিতেছিল। বন্ধুকে নীরব হইতে দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল, "তা সুশীল বাবুর ঘরোয়া ব্যাপারে আমার কি সংস্রব, বন্ধু?"

ভবতোষ বলিলেন, "আমি ভেবেছিলুম, হয় ত তোমার সংস্রব থাকতে পারে। কারণ, তুমিও সুশীল বাবুর পরিবারবর্গের হিতাকাঙ্ক্ষী।"

মৃদু হাসিয়া প্রশান্তকণ্ঠে যতীন্দ্রনাথ বলিল, "সে কথা মানি। সুশীল বাবুর পরিবারবর্গ যাতে সুখী হন, আনন্দে থাকেন, এ কামনা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ক'রে থাকি। কিন্তু তিনি তাঁর বোনের আবার বিয়ে দিতে চান, তাতে আমার মতামতের কোন প্রয়োজন আছে বলে ত আমার মনে হয় না!"

ভবতোষ বলিলেন, "আমার সব কথা বলা হয়নি। আর একটু বল্‌লে তুমি সব বুঝতে পারবে। আমাদের ললিত ডাক্তার সুশীল বাবুর বিধবা ভগিনীকে বিয়ে করতে খুব রাজি বলেই মনে হয়। অন্ততঃ সুশীল বাবুর ধারণা যে, ললিতের পক্ষ থেকে কোন আপত্তি আসা দূরে থাকুক, বরং সাগ্রহেই সে রাজি হবে। সামাজিক সমস্যাকে ললিত বিশেষ গ্রাহ্য করে, আমারও এমন ধারণা নেই।

অবশ্য আমি যখন হিন্দু এবং শাস্ত্রবিশ্বাসী, তখন আমি সমাজ-বিরোধী কোন কায করাকে বাহাদুরী ব'লে মনে করিনে। কিন্তু যমুনার ব্যাপার আমাকেও বিচলিত ক'রে তুলেছে, বন্ধু, সে কথা আমি অস্বীকার করতে পারিনে।"

যতীন্দ্রনাথ দেখিল, ভবতোষের সদাপ্রফুল্ল মুখে একটা গভীর উত্তেজনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে বলিল, "যমুনা কি বিবাহে সম্মত? ললিত বাবু যদি রাজি থাকেন, তাঁকে বিবাহ করতে কি যমুনার আগ্রহ আছে?"

ভবতোষ বলিলেন, "ঐখানেই ত সমস্যা। আজ পর্য্যন্ত সে কথা যমুনার কাছে কেউ জিজ্ঞাসা করতে সাহস করেনি। পুনরায় বিবাহের তার আদৌ মত আছে কি না, সে কথা জানবার বিশেষভাবে চেষ্টা হয়নি। বাড়ীর সকলে শুধু তার কার্য্যকলাপ লক্ষ্য ক'রে চলেছেন। কোন কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি তার শ্রদ্ধাবুদ্ধির পরিচয় জানা গেলে তবে তাঁরা তার অভিমত জানবেন।"

ভবতোষ আবার কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। যতীন্দ্রনাথও নীরবে বসিয়া রহিল।

দুই একবার আলবোলার নলে টান দিয়া মহারাজ বলিলেন, "দেখ, ললিত ডাক্তার কি বল্ছিল জান?"

"কি?"

"তাকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম। সে স্পষ্টই স্বীকার করেছে, সুশীল বাবুর বিধবা সহোদরাকে সে পত্নীরূপে পেলে নিজেকে ধন্য মনে করে। কিন্তু প্রায় তিন সপ্তাহ সে এখানে আছে, এর মধ্যে এক

দিনও আশ্বাস পাবার মত কোন লক্ষণই দেখ্‌তে পায়নি। এক বাড়ীতে থাকা সত্ত্বেও মেয়েটি তাকে সকল রকমে এড়িয়ে চলে। তাই এখন সে হতাশ হয়ে পড়েছে। অবশ্য তার মনের কথা সে প্রথমে আমাকেও বল্‌তে চায়নি। তবে আমি নানা কৌশলে তার মনের ভাবটা জেনে নিয়েছি। সে কি বলে জান ?"

যতীন্দ্রনাথ বন্ধুর দিকে চাহিয়া কথাটা শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

ভবতোষ বলিলেন, "ললিত শুধু ডাক্তার নয়, ভাবুকও বটে। মনস্তত্ত্বের দিকটাও সে অনুশীলন করেছে বুঝলুম। সে বলে যে, সুশীলের ভগিনী তাকে যেমন সর্ব্বপ্রযত্নে এড়িয়ে চলে, তেমন ভাবে তোমাকে এড়িয়ে চলে না। বরং ঠিক উল্টা। ললিতের ধারণা, তোমাকে তার ভাল লাগে এবং তুমিও—"

যতীন্দ্রনাথ বাধা দিয়া বলিল, "ললিত বাবু মনস্তত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়ে তার গোলকধাঁধায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, দেখছি। কিন্তু ভদ্রঘরের বিধবা মেয়ের সম্বন্ধে তাঁর এই রকম অহেতুক কৌতূহল এবং মন্তব্য শুনে আমি তাঁর রুচির প্রশংসা করতে পারলাম না, মহারাজ!"

ভবতোষ বুঝিলেন—যতীন্দ্রনাথ কিছু বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি সহসা বলিলেন, "না হে, আমি পীড়াপীড়ি করাতেই সে অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে তার মত ব্যক্ত করেছে। এতে তার দোষ কিছু নেই, ভাই!"

যতীন্দ্রনাথ দৃঢ়স্বরে বলিল, "ভদ্রঘরের মেয়ের সম্বন্ধে আমার নিজের কোন বক্তব্য নেই, মহারাজ। তুমি ত জান, এ সকল ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় এবং রুচি আমার নেই।"

মহারাজের মুখমণ্ডল ঈষৎ গম্ভীর হইল। তিনি আর কোন কথা বলিলেন না।

এমন সময় অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিয়া সতু ডাকিল, "বাবা!"

যতীন্দ্রনাথ পুত্রকে কাছে ডাকিল। সে তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, "জ্যেঠীমাকে প্রণাম করেছিলে, সতু?"

বালক মাথা নাড়িয়া জানাইল, সে প্রণাম করিয়াছে।

ভবতোষ বলিলেন, "সতুকে স্কুলে দিয়েছ, যতীন?"

"না, ভাই! আমি নিজেই ওকে বাড়ীতে পড়াই। আর একটু বড় হোক্, তখন স্কুলে দেওয়া যাবে। তাই ঠিক নয়?"

"খুব ভাল কথা। তবে একা একা ওর একটু কষ্ট হয় বোধ হয়?

বালক সতু বলিয়া উঠিল, "আমার ত কষ্ট হয় না। আমি রোজ মাসীমার কাছে অনেকক্ষণ থাকি। শীলার সঙ্গে খেলা করি।"

ভবতোষ বলিলেন, "মাসীমা কে, যতীন?"

যতীন্দ্রনাগ সহজ কণ্ঠে বলিল, "সুশীল বাবুর বোন্‌কে ও মাসীমা ব'লে ডাকে। তাঁর কাছে রোজই তিন চার ঘণ্টা থাকে। সুশীল বাবুর মেয়ে শীলার সঙ্গে খেলা করে। সুশীল বাবুর বাড়ীর মেয়েরা সতুকে বড় স্নেহ করেন।"

সতু উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বাবা, মাসীমার কাছে যাব। তিনি যা আমায় ভালবাসেন! শীলাও!"

ভবতোষ কোন কথা বলিলেন না। অন্যমনস্কভাবে তিনি কি ভাবিতে লাগিলেন।

একত্রিশ

সন্ধ্যার পর বেড়াইয়া আসিয়া যমুনা মহাভারত লইয়া বসিল। উমাশশী আসিবার পর হইতে যমুনা আবার নূতন করিয়া রামায়ণ-মহাভারত পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। রামায়ণ শেষ হইবার পর মহাভারত কয়দিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ঘণ্টাখানেক সে সন্ধ্যার পর এই ভাবে পড়িত। উমাশশী, সুষমা এবং মণিমালা পাঠের সময় উপস্থিত থাকিত। যমুনার কণ্ঠস্বর যেমন মধুর ছিল, তাহার আবৃত্তির ভঙ্গীও ছিল সুন্দর।

আজ সাবিত্রী-সত্যবানের উপাখ্যানাংশ আরম্ভ হইয়াছিল। যমুনা সমগ্র অন্তর দিয়া এই পবিত্র কাহিনী পাঠ করিতেছিল। হিন্দু নারীর কাছে সাবিত্রীর কাহিনী শুধু আদরণীয় নহে, অতি পুণ্য অবদানপূত এবং অনুকরণীয়।

মার কাছে বাল্যকালে যমুনা মহাভারত পড়িতে শিখিয়াছিল। জ্ঞানসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-চর্চ্চা এবং বিদ্যার্জ্জনের স্পৃহা যতই বর্দ্ধিত হইয়াছিল হিন্দুর এই দুইখানি পুরাণেতিহাস—রামায়ণ ও মহাভারতকে সে আরও শ্রদ্ধাপূর্ণ অন্তরে পুনঃ পুনঃ পাঠ করিত।

সাবিত্রী যখন পিতৃনির্দ্দেশে স্বামীর সন্ধানে বাহির হইয়া সত্যবানের গুণগ্রামে মুগ্ধা হইয়াছিলেন, তাঁহারই হস্তে আপনার নারী-জীবনকে সমর্পণ করিবেন বলিয়া পিতার কাছে নিবেদন

করিয়াছিলেন; সত্যবান যে অল্পায়ু, তাহা কেহ জানিতেন না। দেবর্ষি নারদ যখন সে কথা প্রকাশ করিয়া দিলেন, তখন স্নেহময় পিতৃহৃদয় ব্যাকুল লইয়া উঠিল। কন্যাকে অন্য পতি বাছিয়া লইতে রাজা অনুরোধ করিলেন। সাবিত্রী নম্রমধুর, দৃঢকণ্ঠে পিতাকে জানাইলেন, হৃদয় একবারই দান করা যায়। দানের জিনিষ ফিরাইয়া অন্যকে অর্পণ করা যায় না। পিতা কি তাঁহার কন্যাকে দ্বিচারিণী হইতে পরামর্শ দিবেন?

যমুনার কণ্ঠে যেন বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বের সাবিত্রীর বাণীই ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। হিন্দুনারীর সনাতন, শাশ্বত উক্তি সমগ্র বাতাসকে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের স্পন্দনে উচ্ছ্বসিত করিয়া ঘরের মধ্যে অনুরণিত হইতে লাগিল।

মণিমালা ননন্দার মুখের পানে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়াছিল। হাঁ, হিন্দুনারী ছাড়া এই কথা অন্যত্র এ পর্য্যন্ত উচ্চারিত হয় নাই। সেও হিন্দুনারী, হিন্দু-স্ত্রী—তাহার সমস্ত অন্তর সাবিত্রীর যুক্তি এবং উক্তিকে সমর্থন করিল।

সুষমা একমনে উজ্জ্বল আলোকাধারের দিকে চাহিয়াছিল। তাহার অন্তরও এই বহু-শ্রুত সনাতন উক্তিকে পুনরায় সশ্রদ্ধভাবে উপলব্ধি করিয়া তাহার আয়তলোচনপথে যেন প্রকাশ পাইতে চাহিল।

উমাশশী বলিলেন, "কি মেয়েই জন্মেছিলেন সাবিত্রী।"

যমুনা তখন পাঠ বন্ধ করিয়া কি চিন্তা করিতেছিল। তাহার দৃষ্টি যেন কোনও স্বপ্নলোকে মূর্চ্ছিত হইয়াছিল, উমাশশীর কথায় সে

বলিয়া উঠিল, "সাবিত্রী কি চিরন্তনী হিন্দুনারীর আদর্শ নন, মাসীমা ?"

মণিমালা হাসিয়া বলিল, "ঠাকুরঝি যখন কোন বড় বিষয় নিয়ে কথা বলে, তখন ওর বলবার ভাষাও যেন আর এক রকম হয়, নয় কি সুষি ?"

সুষমা এতক্ষণ নীরব ছিল। সে বলিয়া উঠিল, "কিন্তু দিদি, সই যে কথাটা বল্‌তে চেয়েছে, তার ভাষা ওর চেয়ে হাল্‌কা হ'লে মানাত না।"

উমাশশী বলিলেন, "ওরে, তোরা থাম্। যমুনা মা যে কথাটা বলেছে, তার সবটাই সত্যি। সাবিত্রীর আদর্শ হিন্দুর মেয়েদের চোখের সাম্‌নে সেই কোন্ যুগ হতে জ্বল্-জ্বল ক'রে জ্বলছে। যে দিন এ দেশের মেয়েরা এ আদর্শ ভুলে যাবে—সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তীর অগাধ স্বামিপ্রেমের মহিমা বুঝবার শক্তি হারিয়ে ফেল্‌বে, সে দিন আর কিছু থাক্‌বে না, মা !"

বলিতে বলিতে উমাশশীর কণ্ঠ গাঢ় হইয়া আসিল। তাঁহার নয়নযুগল সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

এক পার্শে বসিয়া সোণার মা মহাভারত পড়া নিবিষ্টমনে শুনিতেছিল। সে বলিয়া উঠিল, "হেই, মাসীমা ! এমন পুণ্যি কাযের কথা কেউ ভুলতে পারে না। আমার মুখ্যু মানুষ, আমরাও তাঁদের কথা মেনে চলি।"

এমন সময় বাহিরে শব্দ হইল, "মা কোথায় ? সুষি দিদি কৈ গো ?"

কণ্ঠস্বর সুপরিচিত। মহারাজ ভবতোষ সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে আসিয়া পড়িলেন। তাঁহার পশ্চাতে এক নারীমূর্ত্তি।

বাড়ীতে তখন পুরুষ কেহ ছিল না। সুশীল ও ললিত বেড়াইয়া ফিরে নাই।

উমাশশী তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তরুণীরাও ছুটিয়া আসিল।

উমাশশী মহারাণীর হাত ধরিয়া সমাদরে ঘরের মধ্যে লইয়া গেলেন। এই মহা অভিজাতবংশের রাণী আজ তাঁহাদের গৃহে বেড়াইতে আসিয়াছেন, ইহা অভিনব ব্যাপার। কিন্তু ভবতোষের কাছে অভিনব বলিয়া কোন ব্যবস্থা ছিল না। তিনি এ সকল ব্যাপারে গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ করিতেন না।

মহারাণী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই সুষমাকে বলিলেন, "চিন্‌তে পার, ভাই!"

সুষমা ইতিপূর্ব্বে দুই একবার মহারাণী বিভাবতীকে দেখিয়াছিল। পাটনায় একবার ভবতোষ সস্ত্রীক দুই মাস ছিলেন। তখনই সে তাঁহার পাটনার প্রাসাদে গিয়া মহারাণীর সহিত পরিচিত হইয়াছিল। এই সুদর্শনা, বুদ্ধিমতী মহারাণীর সহিত আলাপ-পরিচয়ে সে এতই বিমুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাঁহার স্মৃতি সে কোনও দিন ভুলিতে পারে নাই।

মহারাজ বলিলেন, "এতক্ষণ কি হচ্ছিল, দিদিরাণীরা?"

সুষমা, যমুনা ও মণিমালা এই দম্ভ-অহঙ্কার-বর্জ্জিত ব্রাহ্মণ মহারাজের চরণতলে নত হইয়া পদধূলি গ্রহণ করিল।

সুষমা বলিল, "যমুনা মহাভারত পড়ছিল, আমরা শুনছিলাম।"

"বটে! বটে! যমুনা দিদি মহাভারত পড়তে বড় ভালবাসেন বুঝি? তা তোমাদের পড়ায় বাধা দিলাম। আচ্ছা, আমাকে এখানে বস্‌তে দেবে ত? তুমি পড় দিদি, আমরাও একটু শুনি। মহাভারত আমার বড় প্রিয়।"

যমুনা প্রথমতঃ একটু সঙ্কোচ অনুভব করিল। কিন্তু ঐ সদানন্দ পুরুষের ব্যবহার ও আত্মীয়তায় সেও মুগ্ধ হইয়াছিল। সকলে আসনে উপবেশন করিলে, সে লজ্জা-নম্র-কণ্ঠে সাবিত্রীর কাহিনী পড়িয়া যাইতে লাগিল। বেদব্যাসের রচিত সংস্কৃত শ্লোকচ্ছন্দে বর্ণিত বিষয় পড়িয়া সে বাঙ্গালায় তাহা ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিল। প্রথমটা সঙ্কোচ অনুভূত হইয়াছিল, খানিকটা পড়া হইবার পর, তাহার সে সঙ্কোচভাব চলিয়া গেল। স্থান-কাল-পাত্র ভুলিয়া গিয়া সে যেন কথকের স্থান অধিকার করিয়া মহাভারতের এই অমৃতময়ী কাহিনী বলিয়া যাইতে লাগিল।

তপস্যাক্লিষ্টা, ধ্যানপরায়ণা সাবিত্রী শ্বশুরালয়ে বাক্‌সংযম করিয়া শ্বশ্রূ, শ্বশুর ও স্বামীর পরিচর্য্যায় নিরত। এক বৎসর পরে সত্যবান্ কালের আহ্বানে চলিয়া যাইবেন। সতী তাহা প্রতিরোধের জন্য একনিষ্ঠ তপস্যা করিয়া চলিয়াছেন। কেহ এই সংবাদ অবগত নহে। সতী অনুক্ষণ সতর্ক দৃষ্টিতে স্বামীর পরিচর্য্যা করিয়া চলিয়াছেন। বেদব্যাসের এই পবিত্র কাহিনী পাঠের সময় যমুনার প্রতি ভবতোষ, নিবিষ্ট-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, ধ্যাননিরতা সাবিত্রীর মূর্ত্তি কল্পনার আলোকপাতে

মানুষকে দেখিতে হয়; কিন্তু তাঁহার সম্মুখে এই যে তরুণী একাগ্রভাবে সাবিত্রীর কাহিনী পড়িয়া চলিয়াছে, তাহার মূর্ত্তিতে যেন সত্যযুগের সাবিত্রীর দীপ্তি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কণ্ঠস্বরে যে প্রগাঢ় তন্ময়তার ঝঙ্কার উঠিতেছে, তাহা অনন্যশ্রুত। সত্যই তিনি কোনও মানব-মানবীর কণ্ঠে এমন সুর-ঝঙ্কার কখনও শুনেন নাই।

শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই মুগ্ধভাবে সত্যবান্ ও সাবিত্রীর কথামৃত পান করিতেছিল। মহাকালকে পরাজিত করিয়া আদর্শ-সতী, আদর্শ-নারী যখন সত্যবানের প্রাণ ফিরাইয়া আনিলেন, অন্ধ শ্বশুর দৃষ্টিলাভ করিয়া অপহৃত রাজ্য লাভ করিলেন, দিকে দিকে আদর্শ-নারীর মহিমা বিঘোষিত হইল, তখন যমুনা পাঠ সাঙ্গ করিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত সমগ্র কক্ষ যেন স্তব্ধভাবে সেই বিজয়িনী নারীশক্তিকে উপলব্ধি করিতে লাগিল। নাই! নাই! পৃথিবীতে এমন নারী কোনও যুগে জন্মগ্রহণ করে নাই। কিন্তু নারীজাতি, হিন্দুনারী সেই স্মরণাতীত যুগ হইতে এই মহাশক্তিময়ী নারীর মহিমা উপলব্ধি করিয়া তাঁহারই সান্নিধ্যলাভের চেষ্টা করিতেছে।

মহারাজ ভবতোষ গাঢ়স্বরে বলিলেন, "যমুনা দিদি, তোমার পড়া শুনে আজ আমার মার কথা মনে হচ্ছে। তিনি রোজ আমাকে মহাভারত প'ড়ে শোনাতেন। আজ থেকে তুমি দিদির পদ থেকে আমার কাছে মার আসন পেলে।"

কক্ষস্থ সকলেই ভবতোষের ভাববি[illegible] বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

যমুনার মুখ আরক্ত হইল।

বত্রিশ

উমাশশী বার বার পুত্রের পত্র পাঠ করিলেন।

বিষয়টা বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিবার। এক দিন যাহাকে জামাতৃরূপে পাইবার আগ্রহ তাঁহার মনে জাগিয়াছিল, সে ব্যক্তি অনায়াসে তাঁহার কন্যাকে উপেক্ষা করিয়াছিল। অবশ্য এ কথা সত্য, বিবাহযোগ্যা কন্যা থাকিলে অনেক সম্বন্ধই আসে; প্রত্যাখ্যানের অপমান সহ্য করিতেই হয়। কিন্তু সে কথা নহে। শিষ্টাচারে কন্যার অযোগ্যতাকে বিদ্রূপাত্মকভাবে ব্যাখ্যা না করিয়াও প্রত্যাখ্যান করাই বিধি। ভদ্রসমাজে সেই ব্যবস্থাই প্রচলিত। শিষ্টাচার সভ্য মানুষ ভুলিবে কেন?

তাঁহার কন্যা আধুনিক যুগের উপযোগী পরীক্ষা তখন পাশ করে নাই। সে কথা ত সকলেই জানিত। কিন্তু যেহেতু আমি উচ্চশিক্ষিত, এমন অল্পশিক্ষিতা আমার যোগ্য নহে, এমন ভাবের মন্তব্য কি মানুষের আত্মসম্মান-জ্ঞানকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে না? উমাশশী কি সে দিন গভীরভাবে আহত হন নাই?

পুত্র বিমলচন্দ্র চারি বৎসর পরে আজ আবার ললিত ডাক্তারের সহিত সুষমার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছে। সব কথা স্পষ্টভাবে লেখে নাই। সে শীঘ্রই আসিয়া—আলোচনার পর ব্যবস্থা করিবে।

সুষমা এখন সুশিক্ষিতা বলিয়া ললিত ডাক্তার হয় ত রাজি [illegible] পারে: কিন্তু উপযাচক হইয়া বিমল আবার তাহার কাছে [illegible] কুণ্ঠা অনুভব করিল না? তিনি কন্যার জননী।

মানুষকে দেখিতে হয়; কিন্তু তাঁহার সম্মুখে এই যে তরুণী একাগ্রভাবে সাবিত্রীর কাহিনী পড়িয়া চলিয়াছে, তাহার মূর্ত্তিতে যেন সত্যযুগের সাবিত্রীর দীপ্তি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কণ্ঠস্বরে যে প্রগাঢ় তন্ময়তার ঝঙ্কার উঠিতেছে, তাহা অনন্যশ্রুত। সত্যই তিনি কোনও মানব-মানবীর কণ্ঠে এমন সুর-ঝঙ্কার কখনও শুনেন নাই।

শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই মুগ্ধভাবে সত্যবান্ ও সাবিত্রীর কথামৃত পান করিতেছিল। মহাকালকে পরাজিত করিয়া আদর্শ-সতী, আদর্শ-নারী যখন সত্যবানের প্রাণ ফিরাইয়া আনিলেন, অন্ধ শ্বশুর দৃষ্টিলাভ করিয়া অপহৃত রাজ্য লাভ করিলেন, দিকে দিকে আদর্শ-নারীর মহিমা বিঘোষিত হইল, তখন যমুনা পাঠ সাঙ্গ করিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত সমগ্র কক্ষ যেন স্তব্ধভাবে সেই বিজয়িনী নারীশক্তিকে উপলব্ধি করিতে লাগিল। নাই! নাই! পৃথিবীতে এমন নারী কোনও যুগে জন্মগ্রহণ করে নাই। কিন্তু নারীজাতি, হিন্দুনারী সেই স্মরণাতীত যুগ হইতে এই মহাশক্তিময়ী নারীর মহিমা উপলব্ধি করিয়া তাঁহারই সান্নিধ্যলাভের চেষ্টা করিতেছে।

মহারাজ ভবতোষ গাঢ়স্বরে বলিলেন, "যমুনা দিদি, তোমার পড়া শুনে আজ আমার মা'র কথা মনে হচ্ছে। তিনি রোজ আমাকে মহাভারত প'ড়ে শোনাতেন। আজ থেকে তুমি দিদির পদ থেকে আমার কাছে মার আসন পেলে।"

কক্ষস্থ সকলেই ভবতোষের ভাববিহ্বল মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

যমুনার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল।

বত্রিশ

উমাশশী বার বার পুত্রের পত্র পাঠ করিলেন।

বিষয়টা বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিবার। এক দিন যাহাকে জামাতৃরূপে পাইবার আগ্রহ তাঁহার মনে জাগিয়াছিল, সে ব্যক্তি অনায়াসে তাঁহার কন্যাকে উপেক্ষা করিয়াছিল। অবশ্য এ কথা সত্য, বিবাহযোগ্যা কন্যা থাকিলে অনেক সম্বন্ধই আসে; প্রত্যাখ্যানের অপমান সহ্য করিতেই হয়। কিন্তু সে কথা নহে। স্পষ্টাক্ষরে কন্যার অযোগ্যতাকে বিদ্রূপাত্মকভাবে ব্যাখ্যা না করিয়াও প্রত্যাখ্যান করাই বিধি। ভদ্রসমাজে সেই ব্যবস্থাই প্রচলিত। শিষ্টাচার সভ্য মানুষ ভুলিবে কেন?

তাঁহার কন্যা আধুনিক যুগের উপযোগী পরীক্ষা তখন পাশ করে নাই। সে কথা ত সকলেই জানিত। কিন্তু যেহেতু আমি উচ্চশিক্ষিত, এমন অল্পশিক্ষিতা আমার যোগ্য নহে, এমন ভাবের মন্তব্য কি মানুষের আত্মসম্মান-জ্ঞানকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে না? উমাশশী কি সে দিন গভীরভাবে আহত হন নাই?

পুত্র বিমলচন্দ্র চারি বৎসর পরে আজ আবার ললিত ডাক্তারের সহিত সুষমার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছে। সব কথা স্পষ্টভাবে লিখে নাই। সে শীঘ্রই আসিয়া—আলোচনার পর ব্যবস্থা করিবে।

সুষমা এখন সুশিক্ষিতা বলিয়া ললিত ডাক্তার হয় ত রাজি হইতে পারে; কিন্তু উপযাচক হইয়া বিমল আবার তাহার কাছে প্রস্তাব করিতে কি কুণ্ঠা অনুভব করিল না? তিনি কন্যার জননী।

'কন্যার ভবিষ্যতের কথা মনে করিয়া পিতামাতাকে অনেক অপমান লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়া থাকে ; কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাঁহার অন্তর যেন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

হাঁ, তবে যদি নূতন করিয়া ললিতের পক্ষ হইতে প্রথমে প্রস্তাব আসিত, তাহা হইলে তাঁহার কোন আপত্তি হইত না। বিমল—তাঁহার তেজস্বী বুদ্ধিমান্ পুত্র বিমল, এ কি করিতে চলিয়াছে? মান অপমানের প্রতি বিমলের তীব্র লক্ষ্য আছে, তাহার সহস্র পরিচয় তিনি পাইয়া আসিয়াছেন। সহোদরার বয়োবৃদ্ধির জন্য—এত দিন কুমারী থাকার জন্য—শেষে বিমলেরও কি মতিভ্রম ঘটিল?

যাক্, এ কথা এখন তিনি ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করিবেন না। সুষমা যদি জানিতে পারে, তাহা হইলে অভিমানিনী কন্যা অত্যন্ত মর্ম্মবেদনা পাইবে। না, বিমল না আসা পর্য্যন্ত তিনি চুপ করিয়াই থাকিবেন। ললিতের মনোভাবের প্রতিও এখন হইতে লক্ষ্য রাখা দরকার। পুনরায় প্রত্যাখ্যানের অবস্থা যাহাতে ঘটিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

উমাশশী পত্রখানা ছিন্ন করিয়া উনানে নিক্ষেপ করিলেন।

ঠিক সেই সময়ে সুষমা মার কাছে ছুটিয়া আসিল। সে বলিল, "মা, পাটনা থেকে কার চিঠি এসেছে?"

উমাশশী বলিলেন, "তুই কার কাছে শুন্‌লি?"

"কেন, জামাইবাবু বল্‌লেন, পাটনা থেকে মাসীমার একখানা খামে চিঠি এসেছে। কে লিখেছে? দাদা?"

উমাশশী সংক্ষেপে বলিলেন, "হুঁ।"

"দাদা কি লিখেছেন, মা ?"

কন্যার ব্যগ্র প্রশ্নে উমাশশী বলিলেন, "বৌমাদের নিয়ে সে শীঘ্র এখানে আস্‌ছে।"

সুষমার মন আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। সে বলিল, "কবে আস্‌বেন, মা ?"

"তা কিছু লেখেনি। বোধহয় মাসের গোড়াতেই আস্‌বে।"

"কে আস্‌বে, মাসীমা ?" বলিয়া মণিমালা প্রবেশ করিল।

"তোর দাদা বৌমাদের নিয়ে এখানে আস্‌ছে লিখেছে।"

মণিমালার মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আঃ! কি আনন্দ হইবে। কথাটা স্বামীকে জানাইবার জন্য সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল যাইবার সময় বলিয়া গেল, "আমি দাদাকে আসবার জন্য আজই চিঠি লিখে দেব, মাসীমা "!

দাদা বৌদিদিদের লইয়া আসিতেছেন, এ সংবাদে সুষমা সুখী হইল বটে; কিন্তু আদালতের মোকদ্দমা—উপার্জ্জন ছাড়িয়া, বড়দিনের ছুটি শেষ হইয়া যাইবার পর তিনি কেন আসিতেছেন, তাহা সে বুঝিতে না পারিয়া কিছু বিস্মিত হইল।

মাকে বলিল, "হাঁ মা, দাদা এখানে আস্‌বেন, তাতে তাঁর লোকসান হবে না ?"

উমাশশী হাসিয়া বলিলেন, "সে ব্যবস্থা তোর দাদা না ক'রে কি আসছে ? আমার বোধ হয়, সে মাঝে মাঝে জরুরী মোকদ্দমার দিন এখান থেকে গিয়ে কায সেরে আস্‌বে।"

কিন্তু এমন কি জরুরী ব্যাপার উপলক্ষে দাদা এখানে আসিতেছেন? আদালতের কাজ পর্য্যন্ত বন্ধ রাখিয়া এ সময়ে আসিবার কি প্রয়োজন? সুষমা বুঝিতে পারিল না বটে, তবে সে ভাবিল, এ জন্য অনর্থক চিন্তায় লাভ কি আছে?

বৌদিদির নিকট কথাটা শুনিয়া যমুনা হর্ষোৎফুল্ল-মুখে আসিয়া বলিল, "সুষি, ওঁরা নাকি শীগ্‌গীর আস্‌ছেন?"

"হ্যাঁ, যমুনাধারা। দাদা বৌদি হঠাৎ কেন আসছেন, তা বুঝলাম না। বড়দিনের ছুটি চ'লে গেল, তখন খেয়াল হ'ল না,—এখন কি যে মতলব, তা বুঝছি না।"

সুষমা ঘর হইতে বাহির হইয়া আপন মনে বাগানের দিকে চলিতে লাগিল। গোলাপ-গাছগুলিতে ফুল ফুটিয়াছে। বিবিধ বর্ণের সমাবেশ নয়ন ও মনকে মুগ্ধ করিয়া দেয়। সুশীলের ব্যবস্থা ছিল, নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে কোন ফুল কখনই তোলা হইবে না। মাসীমার পূজার জন্য কিছু কিছু ফুল তোলা হইত। সে জন্য গাঁদা-ফুলের অভাব ছিল না। জবা ও অপরাজিতা ফুল বারো মাস যাহাতে পাওয়া যাইতে পারে, এমন ভাবের বিভিন্ন জাতীয় জবা ও অপরাজিতা ফুল দেওঘরের বাগানে সুশীলের পিতা বহু পূর্ব্ব হইতেই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পুরাতন মালীরা সে সকল গাছের পরিচর্য্যায় কোনও দিন যাহাতে উদাসীন না হইতে পারে, সে বিষয়েও সুশীলের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। পিতার স্মৃতিকে সজীব রাখিবার জন্য, তাঁহার যাবতীয় ব্যবস্থা সে পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিয়াছিল। আধুনিক মতবাদ তাহার পিতৃভক্তির কাছে তেমন

ঠাঁই পাইত না। বন্ধু-বান্ধবগণ এ জন্য সুশীলকে পৌরাণিক বলিয়া উপহাস করিতে কুণ্ঠিত হইত না।

সুষমা গোলাপ ও গাঁদাক্ষেত্র পার হইয়া একটা আম্রবৃক্ষের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। অদূরে অনতি-উচ্চ প্রাচীর, তাহার পার্শ্বেই প্রশস্ত রাজপথ। সে সময়ে পথে বড় কেহ চলিতেছিল না, বেলা এগারটা বাজিয়াছিল।

আম্রবৃক্ষের কিছু দূরে একটি বাঁধানো বেদী বা চত্বর ছিল। সেখানে বসিয়া চারিদিক দেখা যায়। সুষমা সেইখানে বসিয়া পড়িল। তাহার মন কিছু দিন হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কেন যে এই বিক্ষিপ্ততা, তাহা অনুমান করিতে পারিত না; কিন্তু মানসিক অবস্থার এই পরিবর্ত্তন তাহার দার্শনিক চিত্ত আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছিল। কারণ ব্যতীত কোন কার্য্য হয় না, ইহা সে জানিত। তাই সে হেতুর সন্ধান নিজেই আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত বিষয়টি সে আবিষ্কার করিতে পারে নাই।

আহারের বিলম্ব ছিল। সে রাজপথের দিকে চাহিয়া রহিল।

মানুষের মন শূন্য থাকিতে পারে না। চিন্তার পর চিন্তা ঊর্ণনাভের মত সূক্ষ্ম তন্তু সৃষ্টি করিয়া জাল রচনা করিতে থাকে। বিশেষতঃ মন যখন বিক্ষিপ্ত এবং বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, তখন চিন্তার কোনও ধারাবাহিকতাই থাকে না। ঝটিকার সময় যেমন এলোমেলো বাতাস বহিতে থাকে, চিন্তাও ঠিক তেমনই বিশৃঙ্খলভাবে, উদ্ভট কল্পনার তরঙ্গ তুলিয়া হৃদয়তটে প্রতিহত হইয়া থাকে।

সুষমার চিত্ত-বেলাতেও অনির্দ্দিষ্ট, অসমাপ্ত চিন্তার তরঙ্গ-সমূহ

আছাড় খাইয়া পড়িতেছিল। বাল্য, কৈশোর, প্রথম যৌবনের নানা ঘটনা নানা আকার ধরিয়া তাহার মানসপটে দেখা দিতেছিল। তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া চিন্তার তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল। সুষমা শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া চিন্তার জালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে সে সহসা রাজপথের দিকে চাহিতেই তাহার মুখমণ্ডলে একঝলক রক্তরাগ ফুটিয়া উঠিল। সে দেখিল, অনতিদূরে পথের ধারে দাঁড়াইয়া ললিতচন্দ্র। তাহার দৃষ্টি পর্য্যন্ত সুষমা যেন দেখিতে পাইতেছিল। অত্যন্ত করুণভাবে সে তাহারই দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। অবশ্য কোনও পুরুষ,—পরিচিতই হউক, অথবা অপরিচিতই হউক, কোনও নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে, ইহা জানিতে পারিলে, সেই নারীর মন আপনা হইতেই একটু ত্রস্ত হইয়া উঠেই। বিশেষতঃ বাঙ্গালী হিন্দু নারীরা সে দৃষ্টিপাত হইতে দূরে সরিয়া যাইতেই চাহে। সুষমা ললিতের এই দৃষ্টিপাতে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেও, তাহার মনে হইল, ললিতের লুব্ধ বা কলুষ মনের ছাপ—সে দৃষ্টিতে যেন রেখাপাত করে নাই।

কিন্তু চকিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ঠিক সেই সময়ে মণিমালার কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। দিদি তাহাকে ডাকিতেছে, এখনই হয় ত আসিয়া পড়িতে পারে। সুষমা দ্রুতগতিতে বাড়ীর দিকে চলিল।

তেত্রিশ

আর কি ভাল দেখায়? তিন সপ্তাহ হইয়া গিয়াছে, সে নিজের চিকিৎসা-ব্যবসায় ছাড়িয়া অনিশ্চিতের পশ্চাতে লুব্ধ আশায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যমুনাকে স্ত্রীরূপে পাইবার কোন আশাই নাই। সে সুনিশ্চিতভাবে বুঝিয়াছে, যমুনা কোন দিনই তাহার দিকে প্রার্থিত দৃষ্টি ফিরাইবে না। সে নিশ্চয়ই যতীন্দ্রনাথের অনুরাগিণী। যতীন্দ্রনাথকে যমুনা শ্রদ্ধা করে, তাঁহার সাক্ষাতে সে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। সঙ্কোচের অতি ক্ষীণ বাধাও যমুনার কথা, কার্য্য বা ব্যবহারে প্রকাশ পায় না। যতীন্দ্রনাথ যখন গান করেন, যমুনা আত্মবিস্মৃত হইয়া শুনে। বিশেষতঃ যতীন্দ্রনাথের পুত্রের প্রতি যমুনার আকর্ষণ অত্যন্ত অধিক। এ সকল কি শ্রদ্ধার লক্ষণ নহে? শ্রদ্ধা ত অনুরাগের পূর্ব্বগামিনী। কবি, ঔপন্যাসিক, মানব-মনোবৃত্তির তত্ত্ব-লেখকগণ এই কথাই ত বলিয়া থাকেন। সুতরাং বৃথা এই তরুণীর আশায় থাকিয়া লাভ কি? যাহা দুর্লভ এবং কোনও দিন তাহার কামনাকে সার্থক করিয়া তুলিবে না, তাহার জন্য লালায়িত হইয়া বেড়ান ত পৌরুষের দ্যোতক নহে। হাঁ, সে মনে মনে যমুনাকে ভালবাসিয়াছিল।

ললিত সহসা নিশীথ রজনীর অন্ধকারে শয্যা হইতে উঠিয়া বসিল। দীপশলাকার সাহায্যে সে আলোকাধারে আলোকোৎপাদন করিল। অন্ধকার আজ যেন তাহার কাছে অসহ্য।

আলো জ্বালিয়া শয্যায় বসিয়া সে লেপখানা ভাল করিয়া গায় জড়াইয়া লইল। শীত অসম্ভব প্রবল। সে ভাবিতে লাগিল।

ভালবাসা? যমুনাকে কি সত্যই সে ভালবাসিয়াছিল?

হাঁ, তাহার কাছে এই তরুণী স্পৃহণীয়া বলিয়াই সে তাহাকে ভালবাসিয়াছে। যদি তাহা না হইত, সে কি যমুনাকে ভালবাসিতে পারিত? যদি সে কুরূপা বর্ষীয়সী হইত, একটা অঙ্গ তাহার বিকল হইত, তবুও কি সে যমুনাকে ভালবাসিতে পারিত?

ললিত চিন্তা করিতে লাগিল।

না, তাহা সে সত্যই পারিত না। কেই বা পারে? ইন্দ্রিয়গ্রামকে বাহিরের রূপই ত আকর্ষণ করে, তাহারই ফলে অনুরাগ জন্মিয়া থাকে। হাঁ, সে কথাও সত্য—গুণের আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়াও মানুষ ভালবাসে!

সে একই কথা নহে কি? আকর্ষণ না জন্মিলে ভালবাসা জন্মে না। তা সে দেহেরই হউক বা মনেরই হউক। যমুনার মনের কোন পরিচয়, তাহার গুণের কোনও আকর্ষণ ললিত অনুভব করে নাই। শুধু তাহার মত বিদুষী, সুন্দরী, ঐশ্বর্য্যশালিনী তরুণীর অকাল-বৈধব্য ললিতের মনে একটা ব্যথার সঞ্চার করিয়াছিল। তার পর যখন সে জানিতে পারিয়াছিল যে, সুশীল বাবু সহোদরার পুনরায় বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত' তখনই সে যমুনার প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিল, ভালবাসা জন্মিয়াছিল।

কিন্তু একতরফা ভালবাসার মূল্য কি? কবি বলিয়াছেন, "ভালবাসার নাম আত্মবিসর্জ্জনের আকঙ্ক্ষা।" কিন্তু ললিতের মনে

এই জাতীয় ভালবাসার প্রতি শ্রদ্ধা নাই। "ভালবাসিবে ব'লে ভালবাসিনে," এসব কবিকল্পনার উপযুক্ত। যাহারা বাস্তবতার উপাসক, তাহারা ইহাতে কোনও মাধুর্য্যরসের সন্ধান পায় না। বরং তাহার তুলনায় যিনি লিখিয়াছেন—

"আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি, তুমি অবসরমত বাসিও!"—

তাঁহার ভালবাসার ব্যাখ্যায় কিছু লাভের প্রত্যাশা আছে। একতরফা ভালবাসায় উপন্যাস জমে, কিন্তু জীবন দুর্ব্বহ হয় না কি?

ললিতের মুখে মৃদু হাস্যরেখা উদ্ভাসিত হইল।

না, তেমন ভালবাসার জন্য সে জীবনপাত করিতে পারে না। বস্তুতান্ত্রিকতার যুগে, শুধু একটা কল্পনা লইয়া জীবনব্যাপী দুঃখ, হাহুতাশ—না, সেরূপ সাধনা তাহার নাই। ইহাতে যমুনা—

কিন্তু প্রকৃতই কি সে যমুনাকে ভালবাসিয়াছিল? অথবা এত দিন তাহার অনবদ্য দেহ-মাধুর্য্য, রূপশ্রী, তারুণ্যই তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছিল? অথবা আরও কিছু?

ললিত তন্ময়ভাবে চিন্তা করিতে লাগিল।

ভাবের ঘরে চুরী করিলে কোনও লাভ আছে কি? আত্মবঞ্চনা করার কোনও সার্থকতা নাই। না, সে তাহা করিবে না।

মোহিত তাহার সতীর্থ ছিল। পরীক্ষায় মোহিত সকল বিষয়েই পূর্ব্বাবধি তাহাকে পরাজিত করিয়া আসিয়াছিল। বহু চেষ্টা ও সাধনা সত্বেও সে সতীর্থকে কোনও বিষয়ে হঠাইতে পারে নাই। অতি লঘু আয়াসে মোহিত তাহাকে পাছে ফেলিয়া জয়মাল্য লাভ করিয়াছিল। সেই জয়মাল্যের কৌস্তভ-মণি যমুনা। মোহিত

এখন নাই—কিন্তু যে অমূল্য রত্ন সে ফেলিয়া গিয়াছে, তাহাকে লাভ করিবার বাসনা কি তাহার মগ্ন চৈতন্যে ছিল না?

ছিল। এই বিরাট সত্যকে অস্বীকার করা চলে না। পৃথিবীর কোনও মানুষ তাহার অন্তরের এই গোপন ইতিহাস জানে না, জানিবার সম্ভাবনাও নাই, কিন্তু দিন-দুনিয়ার মালিক?

ললিতের সর্ব্বদেহ শিহরিয়া উঠিল। এতদিন সে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। কিন্তু সে দিন বৈদ্যনাথজীর প্রস্তরলিঙ্গ স্পর্শ করিবার সৌভাগ্য লাভের পর, সে কোনও মতেই নাস্তিক্য-বুদ্ধিকে আমল দিতে পারিতেছিল না। তাহার মনের কোণ হইতে একটা প্রেরণা উদিত হইয়াছিল—তিনি আছেন।

না, মনের কাছে সে খাঁটি থাকিবে। সত্যই ছাত্রজীবনের ব্যর্থতা, পরাজয়ের ক্ষোভ সে ভুলিতে পারে নাই। তাই মোহিতের পরিত্যক্ত পত্নীকে—এই বিদুষী সুন্দরী তরুণীকে লাভ করিবার কামনাই তাহাকে যমুনার প্রতি সবেগে আকৃষ্ট করিয়াছিল। সতীর্থ জীবিত থাকিতে সে যাহা পায় নাই, তাহার অবিদ্যমানে তাহার অর্দ্ধাঙ্গিনীকে সে যদি জীবনসঙ্গিনীরূপে লাভ করিতে পারে, তবে তাহার মনের আংশিক ক্ষোভ মিটিবে।

মগ্নচৈতন্যে এই সত্যরূপই কি পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই?

যুবক স্তব্ধভাবে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল।

না, ললিত আত্মবঞ্চনা করিতে চাহে না। সত্যকে অস্বীকার করিয়া মনুষ্যত্বকে অপমানিত করিবার অধিকার কাহারও নাই।

সুতরাং যমুনার প্রতি তাহার এই আকর্ষণ প্রকৃত ভালবাসা—

প্রেমজনিত, তাহা স্বীকার করা চলে না। ভালবাসা যদি সত্যই তাহার মধ্যে ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে যমুনার দিক হইতে কোনও প্রকার সাড়া না আসিলেও সে কেন মনে মনে তাহাকে ভালবাসিয়া তৃপ্ত হইতে পারিতেছে না? প্রতিদানের কামনা তাহাকে এত অধীর ও আগ্রহশীল করিয়া তুলিয়াছে কেন? তাহার এই আকর্ষণকে যদি ভালবাসার পর্য্যায়ে ফেলা যায়, তাহা দান-প্রতিদানমূলক, অতি নিম্ন-স্তরের আকর্ষণ, ভোগস্পৃহা, আত্মতৃপ্তি তাহার লক্ষ্য। ভারতবর্ষের শিক্ষা এবং আদর্শ অনুসারে যদি বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে ইহাকে প্রেমের পরিবর্ত্তে কাম সংজ্ঞা দেওয়াই সমীচীন নহে কি?

ললিতচন্দ্র অস্থির হইয়া উঠিল। তাহার অন্তরের মানুষটি মাথা খাড়া করিয়া অকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে যেন বলিয়া উঠিল—না, যমুনাকে কোন দিনই ভালবাসার দৃষ্টিতে সে দেখিতে পারে নাই। এত দিন সে আত্মবঞ্চনা করিয়া আসিয়াছে। প্রতীচ্য শিক্ষা ও মনো-বৃত্তির গড্ডলিকা-প্রবাহে ভাসিয়া গিয়া সে যাহাকে প্রেম বলিয়া মনে করিয়াছিল, তাহা কাম ব্যতীত অপর কিছুই নহে। শুধু সে নহে, দেশের অধিকাংশ নরনারী ইদানীং এই মানসিক আকর্ষণকে ভ্রান্তিবশে প্রেম বলিয়াই ব্যাখ্যা করে।

অকস্মাৎ তাহার মানস-দৃষ্টির সম্মুখে সে দিনের একটি চিত্র ভাসিয়া উঠিল। এই বাড়ীতেই সে দিন যতীন্দ্রনাথ পদাবলী গান করিয়াছিলেন। মহারাজ প্রভৃতির একান্ত অনুরোধে যতীন্দ্রনাথ সেদিন কীর্ত্তন গান এড়াইতে পারে নাই। সে দিন একাদশী তিথি

ছিল। অভুক্ত অবস্থা ছাড়া যতীন কীর্ত্তন গাহে না। সারাদিন উপবাসী যতীন্দ্রনাথ সন্ধ্যার সময় পদাবলী গাহিতে থাকে।

ললিতের কর্ণে সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীত-মাধুর্য্য এমনই সুধাবর্ষণ করিয়াছিল যে, সে পরে অনেক সময় সেই সকল গানের ঝঙ্কার শুনিতে পাইত। নিশীথ-রজনীর স্তব্ধতার মধ্যে তাহার মনে পড়িল—

"রজকিনী-প্রেম, নিকষিত হেম,
কাম-গন্ধ নাহি তায়!"

সত্যই ত, ইহারই নাম ভালবাসা। আসঙ্গ-লিপ্সা নাই, দান-প্রতিদানের কোন কথা নাই—ভালবাসিয়াই শুধু সুখ, তৃপ্তি, আনন্দ! দৈহিক মিলনের কোন আকর্ষণই প্রকৃত প্রেমের মর্য্যাদাকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। য়ুরোপ ইহা বুঝে নাই। ভারতবর্ষ এই অপূর্ব্ব প্রেমের আস্বাদ শুধু স্বয়ং ভোগ করে নাই, চিরন্তন কালের জন্য, মনুষ্য জাতিকে উন্নততর অবস্থায় উন্নীত করিবার জন্য, এই কামগন্ধহীন প্রেম মুক্তহস্তে বিতরণ করিয়াছে।

ললিতচন্দ্র স্তব্ধভাবে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল।

অকস্মাৎ আর একটা চিত্র তাহার মনকে যেন কশাঘাত করিয়া সতর্ক করিয়া দিল। আম্রবৃক্ষমূলে বেদীর উপর উপবিষ্টা তরুণীর দিকে সে যখন নিবিষ্ট-দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল, তখন তাহার সমগ্র অন্তরমধ্যে যেন জাহ্নবী-ধারা-প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছিল। তাহাতে মন যেন নির্ব্বেদশূন্য হইয়া উঠিয়াছিল। কি ইহা? কোথা হইতে এমন অবস্থার উদ্ভব হইল? ইহা কি মগ্ন-চৈতন্যের লীলা?

ললিত ভাবিতে ভাবিতে শয্যায় শুইয়া পড়িল।

চৌত্রিশ

"সুশীল বাবু, অনেকদিন এখানে থাকা গেল। এবার কলকাতা যাবার ইচ্ছে হচ্ছে। শীলার শরীরও সেরেছে। আমার এখানে থাকার আর প্রয়োজন আছে কি?"

সুশীলচন্দ্র ললিতের মুখের দিকে মুহূর্ত্তের জন্য চাহিয়া বলিল, "আপনার প্রাক্‌টিসের খুব ক্ষতি হচ্ছে, তা বুঝছি, ললিত বাবু। আর কয়েক দিন থাকতে আপনার বিশেষ বাধা আছে কি? আমরাও ত কলকাতায় যাব।"

ললিত বলিল, "প্রাক্‌টিসের ক্ষতি আমি ধরিনে। দুই এক মাসে এমন কিছু এসে যাবে না। তবে আমি এখানে থেকে আপনাদের কোন কাজে ত লাগ্‌ছি না, তাই বলছিলাম।"

সুশীল হাসিয়া বলিল, "আমাদের কাজে আপনি লাগ্‌ছেন না? আপনি থাকায় আমি বন্ধুর দুঃখ বা অভাব বুঝতে পারিনি। কত আলোচনা আপনার সঙ্গে চলে। যতীন বাবুকে ত সব সময় পাওয়া যায় না! তবে আপনার হয় ত খুব কষ্ট এখানে হচ্ছে।"

মাথা নাড়িয়া ললিত বলিয়া উঠিল, "ও কথা বল্‌বেন না, সুশীল বাবু! কষ্ট আমার হওয়া দূরে থাক্, এখানে পরম সুখেই আছি। তবে আপনাদের এখানে থেকে কিছু উপকারেই যখন লাগ্‌তে পারছি না, তাই ও কথা বলেছিলাম। বেশ, আপনার কথাই মেনে নিলাম। আমি উপস্থিত আর যাবার নাম করবো না।"

সুশীলচন্দ্রের মুখ প্রসন্ন হইল। সে বলিল, "আজ বিমলদারা পাটনা থেকে এসে পৌছুবেন।"

ললিতের নয়ন বিস্ফারিত হইল। সে বলিল, "বিমল বাবু হঠাৎ আস্‌ছেন যে?"

তাহার বক্ষঃস্পন্দন দ্রুত হইল। সে বিমল বাবুকে কয়দিন পূর্ব্বে যে পত্র লিখিয়াছিল, তাহার সহিত এই আগমনের ত ঘনিষ্ঠ যোগ নাই? সে পত্রে ললিত ত নিজের মনের কথা অনেকটা স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিল। তবে কি—

ললিত বলিল, "বিমল বাবু কি একাই আস্‌ছেন?

"না, বৌদিদিরাও আস্‌ছেন। বেশ আমোদে দিন কাট্‌বে, কেমন নয়, ডাক্তার বাবু?"

সে কথা সত্য। বিমলচন্দ্র যেমন সদানন্দ, তেমনই পরিহাসরসিক। তিনি যেখানে থাকেন, তাহার চারিপার্শ্বে আনন্দোৎসব পড়িয়া যায়।

ললিত বলিল, "আপনি এখন ষ্টেশনে যাচ্ছেন না কি?"

"হাঁ ওরা সবাই গেছে, আমিও তৈরী। আপনি যাবেন?"

যাইবার প্রচণ্ড ইচ্ছা তাঁহার হইতেছিল। কিন্তু কি ভাবিয়া সে বলিল, "আপনি আগে যান। মহারাজের ওখানে এখন যাব ব'লে আগেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। না যদি যাই—"

বাধা দিয়া সুশীল বলিল, "না, সেটা ভাল দেখাবে না। বেশ ত, আপনি মহারাজকে বিমলদার আস্‌বার কথা জানাবেন।"

সুনীল একবার ঘড়ীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আর মোটে মিনিট কুড়ি বাকি। আমি চল্লুম, ডাক্তার বাবু।"

দ্রুতপদে সুনীল ষ্টেশনের অভিমুখে ধাবিত হইল।

ললিত মিথ্যা কথা বলে নাই। সত্যই ভবতোষ তাহাকে যাইতে বলিয়াছিলেন। তবে সেখানে বৈকালে গেলেও চলিত। কিন্তু ললিতচন্দ্র অন্তরে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথম সাক্ষাতেই সদানন্দ, সরলপ্রকৃতি, স্পষ্টভাষী বিমলচন্দ্র, যদি এমন কিছু বলিয়া বসেন—বিশেষতঃ সুষমা, যমুনা, মণিমালা প্রভৃতির সাক্ষাতে—তাহা হইলে সত্যই তাহার লজ্জার সীমা থাকিবে না। না, যত বিলম্বে সাক্ষাৎ হয়, ততই তাহার পক্ষে মঙ্গল।

ললিতচন্দ্র আলোয়ানখানা গায় জড়াইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল। পুরণদহে মহারাজ ভবতোষের বাড়ীর অভিমুখে সে ধীরপদে চলিতে লাগিল।

রাজভবনের নিকট আসিয়া সে একটু স্থিরভাবে দাঁড়াইল। কোনও কারণ ছিল না, শুধু বিলম্ব করাই তাহার উদ্দেশ্য।

তোরণ পার হইয়া মহারাজের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিতেই ভবতোষ প্রসন্নকণ্ঠে বলিলেন, "ডাক্তার এসেছ, ভালই হয়েছে।"

গড়গড়ার নল হইতে ধূম্ররাশি নির্গত হইতেছিল। গভীর আবেশে টান দিয়া ভবতোষ বলিলেন, "নূতন খবর কি, ডাক্তার?"

ললিতচন্দ্র বলিল, "বিমল বাবুরা আজ আস্‌ছেন। এতক্ষণে ষ্টেশনে পৌঁছে গেছেন।"

মৃদু হাসিয়া ভবতোষ বলিলেন, "তা জানি। ষ্টেশনে আমিও

যেতাম; কিন্তু রাণী বল্লেন যে, সন্ধ্যার পর তাঁকে ও-বাড়ীতে নিয়ে যেতে হবে। বিমলদার স্ত্রী ওঁর বকুলফুল কি না।"

বিমল বাবু আজ আসিতেছেন, সে কথা মহারাজ কেমন করিয়া জানিলেন, ললিতচন্দ্রের মনে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগিয়াছিল। কিন্তু মহারাণী ও বিমল বাবুর স্ত্রী পরস্পর সখীত্বসূত্রে আবদ্ধ জানিয়া সে স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

"তার পর ডাক্তার, তোমার মনের অবস্থা এখন কি রকম?"

ললিতচন্দ্র এরূপ প্রশ্নে চমকিয়া উঠিল। কিন্তু ভবতোষের মুখে স্বাভাবিকতার কোনও বৈলক্ষণ্য না দেখিয়া সে বলিল, "কেন, মহারাজ, এরকম প্রশ্ন হঠাৎ আপনার মনে এল কেন?"

ভবতোষ হাসিয়া বলিলেন, "এম্নি জিজ্ঞাসা করছি। তোমার মুখে চিন্তার ছাপ, তাই জিজ্ঞাসা করছি, মন ভাল আছে ত?"

ললিতচন্দ্র বলিল, "দুর্ভাবনার বিশেষ কোনও কারণ ত নেই। সংসারে একা মানুষ, কাজেই কার জন্যই বা দুর্ভাবনা হবে বলুন?"

মহারাজ ভবতোষ ডাক্তারের মুখের দিকে দুই চক্ষু স্থাপিত করিয়া বলিলেন, "কেউ না থাক্‌লেও নিজের জন্য ত মানুষের চিন্তার অভাব নেই হে।"

ললিত এ কথার কোন উত্তর দিল না। শুধু প্রাচীর বিলম্বিত একখানি চিত্রের প্রতি চাহিয়া রহিল। বন্ধুবর যতীন্দ্রনাথের একখানি তৈলচিত্র—আলেখ্যাবলীর সঙ্গে ভবতোষ গৃহপ্রাচীরে বিলম্বিত রাখিয়াছিলেন।

ভবতোষ নিরুত্তর তরুণ ডাক্তারের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছিলেন

কি না, বুঝা গেল না। তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন, "দেখ ডাক্তার, এ রকম নিঃসঙ্গ জীবন ভাল নয়। আমার পরামর্শ শোন। তাড়াতাড়ি একটা বিয়ে ক'রে ফেল।"

ম্লান হাস্যরেখা ডাক্তারের ওষ্ঠপ্রান্তে চকিতে নৃত্য করিয়া গেল।

"সত্যি; অর্থের অভাব নেই। বিয়ের বয়স ক্রমেই চ'লে যাচ্ছে। জীবনে মানুষ রস উপভোগ ক'রে সুখী হতে চায়। এখনও যদি বিয়ে কর ত রসমাধুর্য্য ভোগ করবার কিছু সুযোগ পাবে। এর পর সে সুযোগ আর মোটেই থাকবে না।"

এবার ললিত কথা কহিল। সে বলিল, "বিয়েতে অনিচ্ছা নেই, মহারাজ! কিন্তু—"

সহসা সে থামিয়া গেল। তাহার দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীর-বিলম্বিত বিশিষ্ট চিত্রখানির উপর সংবদ্ধ হইয়া রহিল।

ভবতোষ পরম উৎসাহভরে ধূমপান করিতেছিলেন। ললিতকে থামিতে দেখিয়া তিনি দৃষ্টি ফিরাইলেন।

"থামলে কেন, ডাক্তার? মেয়ে পাওয়া যাচ্ছে না?"

"আজ্ঞে না, মহারাজ। বাঙ্গালা দেশে মেয়ের দুর্ভিক্ষ হয় নি। তবে যেমন চাওয়া যায়, তা কি সুলভ?

মহারাজ রহস্যভরে বলিলেন, "আদর্শ চিরদিনই মানুষের আয়ত্তের বাইরে থাকে, ডাক্তার। আজ পর্য্যন্ত কোন মানুষই আদর্শকে লাভ করতে পারে নি। তাই ব'লে কি মানুষ শুধু হাহুতাশ করেই জীবন কাটিয়ে দেয়?"

"তবু—"

বাধা দিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে ভবতোষ বলিলেন, "এর মধ্যে 'কিন্তু', 'তবু' চলবে না। আমি তোমাকে ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করি। তোমার প্রতি আমার বিশেষ দৃষ্টি আছে, সেটা তুমি ভুলে যেও না। কল্পনার পশ্চাতে, দুর্লভ বস্তুর সন্ধানে বৃথা সময় নষ্ট করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আমি তোমার জন্য একটি ভাল মেয়ে স্থির ক'রে রেখেছি। তাকে বিয়ে ক'রে তুমি সুখী হ'তে পারবে, আমার বিশ্বাস আছে।"

"কিন্তু মহারাজ—"

তর্জ্জনী তুলিয়া ভবতোষ সহাস্যে বলিলেন, "আমি ত বলেছি, 'কিন্তু', 'যদি' চল্‌বে না। আমাকে তোমার অভিভাবক ব'লে অনেক দিন আগে তুমি নিজেই স্বীকার করেছিলে। আমি তোমার কিসে ভাল হবে না হবে, তা জানি। এটা তোমার বিশ্বাস আছে? আমাকে তোমার হিতকামী ব'লে নির্ভর করতে পার না কি?"

"তা আমি জানি, মহারাজ। আপনি আমার কত উপকার করেছেন, তা কি জানিনে।"

"তবে চুপ ক'রে থাক। তোমার মনের অনেক কথা আমার অজানা নেই। আমি তোমার মঙ্গলকামী, এটা ভুলে যেও না, ভাই।"

ললিত সবিস্ময়ে ভবতোষের দিকে চাহিল। কিন্তু তাঁহার মুখে সে এমন কোনও আভাসের চিহ্ন দেখিল না, যাহাতে তাহার মনের সন্দেহের নিরসন হইতে পারে। মহারাজ তাহার মনের কথা জানেন? সত্য বটে, এক দিন তিনি তাহার সঙ্গে দীর্ঘকাল নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন। সুশীল বাবুর সহোদরা ও

যতীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও প্রসঙ্গক্রমে অনেক কথাই উঠিয়াছিল ; কিন্তু সে ত ঘুণাক্ষরেও এমন কথা বলে নাই যে, যমুনার প্রতি তাহার লোভ আছে। তবে?—মহারাজ তাহার সহিত আরও নানাপ্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছিলেন। বিমল বাবুর সহিত প্রথম পরিচয় কি করিয়া ঘটে, নিউমোনিয়ার আক্রমণ প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনাও যে না হইয়াছিল, তাহা নহে। কিন্তু তাহার মানসক্ষেত্রে যে ঝটিকা বহিয়া চলিয়াছিল, তাহার কোন কথাই সে প্রকাশ পাইতে দেয় নাই।

সহসা ভবতোষের কণ্ঠস্বর তাহাকে চিন্তা-জগৎ হইতে বাস্তব পৃথিবীতে ফিরাইয়া আনিল। মহারাজ বলিতেছিলেন, "তুমি এখানেই এ বেলা খেয়ে যাও না।"

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া ললিত বলিল, "সেটা কি ঠিক কাজ হবে, মহারাজ? বিমল বাবুরা এসেছেন। আমার জন্য সকলেই অপেক্ষা ক'রে থাক্‌বেন। আমি না গেলে যদি অন্য কিছু মনে করেন!"

মৃদুহাস্য করিয়া ভবতোষ বলিলেন, "সে কথা ঠিক বটে। না, তুমি তবে এস।"

ললিত দ্রুতপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

পঁয়ত্রিশ

"দাদা, সব জিনিষ ত এখানে পাওয়া যাবে না।"

সুশীল বলিল, "আমি কলকাতায় ফর্দ্দ পাঠিয়ে দিয়েছি। যা এখানে পাওয়া যাবে না, সব জিনিষ সন্ধ্যার গাড়ীতেই এসে পৌছুবে। আমাদের সরকার বাবু সব নিয়ে আসছেন। বাকি সব এখান থেকে কেনা হবে।"

যমুনার মুখ প্রসন্ন হইল।

তখনও প্রভাত-রৌদ্র উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই। সুশীলের চা-পর্ব্ব সবে শেষ হইয়াছিল মাত্র।

যমুনা বলিল, "মহারাজ মহারাণী এঁরা সব আস্‌বেন ত?"

"তুই নেমন্তন্ন করেছিস্, আস্‌বেন না? যতীন বাবুরাও আস্‌বেন। কেউ অনুপস্থিত থাক্‌বেন না।"

কিন্তু সুশীলচন্দ্র যমুনার এই খাওয়ানোর কোন অর্থ আবিষ্কার করিতে পারিতেছিল না। যমুনা ইদানীং যেন পরম রহস্যময়ী হইয়া উঠিয়াছিল। সে কয় দিন হইতে এমনভাবে চলাফিরা করিতেছে, এমন ভাবে সকলের সঙ্গে ব্যবহার করিতেছে, যেন সে এ জগতের অনেক উর্দ্ধে। ইহা সুশীলের কাছে স্বস্থ বলিয়া অনুমিত হইতেছিল না।

বিমলচন্দ্র, ভ্রাতা ও ভগিনীর আলোচনার মাঝে আসিয়া বলিলেন, "আজ তোমরা বেড়াতে বেরোবে না?"

"চলুন যাই" বলিয়া সুশীল উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিমল বলিল, "ললিত ডাক্তার চা শেষ করেই বেরিয়ে পড়েছে। তার সঙ্গে একটা দরকারী কথা ছিল। তা সে একাই বেরিয়ে পড়েছে দেখ্‌ছি।"

মণিমালা ঘরে প্রবেশ করিতেছিল। কথাটা শুনিতে পাইয়া সে বলিল, "তিনি রোজ একলাই বেড়াতে যান, দাদাবাবু। আমাদের সঙ্গে বড় একটা মেশেন না।"

সুশীল হাসিয়া বলিল, "এটা কিন্তু ডাক্তারের প্রতি অবিচার। তিনি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাক্‌তে চান, কিন্তু তোমরা তাঁকে এড়িয়েই চল। এতে বেচারীর দোষ দিলে চল্‌বে কেন?"

যমুনা নীরবে দাঁড়াইয়াছিল। সে এ প্রসঙ্গের আলোচনায় যোগ দেয় নাই। এবার সে বলিয়া উঠিল, "তার মানে? মেয়েমানুষ যার তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে যদি না চায়, যার তার সঙ্গে মেলামেশা করা ভাল না বাসে, তাতে কি এড়িয়ে চলা বলে, দাদা?"

সুশীল সহোদরার দিকে ফিরিয়া চাহিল। মণিমালাও সকৌতুকে ননন্দার দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিল। বাস্তবিক আজ সর্ব্বপ্রথম যমুনা ললিত ডাক্তারের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিতেছে।

সুশীল হাসিয়া বলিল, "ললিত বাবুকে যার তার দলে ফেলা কি ঠিক হ'ল, যমু?"

দীপ্তকণ্ঠে যমুনা বলিল, "কেন নয়, তা বল্‌তে পার, দাদা?"

সুষমা বেড়াইবার বেশে এই সময় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

সুশীল বলিল, "যেহেতু ললিত বাবু আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক। তা ছাড়া—"

কিন্তু কি ভাবিয়া সে কথাটা শেষ করিল না।

যমুনা তাহার দাদার কথার শেষাংশের প্রতি লক্ষ্য না করিয়াই বলিল, "পারিবারিক চিকিৎসক হলেই তাঁর সঙ্গে বাড়ীর মেয়েরা অসঙ্কোচে মেলামেশা করবে, চিকিৎসা-ব্যাপারের বাইরের বিষয়ে তাঁকে টেনে আন্‌বে, এ শিক্ষা হিঁদুর ঘরে কোন দিন ছিল না। তোমরা কি সেটা চল্‌ করতে চাও, দাদা?"

বিমলচন্দ্র সকৌতুকে এই স্বল্পভাষিণী, শান্তপ্রকৃতি তরুণীর কথা শুনিতেছিলেন। তিনি সুশীলের স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিলেন, "বোন্‌টি ঠিক কথাই বলেছে, ভায়া। তোমাদের পশ্চিম দেশের আমদানী সভ্যতা আমারও রুচিকর নয়। সুষি, তুই কি বলিস্?"

সুষমা বলিল, "এখানে দাঁড়িয়ে বৃথা তর্ক না ক'রে বেড়াতে যাবে কি না বল। ললিত বাবু সুশীল বাবুর বন্ধুস্থানীয় হতে পারেন; কিন্তু তাঁর বন্ধুদের সকলের সঙ্গে বাড়ীর মেয়েরা অবাধে মেলামেশা করবে, এটা আশা করা তাঁর উচিত নয়।"

বিমলচন্দ্র স্থিরদৃষ্টিতে সহোদরার আরক্ত আননের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ললিত বাবুর প্রতি সুষমারও এই প্রকার মনোভাব কি তাঁহাকে চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছিল?

সুষমা যমুনার দিকে আগাইয়া গিয়া তাহার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিল। বলিল, "যমুনাধারা, শালখানা গায় জড়িয়ে চল্‌ ভাই বেরিয়ে পড়ি। সাড়ে সাতটা বেজে গেছে।"

"চল যাই। পিসিমা ও সতুকে আবার ব'লে আসতে হবে।"

সুষমা, যমুনা, মণিমালা বিমলচন্দ্রের স্ত্রী চারুশীলাকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলে, বিমলচন্দ্র বলিলেন, "সুশীল, তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরী পরামর্শ আছে।"

সুশীল বলিল, "আমারও আছে। ভারী দরকারী কথা।"

"বেশ ত, পথে যেতে যেতেই আলোচনা করা যাবে।"

সুশীল আলনা হইতে র‍্যাপারখানা টানিয়া লইয়া বলিল, "কোন্ দিকে যাবেন, দাদা ?"

বিমলচন্দ্র একটা প্রকাণ্ড চুরুট ধরাইয়া লইয়া বলিলেন, "ভবতোষের সঙ্গে সকলেই দেখা করবো, ব'লে এসেছি, সেখানে তার সঙ্গে বিশেষ আলোচনা আছে। তোমার পরামর্শও দরকার।"

এমন সময় উমাশশী আসিয়া বলিলেন, "বিলু, তোরা এখন কোথায় যাচ্ছিস ?"

"ভবতোষের কাছে যাচ্ছি, মা !"

উমাশশী বলিলেন, "খুব ভাল ক'রে ভেবে-চিন্তে তবে এগিও, বাবা। আমি ওর মনের কথা জানি। এবার যেন কোন রকমে ছেলেমানষী কাণ্ড না ঘটে।"

বিমলচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "মা, তোমার ছেলেটি বোকা নয়, সে বিশ্বাস বোধ হয় তোমার আছে। চোক-কাণ খুলেই থাকা আমার স্বভাব। কোন চিন্তা নেই, মা।"

মাতা ও পুত্রের কথায় সুশীল একটু বিস্মিত হইল। সে ব্যাপারটা কিছুই অনুমান করিতে পারিল না।

পথে বাহির হইয়া বিমলচন্দ্র বলিলেন, "তোমার কোন বিশেষ কাজ নেই ত, সুশীল? ভবতোষের সঙ্গে একটা বিষয়ে পরামর্শ করতে চাই। তোমার মতামতও জানা দরকার।"

সুশীল বলিল, "না দাদা, কাজ আবার এখানে কিসের?"

বিমলচন্দ্র চলিতে চলিতে বলিলেন, "সুষির বয়স যথেষ্ট হয়েছে। বাঙ্গালীর ঘরের মেয়েকে আর একদিনও বিয়ে না দিয়ে রাখা চলে না। যে বয়সে মেয়েরা কল্পনা ও কাব্যের রস—অবশ্য বিবাহিত জীবনের—ভোগ করতে চায়, বয়স চ'লে গেলে তা আর ভোগ করা হবে না। সুষির বিয়ে এজন্য আরও আগে আমার দেবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমার সে চেষ্টা সফল হয়নি।"

সুশীল নীরবেই শুনিয়া যাইতেছিল।

বিমল বলিয়া চলিলেন, "চৌদ্দ পনের বছর এ দেশের মেয়েদের পক্ষে যথেষ্ট বয়স। তার পর জীবনের কাব্যরস ভোগের সময় ক্রমেই বাস্তবতায়, বস্তুতন্ত্রে পরিণত হয়, এ কথাটা মান কি?"

সুশীল বলিল, "এ কথাটা ওদিক দিয়ে কখনো ভেবে দেখিনি। অন্য দেশে মেয়েরা বেশী বয়সে বিয়ে ক'রে থাকে, তাতে কি তাদের জীবন অসুখী হয়?"

বিমল হাসিয়া বলিলেন, "তুমি ও-দেশ ঘুরে এসেছ। ওদের ভিতরটা দেখবার সময় পেয়েছ কি না, জানিনে। কিন্তু বেশী বয়সে জীবনের কাব্যরস যে শুকিয়ে যায়, এ কথাটা প্রত্যেক মনস্তত্ত্ববিদকে স্বীকার করতে হয়েছে। যাক, সে কথা হচ্চে না। বিলেতের দৃষ্টান্ত খুব আশার সঞ্চার করে না। দেখ ভাই, আমাদের

বিয়ে তোমাদের চেয়েও অল্প বয়সে হয়েছে। আমরা জীবনের যে রসটা উপভোগ করতে পেয়েছি, তোমরা তা'ও পাওনি। এখন যারা বেশী বয়সে বিয়ে করে, তারা'ত সেটা কল্পনা করবার সুযোগও পায় না, এ আমি ভাল ক'রেই জানি। কারণ, আমার অনেক বন্ধুই তরুণ, আমিও অবশ্য এমন বুড়োও হইনি।”

বিমলচন্দ্র হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন!

সুশীল বলিল, “না দাদা, আপনার বয়স চল্লিশের কোঠায় যায়নি, তা আমরা জানি।”

বিমল বলিলেন, “যাক্ সে কথা। এখন সুষমাকে আর বিয়ে না দিয়ে রাখা মোটেই উচিত নয়। অথচ সুষি বিয়ে করতে রাজি নয়।”

সুশীল অবশ্য এ কথাটা জানিত না। মণিমালা স্বামীর সহিত সকল বিষয়ের আলোচনা করিলেও সুষমার সম্বন্ধে কোনও কথা স্বামীকে বলে নাই। তাই সুশীল বলিয়া উঠিল, “কেন, সুষমা বিয়েতে নারাজ কেন?”

“তা ঠিক জানিনে ভাই। তবে একটা অনুমান মাত্র মনে হয়েছে। সেটা পরে বল্‌ছি। সে মাকে অনেক দিন আগেই ব'লে রেখেছিল যে, তার বিয়ের জন্য যেন চেষ্টা করা না হয়। কিন্তু আমি তার সে কথা শুনে, তার জীবনটাকে এমন নিঃসঙ্গভাবে থাক্‌তে দেবার অবকাশ দিতে চাইনে। তাই তোমার পরামর্শ চাই।”

তাহারা এই সময়ে ভবতোষের প্রাসাদোপম অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল। বিমলচন্দ্র বলিলেন, “চল, ভবতোষের সঙ্গে ব'সে আলোচনা করা যাক্।”

ছত্রিশ

কেন ?—না, সে কোনমতেই এ পত্র পড়িবে না !

পত্রখানি হাতে করিয়া সুষমা অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল।

ডাক্তার বাবুর এ ধৃষ্টতা অসহ্য ! কেন তিনি তাহার কাছে পত্র পাঠাইবেন ? এ বিদেশী রীতিকে সে সর্ব্বান্তঃকরণে অশোভন বলিয়া মনে করে। হিন্দুর কৃষ্টি এই রীতির বিরোধী। অন্ততঃ ইহাই তাহার বিশ্বাস।

পূর্ব্বে আর একবার ললিত বাবু তাহার নিকট পত্র লিখিয়া, উত্তর পান নাই, তবে আবার তাঁহার এমন দুঃসাহস হইল কেন ?

সুষমা অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

পত্রখানি তখন অপঠিত অবস্থায় ভূমিতলে লুটাইতেছিল।

সকলেই বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। দাস-দাসী ছাড়া কেহ বাড়ীতে নাই। অত্যন্ত মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া সে দ্বিপ্রহরে ঘুমাইয়াছিল। সকলকে বলিয়াছিল, আজ সে বেড়াইতে যাইবে না, তবে শরীরটা বড় দুর্ব্বল বোধ হইতেছিল।

সোণার মা চিঠিখানা তাহার হাতে দিয়া গিয়াছিল।

সুষমার মনে হইল, পত্রখানা হাতে করিয়া ধরাতেও তাহার নারীত্বের সম্মান যেন আহত হইয়াছে।

চারিদিকে সম্পূর্ণ নীরবতা— সুষমা ভাবিতে লাগিল।

উত্তেজনা-প্রসূত বিতৃষ্ণা কৌতূহল দমন করে ; কিন্তু উত্তেজনা-হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিত্তক্ষেত্রে কৌতূহল ধীরে ধীরে মাথা

তুলিয়া দাঁড়ায়। মানব-মনের এই বিশিষ্ট অবস্থা সাধারণ ক্ষেত্রে অপ্রচুর নহে। বিশেষতঃ নারীর কৌতূহল আরও উদগ্র।

পদপ্রান্তে অবহেলা-নিক্ষিপ্ত পত্রখানির প্রতি চাহিয়া সহসা সে হস্ত প্রসারিত করিল। কি আছে এই পত্রে? আর যাহাই হউক, ললিত ডাক্তার ভদ্র-সন্তান। অবশ্যই তিনি অসঙ্গত অশোভন কোন কথা লিখিবেন না, সে বিশ্বাস তাহার আছে। হাঁ, সে তাঁহাকে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিতে পারে।

কৌতুক হৃদযন্ত্রকে অপেক্ষাকৃত দ্রুততালে স্পন্দিত করিয়া তুলিল। পত্র খুলিতেই প্রথম ছত্র তাহার দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করিল। লেখা আছে—"বিমলদার সম্পূর্ণ অনুমোদন পাইয়াছি; কিন্তু তাহা মূল্যহীন—"

সুষমা তাহার বাম করতল বুকের উপর রক্ষা করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য চক্ষু নিমীলিত করিল। হৃদযন্ত্রের স্পন্দন-বেগ এত দ্রুত কেন?

অন্তর হইতে কে যেন তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তুমি না নারী? তুমি না মহাশক্তিরূপিণী চণ্ডীর অংশসম্ভূতা?

ঠিক, ঠিক! বিহ্বলতা তাহার সাজে না। নারী কেন দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া আপনাকে হীন করিবে? একখানা পত্রে লেখা গোটা কয়েক কথায় বিচলিত হইবার মত লজ্জার বিষয় কি আছে? বক্ষোদেশ হইতে বাম করতল তুলিয়া লইয়া সুষমা নয়নযুগল উন্মীলিত করিল। তারপর পত্র পড়িয়া চলিল—

"আপনার অনুকূল স্বীকৃতি ছাড়া আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কামনা পূর্ণ হইবে না। ভ্রান্ত আশায় লুব্ধ মন, মরীচিকার পশ্চাতে

ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত। সে অভিজ্ঞতার কথা এক দিন জানাইবার বড় ইচ্ছা আছে, যদি আপনার অনুমতি পাই। মানুষ অভ্রান্ত নহে। চারি বৎসর পূর্ব্বে অনভিজ্ঞতার ফলে যে অনিচ্ছাকৃত অপরাধ করিয়াছিলাম, তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার। সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত এতদিন ধরিয়া করিয়াছি। বাহিরের জ্ঞান এত দিন মগ্ন চৈতন্যের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে নাই, সে দুর্ভাগ্য আমার। কিন্তু মৃগতৃষ্ণিকার শ্রান্তি মগ্ন চৈতন্যকে আসল রূপে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। সহস্র অপরাধ বিস্মৃত হইয়া যদি হাত ধরিয়া শ্রান্ত, ক্লান্ত সহযাত্রীকে টানিয়া তোলেন, তবে একদিন লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে পারিব। এখন সবই আপনার দয়ার উপর নির্ভর করিতেছে। ইতি— ললিত।"

মৃদু হাস্য-রেখা সুষমার অধরপুটে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। এ হাস্য কি বিজয়িনীর উল্লাসের দ্যোতনা অথবা উপেক্ষার বিদ্রূপ?

পশ্চিমের বাতায়ন-পথে রৌদ্রকরলেখা তখনও ভূমিতলে রেখাপাত করিতেছিল। সুষমা নীরবে সেই দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তাহার চিত্তবেলায় তখন যে তরঙ্গোচ্ছ্বাস হইতেছিল, তাহা অনুমান করিতে প্রয়াস পাইতে হয় না।

ধীরে ধীরে তাহার আননে দৃঢ়সংকল্পের রেখা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার নয়নের দৃষ্টি আরও সমুজ্জ্বল দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইল। ওষ্ঠে ওষ্ঠ চাপিয়া সে বহুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

শুধু অপমান? অপমানের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতির প্রচেষ্টা কি নাই? সে কি এমনই সহজলভ্য যে, একবার প্রত্যাখ্যানের কশা চালাইয়া

আবার গ্রহণের জন্য আকুতি? খালি লাভ ও লোকসান খতাইয়া যাহারা মানব-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাপারের হিসাব-নিকাশ করিতে চাহে, তাহাদের হৃদয় বলিয়া কোন বালাই নাই, থাকিতে পারে না। যে ব্যাপারে হৃদয়ই প্রধান মূলধন, সেখানে এইরূপ বিকি-কিনির হৃদয় লইয়া যে ব্যক্তি অগ্রসর হয়, সে কি অন্যের অপমান এবং সেই সঙ্গে ক্ষতি করে না?

না, না, ললিত বাবুর এ প্রস্তাবের অন্তরালে শুধু হৃদয়হীন কেনাবেচার একটা হীন আয়োজন আছে, ভালবাসার সংস্রব থাকিতেই পারে না। যদি তাহা থাকিত—

ম্লান হাসি সুষমার ওষ্ঠপ্রান্তে খেলা করিয়া গেল।

নিশ্চয়।—চারি বৎসর ধরিয়া তাহাকে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইত না। দীর্ঘ চারিটি বৎসর ধরিয়া ললিত বাবু অপেক্ষাকৃত স্পৃহণীয়া জীবন-সঙ্গিনীর জন্য সন্ধানে ব্যাপৃত থাকিতেন না।

কথাটা কি মিথ্যা? ললিত বাবু ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী নহেন। গৃহধর্ম্ম পালনের জন্য তাঁহার উৎসাহ এবং আগ্রহের অবশ্যই অভাব নাই। তাহার উপযোগী পার্থিব সম্পদ তাঁহার যথেষ্টই আছে। সুতরাং তিনি সুবিধাবাদী হিসাবে এখন তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাকে কৃতার্থ এবং স্বার্থসিদ্ধি করিতে অভিলাষী।

তাহার কি আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান এতটুকু নাই? সে কি খেলার পুতুলের মত ক্রীড়কের নির্দ্দেশে পরিচালিত হইবে?

সুষমা উঠিয়া দাঁড়াইল। পত্রখানা ছিঁড়িবার জন্য তাহার করাঙ্গুলিগুলি উদ্যত হইতেই, কি ভাবিয়া সে নিরস্ত হইল।

না, ইহা একটা নিদর্শন। ইহা রাখিয়া দিতে বাধা নাই।

সুষমা বাক্স খুলিয়া পত্রখানা তন্মধ্যে রাখিয়া দিল।

মণি দিদিকে এ পত্রখানা আগে দেখাইতে হইবে।

তরুণী ভাবিতে লাগিল, এ পত্রের কথা তাহার জননীকে বলিবে কি না। বলা ত সর্ব্বারই সঙ্গত। সে কুমারী কন্যা, মাতার নিকট সকল কথাই জানান তাহার পক্ষে অবশ্য-পালনীয় কর্ত্তব্য।

কিন্তু তাহার দাদা কি করিয়া ললিত বাবুকে এমন ভাবে পত্র ব্যবহারের অনুমতি দিলেন? অমন বুদ্ধিমান্, জ্ঞানবান—দাদা—তিনি অনেক কথাই জানেন, তাহাকে যে ব্যক্তি একদিন প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহাদের বংশের অপমান করিয়াছিলেন, দাদা কেমন করিয়া তাঁহার কৃত সে অপমানের স্মৃতি বিস্মৃত হইলেন? বিশেষতঃ কুমারী ভগিনীর নিকট এক জন অপর পুরুষকে পত্র লিখিবার অনুমোদন তিনি দিলেন কি করিয়া? বর্ত্তমান যুগে এ দেশের অনেক শিক্ষিত পরিবার হয় ত ইহাতে কোন দোষ দেখেন না; কারণ, তাঁহারা বিদেশী শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যকে শোচনীয়ভাবে বিস্মৃত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার দাদা ত সে দলের নহেন! তিনি বাঙ্গালী হিন্দুর বিশিষ্টতা পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করিয়া চলেন। তাঁহার শিক্ষার গুণেই ত কালের উচ্ছৃঙ্খলতা তাহার চিত্তে বা কার্য্যে কোনও প্রকার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

সুষমা ঘরের মধ্য হইতে বাহির হইল। মন উত্তেজিত ক্ষুব্ধ হইলেও তাহার শরীরে তখন কোন গ্লানি ছিল না।

তখনও পশ্চিম-গগনপ্রান্তে আরক্ত আলোকের ঝর্ণা-ধারা যেন

গড়াইয়া পড়িতেছিল। সেই দিকে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া সে কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধভাবে দাঁড়াইল। তার পর রাজপথে নামিয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল।

পথের মোড় ঘুরিয়া পুরণদহের রাস্তায় পড়িতেই সে দেখিতে পাইল, নত-মস্তকে গভীর চিন্তামগ্নভাবে কে এক জন আসিতেছে। চাহিয়া দেখিবামাত্র সে বুঝিতে পারিল, লোকটি ললিত ডাক্তার।

ডাক্তার সুষমাকে দেখিতে পাইল না। সে তখন অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে পথ চলিতেছিল।

সুষমা বামদিকের পথ ধরিয়া দ্রুত চলিতে লাগিল। ললিতচন্দ্রের সান্নিধ্য হইতে সে দূরে—বহুদূরে চলিয়া যাইতে চাহে।

কিছু দূরে গিয়া সুষমা একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল। ললিত ডাক্তার তখনও নতশীর্ষে তেমনই ভাবে পথ চলিতেছিল।

সুষমার মনে হইল, যেন কোন গভীর চিন্তার ভারে যুবক আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কি সে চিন্তা ?

কিন্তু তাহার কি প্রয়োজন ? ললিত ডাক্তারের মনে যে চিন্তাই আবির্ভূত হইয়া থাকুক না কেন, সে বিষয়ে মাথা ঘামাইবার তাহার কোন প্রয়োজন নাই।

আর একবার সে পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল। যুবক তখনও অবনত-মস্তকে ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছিল।

সুষমা আর দাঁড়াইল না। দ্রুতবেগে সে চলিতে লাগিল।

সাঁইত্রিশ

সূর্য্য পশ্চিম-দিক্‌চক্রবালে আবির ঢালিয়া নামিয়া যাইতেছিল।

তরঙ্গায়িত মাঠে এক দল নরনারী মন্থর-গতিতে চলিতেছিল। তাহাদের আলোচনায় যে হাস্য অজস্রধারায় ঝরিয়া পড়িতেছিল, তাহাতে দিগন্তলীন সূর্য্যের অন্তিম রাগরেখার স্পর্শ অনুভূত হইলেও, মৃদুপদ-সঞ্চারিণী সন্ধ্যার অন্ধকারের আভাসমাত্র ছিল না।

দলের পুরোভাগে বিমলচন্দ্র, ভবতোষ, সুশীলচন্দ্র ও যতীন্দ্রনাথ। তাহাদের পশ্চাতে চারুশীলা, মণিমালা ও যমুনা। সতু তাহার মাসীমার হাত ধরিয়া নৃত্যগতিচ্ছন্দে চলিতেছিল।

একটু দূরে উমাশশীর সঙ্গে যতীন্দ্রের পিসী। সুষমা সঙ্গে নাই বলিয়া মাঝে মাঝে মণিমালা ও যমুনা অন্যমনস্ক হইতেছিল।

হরলাঝুরি হইতে পদব্রজেই সকলে বাসার দিকে ফিরিতেছিল। সম্মুখের মাঠটি মনে একটা আকর্ষণ জাগাইয়া তুলিয়াছিল, তাই পথ ছাড়িয়া সকলে মাঠের মধ্য দিয়াই চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

দূরপ্রান্তে পূর্ব্বদিকে শাল-গাছের দীর্ঘ দেহগুলি দাঁড়াইয়া।

হরলাঝুরির কালীবাড়ীর আলোচনাই চলিতেছিল।

ভৈরবী ও ব্রহ্মচারীর প্রসঙ্গে অনেক কথাই যতীন্দ্রনাথ বলিয়া ফেলিল। সেবাব্রত বাঙ্গালীর জীবনে কত ভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে—সংসারী জীবন এই সেবাব্রতের সাহায্যে কত শক্তিশেলের তীব্র বেদনা তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করিতে পারে, ভৈরবীর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া যতীন্দ্রনাথ তাহা বর্ণনা করিতেছিল।

ভবতোষ সহাস্যে বলিলেন "প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আদর্শ এ বিষয়ে যেন উত্তর-মেরু হ'তে দক্ষিণ-মেরুর মত পৃথক। নয় কি?"

যতীন বলিল, "শুধু এ বিষয়ে নয়, সকল বিষয়েই তাই।"

সুশীল বলিল, "কিন্তু ওদের আদর্শটা যেন প্রাণের স্ফূর্ত্তিতে দিগ্বিজয় ক'রে চলেছে।" বিমলচন্দ্র এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ভায়া, পশ্চিমের দিগ্বিজয়ী জৌলুষ চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয় সত্যি; কিন্তু প্রাণ তাতে আছে কি?"

সুশীল বলিল, "তা'না থাক্‌লে, ওরা সারা বিশ্ব জয় করলে কি ক'রে? আর সে আদর্শের জন্য প্রাচ্য এত ব্যস্তই বা কেন?"

"সেটা প্রাচ্যের দুর্ভাগ্য নয় কি, দাদা?"

পুরুষ চারি জনই একসঙ্গে ফিরিয়া চাহিলেন।

কথাটা যমুনার কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়াছিল।

বিমলচন্দ্রের মুখ খুসীতে ভরিয়া উঠিল। তিনি উৎফুল্লকণ্ঠে বলিলেন, "যমুনা ঠিকই বলেছে, সুশীল। আমরা অস্তগামী সূর্য্যের দিকে চেয়ে তার দীপ্তিকে যদি আদর্শ ব'লে মেনে নেই, ঠকেই যাব, ভাই। একটু পরেই সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আস্‌বে।"

যতীন্দ্রনাথ বলিল, "এ দিকে সত্যিই অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। এখন মাঠ ছেড়ে পথে ওঠা যাক্। একটু তাড়াতাড়ি চলাও দরকার।"

পথটি অপেক্ষাকৃত জনহীন। বায়ুসেবীরা এ দিকে বড় একটা আসে না। শুধু পল্লীপ্রত্যাগতগণের পদতাড়নে পথের ধূলি সন্ধ্যার বাতাসকে ভারী করিয়া তুলে।

সে দিন আকাশে চাঁদ ছিল। সন্ধ্যার সঙ্গে-সঙ্গেই মাঠ ও পথ

আলোকিত হইয়া উঠিল। দূরে বৈদ্যনাথজীর মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

মেয়েরা ধরিয়া বসিল, ঠাকুরের 'শৃঙ্গার-বেশ' দেখিতে হইবে।

অভিজাত-বংশের মুকুটমণি ভবতোষ পদব্রজে দীর্ঘপথ চলিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন ভাবিয়া সুশীল বলিল, "কিন্তু মহারাজের—"

বাধা দিয়া ভবতোষ বলিলেন, "সুশীল বাবু, তোমরা আমাকে কি মনে কর, বল ত? জান, আমি পাঁচ ছয় ঘণ্টা ধ'রে ক্রিকেট খেলেছি, এক ঘণ্টা ফুটবল খেলে ক্লান্ত কোন দিন হই নি। দু'বছর আগে পনের মাইলপথ হেঁটে পার হয়েছি জান তা?"

লজ্জিতভাবে সুশীল বলিল, "আমায় ক্ষমা করুন!"

হাসিয়া ভবতোষ বলিলেন, "এতে ক্ষমার কথা কেন আস্‌বে, ভাই! তোমার বিশ্বাসমত কথা বলেছ। এ কথা ত ধনীর দুলালদের সম্বন্ধে একটুও অতিরঞ্জিত নয়।"

'রাবণ' দীঘির পার্শ্ব দিয়া যাত্রিদল শিবগঙ্গার ধারে পৌছিল।

ঠিক সেই সময়ে যমুনা বলিয়া উঠিল, "সুষমা!"

সত্যই ত সুষমাই বটে!

বিমলচন্দ্র ডাকিলেন, "সুষি!"

মন্থর-চরণে, ভূমিলগ্ন দৃষ্টিতে সুষমা উইলিয়মস্ টাউনের দিক হইতে আসিতেছিল। সে দাদার কণ্ঠস্বরে মুহূর্ত্ত চমকিয়া উঠিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইল। সকলে তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

উমাশশী বলিলেন, "তোর মাথা ধরেছিল, না? সঙ্গে কে আছে?"

ঈষৎ ক্লিষ্টস্বরে সুষমা বলিল, "এখন ভাল আছি। সঙ্গে কেউ নেই। একাই মন্দিরে যাচ্ছি, চল।"

মণিমালা ভগিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করিল; কিন্তু কিছুই বলিল না।

বিমলচন্দ্র সহোদরার দিকে সস্নেহ-দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "কিন্তু দেখে যেন মনে হচ্ছে, তোর শরীরটা এখনও সুস্থ হয় নি।"

"না, দাদা, শরীর আমার এখন ভালই। মা, আজ শুনলুম্ ঠাকুরের 'শিঙার-বেশ' খুব ভাল হবে! তাই দেখবার ইচ্ছে হয়েছে।"

প্রধান প্রবেশ-দ্বারের কাছেই পাণ্ডা ঠাকুরের দর্শন মিলিল। তিনি ত প্রচণ্ড আগ্রহে সকলকে মন্দির-প্রাঙ্গণে লইয়া গেলেন। শিঙার-বেশ সবে আরম্ভ হইতেছিল।

গন্ধ তৈল-নিষেকে দেবতার দেহ সুরভিত করিয়া শীতল জলে স্নান করান হইল। গাত্রমার্জ্জনার পর অঙ্গরাগ চলিল। জনৈক ভক্ত তখন মধুর-কণ্ঠে মন্দিরতলকে অনুরণিত করিয়া দেবাদিদেবের স্তোত্র গাহিতেছিলেন। ঘৃত-প্রদীপে কক্ষতল উদ্ভাসিত। চন্দন, গন্ধপুষ্প, ধূপের পবিত্র সৌরভ বাতাসকে মাতাল করিয়া তুলিতেছিল।

বহুক্ষণ ধরিয়া নিপুণ হস্তের প্রসাধন ও সাজসজ্জা চলিল। যমুনা, সুষমা, মণিমালা, চারুশীলা আধুনিক যুগের তরুণী। কিন্তু সে দৃশ্যে তাহাদের চিত্ত যেন অভিভূত হইল। আরতির শঙ্খঘণ্টা, পঞ্চপ্রদীপের আরতি দর্শকদিগের চিত্তে একটা অনবদ্য ভক্তি ও আনন্দের প্রস্রবণ উৎসারিত করিয়া দিল।

শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনি, বোম্ বোম্ হর হর শব্দ পৃথিবীর কোলাহলকে মথিত করিয়া ঊর্দ্ধলোকে নৃত্যগীতচ্ছন্দে সমুত্থিত হইতেছিল।

যমুনার নয়ন মিমীলিত হইল। তাহার মুদ্রিত নেত্রপথে মুক্তাবিন্দু ঝরঝর করিয়া পড়িতে লাগিল। সুষমা তখন পলকহীন নেত্রে সেই বিচিত্র শিঙার-বেশ দেখিতেছিল। তাহার আলোড়িত, মথিত অন্তর-রাজ্যে বিশ্বনিয়ন্তার এই সাড়ম্বর পূজা যেন একটা স্নিগ্ধ চন্দন-প্রলেপ বুলাইয়া দিল। তাহার দুই করপুট সহসা যুক্ত হইল।

অর্দ্ধস্তিমিত-নেত্রে সেই রাজরাজেশ্বর-মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার প্রাণ যেন এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে ভরিয়া উঠিল।

শ্মশানচারী ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিহিত, দরিদ্র শঙ্করকে কেন রাজবেশে সজ্জিত করিয়া ভক্ত তাহার হৃদয়ের ভক্তি উজাড় করিয়া দেয়, ইহার অন্তর্নিহিত তত্ত্বটি আজ যেন তাহার মানসদৃষ্টির কাছে অমীমাংসিত রহিল না। অনাসক্ত, ত্যাগী, ভোগস্পৃহাহীন দেবতাকে সাজাইবার জন্য ভক্ত মানব-চিত্ত কেন অধীর হইয়া উঠে, আরাধ্যকে সমগ্র রত্নসম্ভারে সাজাইয়া কেন তৃপ্তি লাভ করে, তাহা প্রাচ্য মন না লইয়া বিচার করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা।

ভূমিলগ্ন হইয়া সুষমা দেবতার উদ্দেশ্যে হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করিল। আজ হইতে সে কি এমনই অনাসক্তভাবে' এমনই একনিষ্ঠচিত্তে অহঙ্কার, দম্ভ, আত্মবিলাস বিসর্জ্জন দিয়া, তাঁহারই চরণতলে হৃদয়ের ঐশ্বর্য্যরাশি ঢালিয়া দিতে পারিবে ?

পঞ্চপ্রদীপের বিচ্ছুরিত আলোকরেখা সমুজ্জ্বল হইয়া কি নির্দ্দেশ করিতেছে ? পঞ্চেন্দ্রিয়কে তাঁহারই সেবায় নিয়োগ করিতে পারিলে, আলোকধারায় তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতে পারিলে, শোক, দুঃখ, মনস্তাপের জ্বালা অন্তরকে দহন করিতে পারে না ?

সত্য, অত্যন্ত সত্য। আজ সে পথের রেখা দেখিতে পাইয়াছে।

"ওরে চল্, আরতি হয়ে গেছে।"

জননীর আকর্ষণে সুষমা কল্পনালোক হইতে নামিয়া আসিল।

মন্দিরপ্রাঙ্গণের বাহিরে আসিয়া বাসার দিকে সকলে চলিল।

সতু সহসা যমুনার অঞ্চল ধরিয়া টানিয়া বলিল, "মাসীমা, কাল সকালে কখন্ আমরা আস্‌ব?"

যমুনা তাহাকে কোলে তুলিয়া বলিল, "খুব সকালে মানিক!"

"আমি ঠাকুরমা আর বাবাকে নিয়ে খুব সকালে আস্‌ব।"

যমুনা স্নেহভরে সতুর ললাট ও গণ্ডদেশে চুম্বনবৃষ্টি করিল, পরে ভবতোষকে ডাকিয়া বলিল, "দাদা, কালকের কথা মনে আছে ত?"

"মনে নেই? আমি ওঁকে নিয়ে ঠিক সময়ে হাজির হব।"

"পিসীমা, যতীনদাকে নিয়ে আপনার সকাল সকালে চাই কিন্তু।"

"কোন ভুল হবে না, মা। তোমার ডাক কি ভুলতে পারি?"

তেমাথা পথের সংযোগস্থলে দুই দল বিভক্ত হইয়া গেল। বিমলচন্দ্র আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজ কি তিথি—"

উত্তর দিল যমুনা। "আজ অষ্টমী। কাল নবমী।"

উমাশশী হাসিয়া বলিলেন, "যমুনা মার তিথি বেন মুখস্থ"

যমুনার ওষ্ঠপ্রান্তে মুহূর্ত্তের জন্য বিদ্যুৎরেখা খেলা করিয়া গেল। কি একটা কথা বলিতে গিয়া, সহসা সে ওষ্ঠে ওষ্ঠ চাপিয়া ধরিল।

একটা বিষাদগম্ভীর ছায়া তাহার সুন্দর আননে নামিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু বোধ হয়, তাহা কাহারও দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিল না। শুধু সুষমা তাহার দক্ষিণ হস্তখানি একবার চাপিয়া ধরিল।

আটত্রিশ

হরণাঝুরি হইতে পরিশ্রান্ত হইয়া ফিরিলেও, ভাঁড়ারঘরে মেয়েরা কোমর বাঁধিয়া কাজে লাগিয়াছিল। পরদিন যমুনা লোক জন খাওয়াইবে। সুতরাং যতদূর সম্ভব জিনিষ-পত্র গুছাইয়া রাখা হইতেছে। আহারের তখনও কিছু বিলম্ব ছিল।

দেওঘরে যাহা কিছু পাওয়া যাইতে পারে, সংগৃহীত হইয়াছিল। সুশীলের সরকার কলিকাতা হইতে বাকি সব জিনিষ লইয়া, পৌঁছিয়াছে। মেয়েদের মধ্যে উৎসাহের অন্তছিল না। চারুশীলা, মণিমালা, সুষমা, যমুনা দাসীদিগকে লইয়া, উমাশশীর নির্দ্দেশমত কাজ করিয়া চলিয়াছিল। সকলেরই মুখে প্রসন্নহাসি, শুধু সুষমার আনন অপেক্ষাকৃত গম্ভীর।

উমাশশী মাঝে মাঝে কাজের ফাঁকে কন্যার দিকে চাহিতেছিলেন। সুষমার গম্ভীর মুখ জননীর সতর্ক দৃষ্টি এড়ায় নাই। কিন্তু তিনি সেজন্য সুষমাকে একটা প্রশ্নও করিলেন না। আর এক জনের তীক্ষ্ণদৃষ্টি সুষমার ভাবপরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিল সে, মণিমালা।

কাজ সারিতে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। পূর্ণ দেড় ঘণ্টা লাগিয়াছে। উমাশশী বলিলেন, "এইবার তোরা হাত-মুখ ধুয়ে নে। বাকি সব কাল সকালেই শেষ হয়ে যাবে।"

পুরুষদের আহার শেষে মেয়েরা আহার সারিয়া বিশ্রামের জন্য শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। কাল সকালে সত্যই অনেক কাজ আছে।

যমুনা যে ঘরে শয়ন করিত, সুষমা ও উমাশশী ইদানীং সেই

ঘরেই থাকিতেন। যমুনা ও সুষমা একই শয্যা ভাগ করিয়া লইয়াছিল।

তখনও যমুনা ঘরে আসে নাই। উমাশশীর সহিত অন্য ঘরে কি যেন কাজ করিতেছিল। সুষমা পাণ চিবাইতে চিবাইতে খাটের উপর গিয়া বসিল।

মণিমালা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সহসা ভগিনীর পৃষ্ঠে মৃদু করাঘাত করিয়া বলিল, "সুষি, তোর আজ কি হয়েছে বল ত?"

সুষমা কোন কথা না বলিয়া ধীরচরণে কক্ষের একপ্রান্তে অবস্থিত বাক্স খুলিয়া পত্রখানি লইয়া দিদির হাতে দিল।

মণিমালা আলোর কাছে দাঁড়াইয়া চিঠিখানা মনোযোগ দিয়া পড়িল। তার পর সুষমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিল।

সুষমা অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "এ ভাবে আমায় বার বার অপমান করবার কি দরকার, দিদি?"

বোধ হয়, মণিমালার ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদুহাস্যরেখা দেখা দিবার চেষ্টা পাইল; কিন্তু সেটা দৃষ্টির ভ্রমও হইতে পারে। কারণ, মণিমালা যখন কথা কহিল, তখন তাহার মুখে হাসি ছিল না। সে মৃদুস্বরে বলিল, "কিন্তু আমি ত অপমানের কোন সন্ধান এতে পেলুম না, সুষি?"

"পেলে না!—"

আরও কি সে বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু, অধরে ওষ্ঠ চাপিয়া সে কথা বাহির হইতে দিল না। তবে তাহার আয়ত নয়নযুগল হইতে যেন প্রদীপ্ত জ্বালা ছড়াইয়া পড়িল।

মণিমালা প্রশান্তস্বরে বলিল, "না, বরং সব কথা ভেবে দেখলে বল্‌তে হবে, ললিত বাবু সত্যি তোকেই ভালবাসেন। আমরা তার অনেক প্রমাণ পেয়েছি।

সুষমা এবার উদ্দীপ্তকণ্ঠে বলিল, "ছাই পেয়েছ। তুমি কি জান, দিদি, উনি চার বছর আগে আমাদের কি রকম অপমান করেছিলেন? তা যদি জান্‌তে—"

হাসিতে হাসিতে মণিমালা বলিল, "সব জানি। আরও এমন কথা জানি, যা তুই কখনও কল্পনা করতেও পারবি নে। সত্যি কথা, পুরুষ জাতের মতির স্থির নেই। মেয়েমানুষের মত তারা নয়; কিন্তু তবু বলব, ললিত বাবু তোকে এত দিন বিয়ে করতে না চাইলেও, তিনি তোকে অপমান করতে কোন দিন চান্‌ নি।"

যমুনা এমন সময় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সম্ভবতঃ আলোচনার শেষ কথাগুলি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল।

কোনরকম ভূমিকা না করিয়াই সে বলিল, "সই, মিছে অভিমান করিস্‌নে। আমি তোকে একটা নিদর্শন দেখাচ্ছি। বৌদি, দাদা, বিমল-দা, মাসীমা সবাইকে দেখিয়েছি, তুইও নিজের চোখে দেখ।"

অঞ্চলপ্রান্ত হইতে একখানি কাগজ খুলিয়া লইয়া সে সুষমার হাতে দিল। "আজ সকালেই এটা পেয়েছি।"

সুষমা কাগজখানা পড়িতে লাগিল। সহসা তাহার মুখে রক্তোচ্ছ্বাস বহিয়া গেল। উহাতে লেখা ছিল—

"আপনার মত দেবীর কাছে ক্ষমা-প্রার্থনা নিশ্চয় ব্যর্থ হইবে না। তরুণ যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল মন হিতাহিত বিচার করিতে পারে না।

চার বৎসর আগে অহংজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা অন্যায় করিয়াছিলাম। তখন নিজেকে চিনিতে পারি নাই। তার পর অবিবেকী মন আরও একটা প্রচণ্ড গর্হিত কাজ করিয়াছিল। শুধু লোভ—নিছক লালসা ছাড়া তাহার অন্য কোন পরিচয় থাকিতে পারে না। সতীর্থের পত্নীকে স্বামিহীনা দেখিয়া, পুনরায় তাঁহার বিবাহ দিবার কল্পনা চলিতেছে জানিয়া—বামন হইয়া চাঁদের দিকে হাত বাড়াইয়াছিলাম। কিন্তু পরে যখন জানিতে পারিলাম, দেবীর আসন দেবতার পার্শ্বে, বানর বা ভূতের পার্শ্বে নহে, তখন বুঝিলাম শুধু লোভের মায়ায় নিজেকে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আমি শুধু আত্মপ্রবঞ্চনা করিতেই চাহিয়াছিলাম। চার বৎসর পূর্ব্বের যে ঘটনা মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইতে পারা যায় নাই, তাহার অন্তরালে নিশ্চয়ই কোন বিরাট সত্য প্রচ্ছন্ন ছিল। এই কয় দিনে ভাল করিয়াই বুঝিয়াছি, ভগবান অনুগ্রহ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন, চারি বৎসর আগে যিনি মূর্ত্তিমতী সেবার ন্যায় আমার মত অসহায়, অপরিচিতের রোগশয্যার পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন, আমার বিমূঢ় মন শুধু এত কাল তাঁহারই স্মৃতির পূজা করিয়া আসিয়াছিল; কিন্তু আমি আগে তাহা বুঝিতেই পারি নাই। অহমিকা বাহিরে তাহা স্বীকার করিতে চাহে নাই। যদি তাঁহায় করুণালাভে বঞ্চিত হই, জানিব, গৃহীর জীবন আমার জন্য নহে। আপনার সখী কোন দিন মার্জ্জনা করিবেন কি না, জানি না। তবে যদি করেন, সে জন্য এক দিনও তাঁহাকে অনুতাপ করিতে হইবে না, এ কথা বলিবার মত শক্তি ভগবান্ দয়া করিয়া দিয়াছেন। পুরুষজাতি

আপনাদের মত একনিষ্ঠতার দাবী করিতে পারে না সত্য, কিন্তু হাত ধরিয়া টানিয়া লইলে তাহারাও মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়া থাকে। আমার মনের গোপন পরিচয় পাইয়া যদি ঘৃণা করেন, তাহা আমার প্রাপ্য। সে জন্য অভিযোগ করিব না। তবে যদি পারেন, ক্ষমা করিবেন। আপনার বন্ধু—সখীকেও অনুরোধ করিবেন। সুশীল বাবুর আদেশ লইয়া, তাঁহাকে দেখাইয়া আপনার কাছে আবেদন পেশ করিলাম। ইতি— ললিত।"

দীর্ঘ পত্রের ছত্রে ছত্রে সত্যই কি অন্তরের বেদনা ও অনুতাপ আবরণহীনভাবে প্রকাশ পাইয়াছে? আন্তরিকতার গাঢ় স্পর্শ কি ইহাতে আছে? মানুষ মনের গোপনতম লজ্জার ইতিহাস স্বেচ্ছায় যখন প্রকাশ করে, তখন তাহাকে অভিনয় বলিয়া কি উপেক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত? যমুনার প্রতি যে অসঙ্গত মনোবৃত্তি এত দিন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, সে কথা স্বয়ং প্রকাশ না করিলে কেহই ত জানিতে পারিত না! তবে?

মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রশ্নগুলি সুষমার মানসক্ষেত্রে জাগিয়া উঠিল। সে তখনও পত্রের প্রতি চাহিয়াছিল।

যমুনার কলহাস্যে চমকিত হইয়া সুষমা সখীর প্রতি চাহিল। তাহার প্রসন্ন, নির্ম্মল আননে শুধু একটা পবিত্র দীপ্তি! সরল—উজ্জ্বল, ক্ষমাসুন্দর নয়নের দৃষ্টি সুষমাকে সচকিত করিয়া তুলিল।

"কি রে, ললিত বাবুকে এখন প্রত্যাখ্যান করতে পারবি তুই?"

যমুনার দৃষ্টি হাসিতেছিল, তাহার কথায় যেন একটা অনবদ্য মাধুর্য্য ও শান্তির হিল্লোল বহিতেছিল।

সুষমা কোনও উত্তর দিল না। সে যন্ত্রচালিতবৎ পত্রখানির দিকে চাহিতেই একটি ছত্র তাহার দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিল—"চারি বৎসর আগে যিনি মুর্ত্তিমতী সেবার ন্যায়, আমার মত অসহায় অপরিচিতের রোগশয্যার পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন, আমার বিমূঢ় মন শুধু এত কাল তাঁহারই স্মৃতির পূজা করিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু আমি আগে তাহা বুঝিতে পারি নাই। অহমিকা বাহিরে তাহা স্বীকার করিতে চাহে নাই।"

ইহা কি অন্তরের উক্তি, না নির্লজ্জ স্তাবকতা? কিন্তু—

যমুনা সহসা সুষমার কাছে আসিয়া কাণে কাণে বলিল, "সই, আত্মবঞ্চনা করিস নে। আমাকে যতটা বোকা ভাবিস, আমি তা নই। তোর মন—"

সুষমা তাড়াতাড়ি মাথা সরাইয়া লইয়া, যমুনার মুখ দক্ষিণ করতলে চাপিয়া ধরিল।

মণিমালার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে দেখিল, তাহার দিদি পরম কৌতুকভরে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

তবে—তবে কি বাড়ীর সকলেই তাহার মনের দুর্ব্বলতম অবস্থার সংবাদ রাখে? মা, দাদা, বৌদি, সুশীল বাবু, সকলেরই কাছে কি তাহার অন্তরের গোপনতম ইতিহাস প্রকাশ পাইয়া গিয়াছে? অথচ সর্ব্বপ্রযত্নে সে এই বিষয়টাই প্রকাশ পাইতে দেয় নাই!

লজ্জার অরুণরাগ সুষমার আননে যে মধুর দীপ্তি ফুটাইয়া তুলিল, গৃহের স্বল্পান্ধকার তাহা গোপন রাখিতে পারিল না।

সে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মা তখন

ভিতরে প্রবেশ করিতেছিলেন। কন্যার ভাবান্তর তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। তিনি ঘাড় ফিরাইয়া একবার সুষমার দিকে চাহিলেন। মৃদু হাস্যকে দমন করিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া তিনি বলিলেন, "কি রে, মণি?"

"এখন একটা শুভদিন স্থির করতে হবে, মাসীমা!"

বারান্দার প্রান্তে দাঁড়াইয়া সুষমা সে কথাটা শুনিতে পাইল। সে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া, প্রাঙ্গণ পার হইয়া, পশ্চাতের উদ্যানে প্রবেশ করিল। বাহিরের প্রচণ্ড শীত তাহাকে এতটুকু নিরুৎসাহ করিতে পারিল না।

জ্যোৎস্নাপ্লাবনে নিস্তব্ধ প্রকৃতি অবগাহন করিতেছিল। দূরে ধূসর জনহীন রাজপথ, বৃহৎ অজগরের মত যেন চন্দ্রালোকে ঘুমাইতেছিল।

সুষমা স্তব্ধভাবে সেই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শীতস্তব্ধ রজনীর বক্ষোদেশ ভেদ করিয়া অশ্রান্ত ঝিল্লীর রাগিণী কি গান গাহিয়া চলিয়াছে? ধরণীর হৃদয়ের গোপনতম কথা কি সঙ্গীতের ঝঙ্কার তুলিয়া অসীম আকাশের চরণতলে আত্মনিবেদন করিয়া চলিয়াছে? দিনের কোলাহলে, রূঢ় আলোকে, অশান্ত গতিবেগে যে কথা বলা চলে না। যখন সুপ্তির নীরবতায় সব শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখনই কি মর্ম্মকথা গানের তরঙ্গে তরঙ্গে বিচিত্র ছন্দে লীলায়িত হইয়া উঠে?

বক্ষোদেশে দুই করপুট স্থাপন করিয়া সুষমা স্পন্দিত, আলোড়িত হৃদয়কে যেন শান্ত করিতে চাহিল। সে এখন বালিকা বা কিশোরী

নহে। তরুণ যৌবনের উদ্দাম স্রোতোধারা তাহার দেহ ও মনে তরঙ্গ তুলিয়া বহিয়া চলিলেও সত্য ও মিথ্যা, আন্তরিকতা ও অভিনয়ের পার্থক্য বুঝিবার মত শিক্ষা ও জ্ঞান তাহার হয় নাই, এ কথা বলা চলে কি? সুতরাং—

"সই!—"

চমকিয়া সে দেখিল, তাহার সখী যমুনাধারা পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

যমুনা সুষমার একখানি হাত টানিয়া লইয়া বলিল, "এতে লজ্জার ত কোন কারণ নেই। চল্, এখন ভেতরে যাই। বারটা বেজে গেছে। কাল ভোরে কত কাজ আছে, জানিস ত?"

পর-মুহূর্ত্তে পথের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া যমুনা বলিল, "ঐ দেখ।"

সুষমা চাহিয়া দেখিল, একটি পরিচিত মূর্ত্তি নতদৃষ্টিতে পথের উপর পাদচারণা করিতেছে। কোনও দিকে তাহার দৃষ্টি নাই। গতি মন্থর, দুই বাহু পশ্চাদ্ভাগে বিন্যস্ত। গভীরতর চিন্তায় যে তাহার মন আচ্ছন্ন, ভঙ্গী দেখিলে, তাহা অনুমান করিতে মুহূর্ত্তও বিলম্ব হয় না।

সুষমা অতিকষ্টে উদ্গতপ্রায় দীর্ঘশ্বাসকে দমন করিল। তার পর সখীর হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে ভিতরে প্রবেশ করিল।

দ্বার বন্ধ করিবার সময় সে দেখিল, মূর্ত্তি তেমনই নত-দৃষ্টিতে, তখনও রাজপথে, বাগানের সম্মুখস্থ অংশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

ঊনচল্লিশ

প্রভাতে উঠিয়াই বিমলচন্দ্র সুশীলকে লইয়া মহারাজ ভবতোষের ভবনে গিয়াছিলেন।

চা-পানের পর ভবতোষ বলিলেন, "বিমল-দা, একটু ব'স। উনি এখনই সুশীল বাবুর বাড়ী যাবেন, ব্যবস্থাটা ক'রে দিয়ে আসি।

আজ যমুনা সকলকে খাওয়াইবে, মহারাণী উপন্যাচিকা হইয়া কয়েকটি জিনিষ প্রস্তত করিয়া দিবার ভার লইয়াছিলেন। প্রভাতে স্নান সারিয়াই তিনি প্রস্তত হইয়াছিলেন।

মহারাণী চলিয়া গেলে, ভবতোষ বলিলেন, "এইবার কাজের কথা হোক্। আবার তাড়াতাড়ি ওখানেও যেতে হবে ত, নৈলে যমুনা দিদির অভিমানের সীমা থাকবে না। এখন সুষমার খবর কি?"

বিমলচন্দ্র বলিলেন, ব্যাপার যা অনুমান করা গিয়েছিল, অনেকটা তাই। তবে যাই বল, ভবতোষ, নারীচরিত্র সত্যই পুরুষের কাছে দুর্জ্ঞেয়। মেয়েরা এ বিষয়ে সাহায্য না করলে সত্যি আমরা আসল কথাটা টের পেতাম না।"

ভবতোষ হাসিয়া বলিলেন, "তা হ'লে বল, বৌদি তোমাকে ঠিক সন্ধানই দিয়েছিলেন!"

"তিনি অনেক দিন আগেই আমায় বলেছিলেন; কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় নি। মা কিন্তু বরাবরই ঠিক জানতেন, কিন্তু হবার নয় জেনেই প্রকাশ করেননি। সব চেয়ে বেশী সাহায্য করেছে মণিমালা আর যমুনা। আগের ঘটনা যমুনা কিছুই জানত না বলেই

আমাদের ধারণা ছিল; কিন্তু সেটা ভুল। সুষমা কবে কোন্ সময়ে তার মনের প্রচ্ছন্নভাবের আভাস যমুনাকে দিয়েছিল, তা যমুনা বলে নি। তবে যমুনা অনেক বছর আগে থেকেই বুঝে নিয়েছিল, কিন্তু ভারী চাপা মেয়ে, বাইরে আভাসমাত্র দেয় নি।"

বিমলচন্দ্রের দিকে চাহিয়া ভবতোষ বলিলেন, "সত্যি, আশ্চর্য্য!"

সুশীলচন্দ্র এতক্ষণ নীরবে বসিয়া আলোচনা শুনিতেছিল। সে সহসা বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা মহারাজ, আমার একটা কথা মনে হচ্ছে, পুরুষের পক্ষে নারীর মনের কথা ঠিক ভাবে জানা সম্ভবপর নয়।"

ভবতোষ হাসিয়া বলিলেন, "তোমার কি এত দিন অন্য রকম ধারণা ছিল, ভাই?"

সুশীল বলিল, "দর্শনশাস্ত্র নিয়ে আমি এম-এ পাশ করেছিলুম। মনোবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব এ দুটি বিষয় যত্ন ক'রে তখন পড়েছিলুম, এখনও পড়ি। আমার ধারণা ছিল—"

বিমলচন্দ্র বলিলেন, "থাম্‌লে কেন, ভায়া। এত দিন ধারণা ছিল, মনুষ্য-চরিত্র জটিল হলেও দর্শন-শাস্ত্রের সাহায্যে স্ত্রীজাতির মনের ভাব দার্শনিক পণ্ডিতগণ ধ'রে ফেলতে পারেন, কেমন?"

"তাই আমার বিশ্বাস ছিল বিমল-দা।"

ভবতোষ বলিলেন, "আমি দর্শনশাস্ত্র নিয়ে অনেক নাড়াচাড়া করেছি। বহু কবি ও প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক ঔপন্যাসিক আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমি তাঁদের কি বলেছি জান? আমি বলেছি, পুরুষের মন দিয়ে মাতৃজাতির মনের পরিমাপ করতে যাওয়া ভুল।"

বিমলচন্দ্র বলিলেন, "আমি এ বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে একমত।"

সুশীল বিস্মিতভাবে উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "তাঁরা কি বলেন, মহারাজ?"

"অনেকে সে কথা মানতে চান না। তখন আমি তাঁদের দু চারটা ভুল দেখিয়ে দিলুম। বললুম, সারা জীবন ধ'রে নারীচরিত্রের রহস্য জানবার চেষ্টা ক'রে হার মেনেছি। শুধু যাঁরা নিজেকে নারীজাতির কাছে পুরুষের বৈশিষ্ট্য বিলোপ ক'রে তাঁদের মনের সংবাদ জানবার তপস্যা ক'রে আসছেন, তাঁরা ছাড়া স্ত্রীজাতির মনের খবর যথাযথ-ভাবে আর কাহারও পাবার আশা নেই। অবশ্য সাধারণ ব্যাপার নিয়ে নয়, গভীর এবং জটিল বিষয়ের কথাই বলছি।"

সুশীলচন্দ্র মস্তক আন্দোলিত করিতে করিতে বলিল, "ঠিক বলেছেন, মহারাজ! আজ সুষমার ব্যাপার থেকেই এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। তার আগে আমার স্ত্রীও এ বিষয়ে আমার চৈতন্য সম্পাদন করেছিলেন।"

ভবতোষ বিমলচন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এখন ওদের বিয়ের দিন ঠিক করা চাই ত! কোথায় বিয়ে হবে?"

বিমলচন্দ্র বলিলেন, "পাটনাতেই বিয়ে হবে। যেখানে প্রথম আরম্ভ, সেখানেই দাম্পত্যমিলনের শুভবাসর করাই আমার অভিমত। মাঘের মাঝামাঝি একটা দিন ঠিক ক'রে নিতে হবে।"

সুশীলচন্দ্র বলিল, "সেই ভাল হবে, বিমলদা! কিন্তু আমার একটা কথা আছে, মহারাজ।"

ভবতোষ চাহিয়া দেখিলেন, সুশীলের আননে একটা উদ্বেগের

চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিলেন, "তোমার আবার কি কথা? কঠিন সমস্যা না কি?"

"তা একটু জটিল বৈ কি। আপনি ত জানেন, যমুনার জন্য আমি মস্ত দুর্ভাবনায় পড়েছি। যদি তার আবার বিয়ে দিতে পারতুম, তবে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। যতীন বাবুর সঙ্গে যদি হয়, বড় ভালই হবে। মনে হয়, যমুনা যতীন বাবুর পক্ষপাতিনী, যতীন বাবুও যমুনাকে অপছন্দ করেন না।"

ভবতোষ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "সুশীল বাবু, তুমি ঠিক জান, যমুনা যতীনের পক্ষপাতিনী? যদি তা হয়, আমি যতীনের সঙ্গে তার বিয়ে দেবার প্রাণপণ চেষ্টা করব।"

বিমলচন্দ্র বলিলেন, "আগে যমুনাকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখা উচিত। সে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে। সুষমার কাছে এ বিষয় খোঁজ নিলে যমুনার মনের সংবাদ নিশ্চয় জান্‌তে পারা যাবে। আজ সুষমা, মণিমালা আর তোমার বৌদি, তিন জনে চেষ্টা করলেই সব জানা যাবে। যদি তোমার ধারণা সত্য হয়, তা হ'লে—"

কিন্তু তিনি সহসা থামিয়া গেলেন। তার পর বলিলেন, "আজ যমুনার খাওয়ানোর ব্যাপারটা চুকে গেলে, সন্ধ্যের পর তার মনের ভাব জানবার চেষ্টা করা যাবে। কি বল?"

মহারাজ বলিলেন, "সেই ভাল। যতীনের ভার আমি নিতে পারি।"

বিমলচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "বেলা আটটা বেজে গেছে। এবার আমরা চলি। ওদিকের কতদূর কি হ'ল, দেখা দরকার।"

সুশীল বলিল, "যমুনা যে রকম অভিমানিনী, আমাদের দেখতে না পেলে খুব রাগ করবে। চলুন, দাদা। মহারাজ, আপনি অনুগ্রহ ক'রে একটু তাড়াতাড়ি আসবেন।"

ভবতোষ বলিলেন, "স্নানটা সেরেই আমি যাচ্ছি। কিন্তু হঠাৎ যমুনার এ সখ হ'ল কেন, আমি তাই ভাবছি। আচ্ছা সুশীল বাবু, মোহিত বাবু কত দিন গত হয়েছেন?"

"ডু'বছর এখনও হয়নি। বৈশাখ মাসে ডু'বছর পূর্ণ হবে।"

ভবতোষ নিমীলিত-নেত্রে কি চিন্তা করিলেন। তার পর বলিলেন, "আচ্ছা, তোমরা এগোও, আমি এখুনি আস্‌ছি।"

বিমলচন্দ্র সুশীলের সহিত রাজপথে নামিয়া দেখিলেন, প্রভাত-সূর্য্যের আলোক বৃক্ষ-পল্লবে, পাতায় পাতায় ঝল-মল করিতেছে। পথে পুরুষ-নারী, বালক-বালিকা, তরুণ-তরুণীরা গরম কাপড়ে দেহ আবৃত করিয়া ভ্রমণে বাহির হইয়াছে।

সাঁওতালপরগণায় বাঙ্গালী নরনারীকে দেখিলে মনে আশা ও আনন্দের সঞ্চার হয়। ডুই বেলা স্বচ্ছন্দ ভ্রমণ, শরীর ও মনের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে কিরূপ প্রয়োজন, বাঙ্গালী সহরের কূপমণ্ডূক হইয়া পড়িলে, তাহা ভুলিয়া যায়। অথচ শরীর ও মনের স্বাস্থ্য অটুট না থাকিলে জীবন-সংগ্রামে জয়লাভের কোন সম্ভাবনাই নাই।

বিমলচন্দ্র সেই কথাই ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছিলেন। ডাকঘরের কাছে আসিয়া তিনি সুশীলকে বলিলেন, "ভায়া, তুমি এগোও। এখানে একটু কাজ সেরে আমি যাচ্ছি।"

সুশীল আর দাঁড়াইল না। বিমলচন্দ্র ডাকঘরের দিকে চলিলেন।

খানকয়েক টেলিগ্রামের ফরম তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন। ডাকঘরের বারান্দায় উঠিয়া কয়েকখানি ফরম চাহিয়া লইয়া তিনি মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করিলেন।

না, এখন থাক্। পাটনায় তার করিবায় প্রয়োজন আছে সত্য, কিন্তু আজিকার কাজ চুকিয়া যাইবার পর ব্যবস্থা করাই সঙ্গত।

পথে নামিয়া সম্মুখদিকে চাহিবামাত্র বিমলচন্দ্র থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

ললিত আসিতেছে না? শ্লথগতিতে, ভূমিলগ্ন দৃষ্টিতে সে পথ চলিতেছে কেন? কাছে আসিতেই ললিতের শুষ্ক, বিবর্ণ মুখ দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। এক রাত্রির মধ্যে অবস্থার এ কি পরিবর্ত্তন! আজ সকালে শয্যাত্যাগের কিছু পরেই বিমলচন্দ্র সুশীলকে লইয়া ভবতোষের কাছে গিয়াছিলেন। সকালে ললিতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই—সে তখনও শয্যাত্যাগই করে নাই।

ডাক্তারের দক্ষিণ হস্তখানি ধরিয়া বিমলচন্দ্র বলিলেন, "কি হয়েছে, ললিত বাবু, অপনার চেহারা এমন হ'ল কেন?"

ললিতের মুখে চেষ্টাকৃত ম্লান হাসি দেখা গেল। সে বলিল, "বোধ হয়, ভাল ঘুম হয় নি, তাই।"

"তা এখন ডাকঘরে কি দরকার?"

মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করিয়া ললিত উৎসাহহীন কণ্ঠে বলিল, "কলকাতায় একখানা তার পাঠাবো ব'লে এসেছি।"

বিস্মিতভাবে বিমলচন্দ্র বলিলেন, "কেন?"

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইয়া মৃদু স্বরে ডাক্তার বলিল, "আমি

আজ রাত্রির গাড়ীতে কলকাতায় ফিরে যাব, তাই চাকরকে তার ক'রে দিচ্ছি, সে যেন আমার ঘর, বিছানা সব জিনিষ ঠিক ক'রে রাখে।"

বিমলচন্দ্রের বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইল। আবার কি ললিত বাবুর মতপরিবর্ত্তন ঘটিতেছে? তাঁহার চিত্ত অকস্মাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল।

"আপনি আজই চ'লে যাবেন, একথা ত ছিল না, ললিতবাবু?"

পথের ওপারে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া ললিত বলিল, "কিন্তু থেকে কি লাভ, বিমল বাবু? আমি অভিশাপের মত আপনাদের আনন্দের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছি। সত্যি আমি অপরাধী; কিন্তু তবু——তবু—"

নৈরাশ্যে উদ্বেল কণ্ঠ সহসা থামিয়া গেল। বোধ হয়, ব্যর্থ আশা ও অভিমানের অশ্রু তাহার নয়নপ্রান্তে আসিয়া সঞ্চিত হইয়াছিল।

"এ আপনি কি বলছেন, ললিত বাবু! আপনার কথা সত্যই আমি বুঝ্‌তে পারছি না।"

ললিতের কণ্ঠ আবেগে কম্পিত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "যে অন্যায় আমি করেছি, প্রত্যাখ্যানই তার উপযুক্ত শাস্তি। আমি তা' মাথা পেতেই নেব। যে হতভাগার দুনিয়ায় কেউ নেই, তার অদৃষ্ট—"

ঝর-ঝর করিয়া অশ্রুধারা নয়নপথে নামিয়া আসিল। কোন বাধাই তাহার গতিরোধ করিতে পারিল না।

ললিতচন্দ্রের এই ভাববিপর্য্যয়ের কোনও হেতু অনুমান করিতে

না পারিয়া, বিমলচন্দ্র সহানুভূতি-স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "কিন্তু আপনার হঠাৎ এই ক্ষোভ কেন, ললিত বাবু?"

বাম হস্তে অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া ললিত বিস্ময়াভিভূত-ভাবে বিমলচন্দ্রের দিকে চাহিল।

বিমল বলিলেন, "সুষমাকে বিবাহ করবার সম্বন্ধে কি আপনি মতপরিবর্ত্তন করেছেন?"

মতপরিবর্ত্তন? বিমল বাবু এ কি বলিতেছেন!

কম্পিত মৃদুকণ্ঠে ললিত বলিল, "আপনারা এ অভাগার হাতে—"

বাধা দিয়া বিমল বলিলেন, "সবই ত স্থির হয়ে গেছে। মাঘের গোড়াতেই পাটনায় শুভকাজ করা সকলেরই অভিপ্রেত। কিন্তু আপনার মনে ভুল ধারণা জন্মাল কেন, ললিত বাবু?"

ললিতের মুখ হর্ষোদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তা হ'লে আমি মার্জ্জনা পেয়েছি? সকলের নীরব ভাব দেখে আমার উল্টো ধারণা হয়েছিল, দাদা!"

ললিতের হস্ত আকর্ষণ করিয়া বিমল বলিলেন, "বাড়ীতে কাজ, তাড়াতাড়ি চলুন।"

চল্লিশ

বাহিরের ঘরে নিমন্ত্রিতগণ নানাপ্রকার আলোচনায় রত। দেওঘরের পরিচিত প্রতিবেশীদিগকে সুশীল, ললিত প্রভৃতি নানাভাবে পরিচর্য্যা করিতেছিল। মহারাজ ভবতোষ মজলিসি ব্যক্তি। সকলকে তিনি গল্পে পরিতুষ্ট করিয়া ঘন ঘন তাম্রকূট-ধূমপান করিতেছিলেন।

ব্যবস্থা ছিল, বেলা বারটার মধ্যে মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করিতে হইবে। শেষরাত্রি হইতে রন্ধনের কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। প্রাচীর-বিলম্বিত ঘটিকাযন্ত্রে এগারটা বাজিবা-মাত্র ভবতোষ বলিলেন, "সুশীল বাবু, চল, একবার ভেতরের খবর লওয়া যাক্।"

নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করিবার দিকে সুশীলের ন্যায় ভবতোষেরও বিশেষ ঝোঁক ছিল। যতীন্দ্রনাথ ও ললিতকে বাহিরের ভার দিয়া ভবতোষ, সুশীল ও বিমলচন্দ্রকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

অন্তঃপুরে রন্ধনশালায় কর্ম্মচঞ্চলতা পূর্ণমাত্রায় চলিতেছিল।

ভবতোষ হাসিমুখে বলিলেন, "আজকের যিনি অন্নপূর্ণা তিনি কোথায়?"

মহারাজের কণ্ঠস্বরে সুষমা রন্ধনাগারের দিক হইতে দ্রুতপদে অগ্রসর হইল।

"যমুনাকে খুঁজছেন, দাদাবাবু?"

হাঁ, দিদি! আজ তিনিই ত অন্নসত্র দিচ্ছেন, আমরা সব উপস্থিত। বেশী বিলম্ব আছে না কি?"

"সব প্রস্তুত। আর পনের মিনিটের মধ্যে সবাইকে বসান হবে। মহারাণী নিজে কিন্তু অন্নপূর্ণার আসন নিয়েছেন, দাদাবাবু। সাতটা থেকে এগারটার মধ্যে যত রকম রান্না দরকার, তিনি একাই শেষ করেছেন।"

হাসিতে হাসিতে মহারাজ ভবতোষ বলিলেন, "বল কি? তাঁর ননীর দেহ গ'লে যায় নি?"

উমাশশী এমন সময়ে সেখান আসিয়া বলিলেন, "ভবতোষ, বৌমার ধন্যি ক্ষমতা। আমরা এপাড়া ওপাড়া থেকে আরও চার জন ব্রাহ্মণকন্যাকে যোগাড় করে এনেছিলুম, কিন্তু বৌরাণী সবাইকে বসিয়ে রেখেছেন। তিনি বল্লেন যে, গরীবের মেয়ে তিনি। পঞ্চাশ ষাট জনের রান্না তিনি এখনও একাই করতে পারেন।"

ভবতোষ বলিলেন, "সে কথা সত্যি, মা। উনি রোজ নিজের হাতে দশ বার রকম রান্না না ক'রে থাক্‌তে পারেন না। জানেন ত মা, আমার সঙ্গে রোজ অন্ততঃ বিশ জন লোক খেতে বসে। ওটা আমার ভারী বিশ্রী স্বভাব। একা খেতে পারি নে। যাক, আমি ওঁর খোঁজ নিচ্ছিনে। আমার যমুনা-দি—না, না, আমি তাকে মার আসনেই বসিয়েছি। আমার সে মাটিকে দেখ্‌ছি নে কেন?"

সুষমা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "সই আধ ঘণ্টা হ'ল, তার শোবার ঘরে ঢুকেছে। একটু পরেই সে বার হবে।"

সুষমার মুখে মৃদু, চাপা হাস্যরেখার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া

সুশীল বলিল, "এমন সময়ে সে ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে কি করছে ?"

উমাশশী তখন ভাঁড়ারের দিকে চলিয়া গিয়াছেন। সুষমার আননে তখনও তেমনই রহস্যপূর্ণ হাস্যরেখা। সে মৃদুস্বরে বলিল, "দেখবেন, জামাই বাবু ?"

সুষমার ভাবভঙ্গিতে সুশীলচন্দ্র, ভবতোষ এবং বিমলচন্দ্র তিন জনেরই মনে বোধ হয় যুগপৎ কৌতূহল জাগিয়া উঠিয়াছিল। ভবতোষ বলিলেন, "ব্যাপার কি, বোন্ ?"

"আপনারা আমার সঙ্গে আসুন, জোরে কথা বলবেন না।"

সুষমা পার্শ্বের কক্ষে সন্তর্পণে প্রবেশ করিল। বিস্মিতভাবে তিন জন তাহার অনুবর্ত্তী হইলেন।

উভয় কক্ষের মধ্যবর্ত্তী একটি দরজা ও জানালা ছিল। দ্বারটি রুদ্ধ, বাতায়নটির উপরের কপাট ঈষৎ মুক্ত।

সেখানে দাঁড়াইতে বলিয়া সুষমা পার্শ্বের কক্ষের ভিতর চাহিয়া দেখিতে ইঙ্গিত করিল। ভবতোষ অগ্রে সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেন। সুষমা যখন তাঁহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই সঙ্কোচের কোনও কারণ নাই।

ঈষন্মুক্ত বাতায়নের ফাঁক দিয়া ঘরের ভিতর দৃষ্টিপাত করিতেই তাঁহার আননে একটা অপূর্ব্ব দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। সুশীল ও বিমলচন্দ্রকে তিনি কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে ইঙ্গিত করিলেন।

পর্য্যায়ক্রমে তিন জনেরই কৌতূহলদৃষ্টি গৃহের অভ্যন্তরভাগের রহস্য ভেদ করিবার জন্য কেন্দ্রীভূত হইল।

ধূপ ও ধূনার মধুর গন্ধ বাতায়নপথে নির্গত হইতেছিল।

ও কি! যমুনা নিমীলিতনেত্রে কাহার ধ্যান করিতেছে? ভগবানের? সুশীলচন্দ্র পরক্ষণেই চমকিয়া উঠিল। তাই কি?

সে দেখিল, বিবিধ প্রকার ভোজ্য, নানাবিধ ফল, মিষ্টান্ন গৃহমধ্যে বিবিধ আধারে সজ্জিত রহিয়াছে। এমন কি, যে সকল আহার্য্য পাক করা হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি পদ স্তরে স্তরে অর্ঘ্যস্বরূপ নিবেদিত।

সম্মুখে ছোট একটি চৌকীর উপর একখানি আলোকচিত্র। কাহার? ঐ আলোকচিত্রটি কাহার?

সুশীলচন্দ্র দেখিল, উহারই নিম্নে একজোড়া রৌপ্যরচিত খড়ম—প্রত্যগ্র পুষ্পভারে তাহার শেষাংশ আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে।

সুশীলচন্দ্রের সর্ব্বদেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। উক্ত রৌপ্য-পাদুকার ইতিহাস তাহার অপেক্ষা কে ভাল জানে?

যমুনার নিমীলিত নেত্রপথে ধারায় ধারায় মুক্তাবিন্দু ঝরিতেছিল। তাহার চিত্ত তখন কি ইহজগতের সকল প্রকার সংস্পর্শকে অতিক্রম করিয়া, লোকাতীত স্বপ্নলোকে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল?

ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘশ্বাস সুশীলের অন্তরতম প্রদেশ মথিত করিয়া বাহির হইল। সে আর তথায় দাঁড়াইতে পারিল না। অভিভূতভাবে সে বাতায়ন-সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিল।

কি অসঙ্গত ধারণাকে ভিত্তি করিয়াই না সে কার্য্যসূচী অবলম্বন করিতে চাহিয়াছিল! মানুষের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা কত সসীম! তাহার ন্যায় ভ্রান্ত আর কে আছে?

তিন জন দর্শকই ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সুষমার মুখে তখনও মৃদু হাস্যরেখা জ্বল-জ্বল করিতেছিল।

মহারাজ ভবতোষের মুখে অভূতপূর্ব একটা দীপ্তি বিকশিত হইয়া উঠিল। তিনি মৃদু অথচ গাঢ়স্বরে কহিলেন, "সুশীল বাবু আমরা সত্যই কি ভ্রান্ত!"

এমন সময় দ্বার মুক্ত করিয়া যমুনা ঘরের বাহিরে আসিল।

তাহার বেশের পরিবর্ত্তন সুশীলের সমগ্র অন্তরকে প্রচণ্ডভাবে আহত করিল। সে বিমূঢ় দৃষ্টিতে সহোদরার দিকে চাহিয়া রহিল।

যমুনার করপ্রকোষ্ঠ আজ আভরণশূন্য। সাদা গরদের পাড়-শূন্য বস্ত্র তাহার দেহকে এক অপূর্ব্ব সুষমায় মহনীয় করিয়া তুলিয়াছিল; কিন্তু সুশীল সে দৃশ্য দেখিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল।

যমুনা স্মিত-হাস্যে মৃদুচরণে অগ্রসর হইয়া প্রথমে ভবতোষ, পরে বিমলচন্দ্র ও সুশীলের পদধূলি গ্রহণ করিল।

"দাদা-বাবু আশীর্ব্বাদ করুন।"

ভবতোষ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন, "তোমার সাধনা সফল হোক্।"

যমুনার মুখে তেমনই মৃদুহাস্য-রেখা। সে সুশীলের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "দাদা, দুঃখ করো না। আমি বাধ্য হয়েই এ কাজ করেছি। আজ আমার স্বামীর জন্মদিন। আজকে তোমরা মন ভারী ক'রে থাক্‌লে আমার বড় কষ্ট হবে, দাদা।"

ভবতোষ বলিয়া উঠিলেন, "ও, তাই এত আয়োজন!"

সুষমা বলিল, "মোহিত বাবু যা যা খেতে ভালবাস্‌তেন, সই আজ তার প্রিয়জনকে সেই সকল জিনিষ খাইয়ে তৃপ্তি পেতে চায়।"

বিমলচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "চমৎকার! চমৎকার!

মহারাজ ভবতোষ মুহূর্ত্ত নিমীলিত-লোচনে কি চিন্তা করিলেন, তার পর বলিলেন; "এমন দৃশ্য যতীন ও ললিতকে দেখান দরকার।"

বিমলচন্দ্র বলিলেন, "তুমি এখানেই থাক, ভবতোষ। আমি ওঁদের ডেকে আনছি।"

অতিকষ্টে প্রথম আঘাত সংবরণ করিয়া সুশীল বলিল, "কিন্তু যমুনা, তোর এ বেশ—আমার যে অসহ্য!"

হাসি-মুখে যমুনা বলিল, "কিন্তু তোমার জন্যই আজ ইচ্ছে ক'রে বেশ বদলাতে হ'ল। নৈলে তোমাকে যে বোঝাতে পারতাম না, দাদা। আগের বেশ আমার কাছে বেমানান ছিল না। কারণ, আমি যে রোজ সকল সময় তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করতুম!"

যমুনা সহসা থামিয়া গেল। সুষমা বলিয়া উঠিল, "জামাই বাবু, আপনার যদি চোখ্ থকে্ত, সইকে ভুল বুঝ্তেন না। আমরা সবাই যা জানি, আপনি কোনমতেই তা বিশ্বাস করতেন না। কি ভুল আপনাদের—পুরুষমানুষদের।"

সত্যই কি সুশীল এত দিন ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া রাখিয়াছিল?

ললিত ও যতীন্দ্রকে লইয়া বিমলচন্দ্র এমন সময় ফিরিয়া আসিলেন।

মহারাজ উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলিলেন, "একবার ঘরের মধ্যে চেয়ে দেখ। আমার যমুনা-মা, আজ তাঁর স্বামীর জন্মদিনে, স্বামীর

প্রিয় আহার্য্যগুলি আমাদের সকলকে খাইয়ে তৃপ্তি লাভ করতে চান। কিন্তু খড়ম-জোড়ার দিকে একবার ভাল ক'রে লক্ষ্য করো, ললিত ডাক্তার।"

যতীন্দ্রনাথের প্রসন্ন আনন উদ্ভাসিত হইল। সে স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "মহারাজ, ভুল ভেঙ্গেছে?"

"আমায় ক্ষমা কর, যতীন। তুমি মানুষের মত মানুষ, ভাই, তুমি ঠিকই অনুমান করেছিলে। আমি আবার তোমার কাছে আমার মূর্খতা স্বীকার করছি।"

ললিতচন্দ্র তখন নির্ব্বাক বিস্ময়ে, একবার ঘরের মধ্যে, আরবার সন্নিহিত তপস্বিনী যমুনার গৌরবোজ্জ্বল মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিল।

এমন সময়ে সতু আসিয়া যমুনাকে দুই বাহুবেষ্টনে জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিল, "মাসী-মা!"

*　　*　　*　　*

সন্ধ্যার আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল।

ভোজের উৎসব শেষ হইয়া গিয়াছিল। খোলা বারান্দার এক দিকে পুরুষরা বসিয়া আলোচনা করিতেছিলেন। ভোগী, সুখী ভবতোষ তখনও নিজের বাড়ী ফিরিয়া যান নাই; যতীন্দ্র, ললিত, বিমল ও সুশীলের সহিত আসন্ন বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন।

এমন সময় অকুণ্ঠিতচরণে যমুনা সতু ও শীলাকে দুই হাতে ধরিয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

মহারাজ বলিলেন, "আমার মার কোন নতুন হুকুম আছে ?"

সলজ্জভাবে যমুনা বলিল, "যতীনদার কাছে একটা আর্জি আছে।"

"আমার কাছে, দিদি ?"

"হাঁ, দাদা, আপনারই কাছে। আমার আর্জি মঞ্জুর হবে কি না, জানি না।"

সকলেই যমুনার কথার ভঙ্গীতে হাসিতে লাগিল।

যতীন্দ্রনাথ বলিল, "এখন দিদির হুকুমটা শোনা যাক্।"

স্মিতহাস্যে যমুনা বলিল, "সতুকে আমায় দেবেন, দাদা ?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয় ! সতুকে মানুষ গ'ড়ে তোলবার ভার তোমার রৈল, দিদি। আমি জানি তোমার মত কেউ ওকে মানুষ করতে পারবে না।" তার পর অস্ফুটভাবে যেন স্বগতই বলিয়া চলিল, "তাঁর অনুমোদন হবেই !"

একটু থামিয়া গাঢ়স্বরে যতীন বলিল, "তবে মাঝে মাঝে ওকে আমি গিয়ে দেখে আসব—সে অধিকার আমায় দিও, দিদিরাণি !"

যমুনা বলিল, "আপনি কলকাতাতেই চলুন না, দাদা ?"

"না, দিদি। "আমি যত দিন বাঁচব, দেওঘর ছেড়ে যেতে পারব না। এখানে—"

কিন্তু সে কথাটা শেষ করিল না। দাড়োয়ার তীরেই একদিন তাহার চিতা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। বন্ধনের লক্ষপাক যে, যতীন্দ্রকে এখানে বাঁধিয়া রাখিয়াছে !

সুশীল বলিল, "সতু ও শীলা তোর কোলেই মানুষ হবে। আমরা

তাতেই সুখী হব। তার পর তোর দাদার উপর আর যেন অভিমান ক'রে থাকিস্ নে, ভাই!"

মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, "যমুনাধারার স্নিগ্ধ প্রবাহে ওরা মানুষ হয়ে উঠুক, আমরাও তোমার দৃষ্টান্ত যেন অনুকরণ করতে পারি, যমুনা-মা!"

চন্দ্রালোকিত সন্ধ্যা যেন নীরবে সেই স্বস্তিবাচন অঞ্চল পাতিয়া গ্রহণ করিল।

সমাপ্ত